সাত ঘড়া মোহর

সাত ঘড়া মোহর

শেখর বসু

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ·
সুফি

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬৮

আচ্ছন্নের মতো কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পরে শরীরে সাড় ফিরে এসেছে সত্যবানের। প্রায় লাফ দিয়ে উঠে উনি পাশে ঘুমিয়ে-থাকা স্ত্রীকে বেশ জোরে এক ঠেলা দিলেন। ওই ধাক্কাতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল লীলাবতীর। ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গো, শরীর খারাপ লাগছে তোমার?'

স্বাভাবিক এই প্রশ্নটার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না সত্যবান। কেমন যেন ঘোর-লাগা মানুষের গলায় বললেন, 'আমি এইমাত্র একটা স্বপ্নাদেশ পেয়েছি।'

—কী দেশ?

—স্বপ্নাদেশ। একটু আগেই মা জগদম্বা দেখা দিয়েছিলেন আমাকে। কী জ্যোতির্ময়ী চেহারা! চারদিক আলোয় ভেসে যাচ্ছিল। মা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর এগিয়ে এসে মাথায় হাত রেখে বললেন : তোর দুঃখের দিন শেষ হয়েছে এবার। তুই বাড়ির সামনের রাস্তার গাছতলাটা খোঁড়। খুঁড়লেই সাত ঘড়া মোহর পাবি। মায়ের কথাগুলো এখনও আমার কানের ওপর ঝমঝম করে বাজছে। এ স্বপ্নাদেশ কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

লীলাবতীর একটু আগের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ঢেকে গিয়েছিল রাজ্যের রাগ আর বিরক্তিতে। নিজের কপালে একটা চড় মেরে বললেন,'এত লোকের মরণ হয়, আমার কেন হয় না!'

কী কথার কী উত্তর! কিন্তু কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না সত্যবানের মধ্যে। ঠিক আগের গলাতেই বললেন,'কী ঝলমলে চেহারা মায়ের! চারদিকে সোনালি আলোর বান। অত আলোয় চোখ খুলে রাখা কঠিন। কিন্তু আমি রেখেছিলাম। মা যখন কৃপা করে দেখা দিয়েছেন, আমি তাঁকে আশ মিটিয়ে দেখব না কেন? তবে আমার চোখ খুললেও মুখ ফোটেনি। একটা কথাও বলতে পারিনি মাকে। যা বলার মা-ই বলেছেন। মায়ের স্বপ্নাদেশ কখনও মিথ্যে হওয়ার নয়। বাড়ির সামনের গাছের তলা খুঁড়লেই সাত ঘড়া মোহর!'

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙিয়ে আজগুবি সব কথা শোনাবার জন্য রীতিমত চটে গিয়েছিলেন লীলাবতী। কিন্তু এবার ওঁর একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। মানুষটা একটু আধটু উলটোপালটা বকে থাকে ঠিকই, কিন্তু এমন উদ্ভট কথা আগে তো কখনও শোনায়নি।

রাগ-বিরক্তির সঙ্গে ভয় মিশতেই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল লীলবতীর। কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম শরীর খারাপ, এ তো দেখছি মাথা খারাপ! এখন আমি কী করব!'

আচ্ছন্ন মানুষের গলায় সত্যবান বললেন,'আমাদের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় আর কতটুকু? একটুখানি দৌড়লেই দম ফুরিয়ে যায়। তারপর? অপার রহস্যের ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার

মতো বোকামি আর কিছুতে নেই। আমি স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, আমাদের দুঃখের দিন ফুরলো এবার।'

শেষ কথাটা কানে যেতেই আবার দপ করে জ্বলে উঠলেন লীলাবতী। 'অভাব অনটনের মধ্যে তিনকাল কেটে গেছে আমার। আর আমার সুখের দরকার নেই। ডালভাত যা জুটছিল, তাতেই আমি দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমার আর কিছু থাক না থাক, রাতের ঘুমটুকু তো ছিল। এবার তাও গেল! কী সর্বনাশ হল আমার!'

ঘরে তিনটে জানলা। রাতের আকাশে আলো থাকলে ঘরেও কিছুটা ঢোকে। কিন্তু এখন ঘরে আলোর কোনও চিহ্ন নেই। আকাশে বোধহয় মেঘ জমেছে। হয়তো বৃষ্টি শুরু হয়েছে কোথাও। মাঝেমধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। স্বপ্ন দেখার সময় সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল সত্যবানের। ঠাণ্ডা হাওয়া ওঁর শরীর মনে এখন বেশ একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছিল।

স্নিগ্ধতা সত্যবানের কণ্ঠস্বরেও। একটু থেমে থেমে স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে বললেন, 'কী অপরূপ দেবীমূর্তি! আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। দেবীর মাথার পেছনে উজ্জ্বল আলোর একটা বলয়। চারপাশেও জোরালো আলো। অত আলোর দিকে অত বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। কিন্তু আমার জেদ চেপে গিয়েছিল। দেবী দয়া করে দেখা দিয়েছেন, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারব না! আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে চিনতে পারলাম। আরে! এ তো জগদম্বা! আমাদের ঠাকুরঘরের তাকে জগদম্বার যে মূর্তিটা আছে, অবিকল সেই রকম দেখতে।'

লীলাবতী কী যেন বলতে গিয়েও কিছুই বলতে পারলেন না। গলার ভেতরটা অসম্ভব-ভার-ভার ঠেকছিল। দুর্ভাবনায় ঝিমঝিম করছিল সারা শরীর। মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে যেতেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন।

নিঝুম রাতের কান্না মুহূর্তে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। অন্য কোনও রাত হলে সত্যবান নির্ঘাত স্ত্রীকে সামাল দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু এখন ওঁর কোনও ভাবান্তর হল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে ঠিক আগের গলাতেই বললেন, 'অবিকল ওই মূর্তির মতো দেখতে মাকে। কী প্রসন্ন রূপ! মায়ের দিকে তাকালে সব জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। ইশ্‌! আর একটু যদি দেখতে পেতাম! আর কী কণ্ঠস্বর! ওই গলা আমি জীবনেও ভুলব না, কিন্তু মা কেন আমাকে এত কৃপা দেখালেন? আমি তো অধম সন্তান। মা বলে দুবেলা ডাকি শুধু। যাগযজ্ঞ জানি না। পুজোপাঠ করি না। অথচ আমার দুঃখ ঘোচাবার জন্য স্বপ্নাদেশ দিলেন মা। কী পরিষ্কার কথা! ঠিক যেন কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছেন। বললেন— তুই বাড়ির সামনের রাস্তার গাছতলাটা খোঁড়। খুঁড়লেই সাত ঘড়া মোহর পাবি। কিন্তু অগাধ ওই ঐশ্বর্য নিয়ে আমি কী করব মা? আমি সামান্য মানুষ। সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটলেই আমি কৃতার্থ।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবানের ব্যাকুলতা বাড়ছিল, ওই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছিল লীলাবতীর কান্নার বেগও। এ পাড়াটা কলকাতার পুরনো পাড়ার একটা। বাড়িগুলো একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে তৈরি। ঠিক পাশের বাড়িটাই খানিকটা দূরে।

লীলাবতীর কান্নার শব্দ তাই বোধহয় ঘুমন্ত প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙাতে পারছিল না। এ বাড়িতেও তৃতীয় কোনও ব্যক্তি নেই। তাই সত্যবানের ব্যাকুলতা আর লীলাবতীর কান্না সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলল কিছুক্ষণ। লীলাবতীর বয়েস হয়েছে। মান-অভিমান, রাগারাগি, কান্নাকাটি — কোনওটাই এখন আর একটানা বেশিক্ষণ চালাতে পারেন না। ক্লান্তি এসে যায়। এখনও এল। উনি শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ চেপে ফোঁপাতে লাগলেন। তারপর এক সময় ঘুমিয়েও পড়লেন।

সত্যবানের কিন্তু ঘুম এল না। উনি বসে বসেই রাত কাটিয়ে দিলেন। তারপর এক সময় রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন— আকাশে ভোরের প্রথম আলো। ভোরের আলো ফুটতে দেখে আর কখনও উনি এতটা উত্তেজিত হননি। খাট থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন। চারদিকে অস্তি-আবছা একটা ভোর।

আলো আর একটু বাড়তেই লম্বা পায়ে বাথরুমে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিলেন ভাল করে। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত এক অস্থিরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। লুঙ্গি ছেড়ে পাজামা পরলেন, তারপর একটা পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে আবার জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ভোরের আলো আর একটু পরিষ্কার হতেই আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আবছা আলোর সঙ্গে হালকা অন্ধকারও মিশে আছে অনেকখানি। কাছের জিনিস দেখা গেলেও দূরে ঠিক নজর চলে না। বোধহয় একটু কুয়াশাও নেমেছে। কিন্তু ভোরের আলোকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না বেশিক্ষণ। আর একটু বাদেই পরিচ্ছন্ন আলো সব অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিল।

সত্যবানের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। উনি সতর্ক চোখে বাড়ির সামনের দিকে তাকালেন। তারপর ডাইনে, বাঁয়ে; শেষে সোজা রাস্তার দু-প্রান্তেও। কিন্তু কই, কোথাও তো কোনও গাছ নেই। গাছ না থাকলে তো গাছের তলা খোঁড়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। চারদিকে আবার তাকালেন। যেমন চোখ করে রাস্তায় পড়ে যাওয়া সিকি-আধুলি খোঁজা হয়, সত্যবানের চোখ ঠিক সেইরকম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বড় তো দূরের কথা, রাস্তার দুধারে কোনও চারাগাছও দেখা গেল না।

এ পাড়ায় জন্মেছেন সত্যবান। জন্মাবার পর পাক্কা ছেষট্টিটা বছর এই পাড়াতেই কাটিয়ে দিয়েছেন। চোখ বুজেও উনি বোধহয় বলে দিতে পারেন—এ পাড়ার কোথায় কী আছে! কিন্তু রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা গাছের হদিস নেননি কখনও। তবে এক-আধটা ছোটখাটো গাছ তো এদিক ওদিক থাকতেই পারত।

হতাশায় খানিকটা বুঝি নুয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী জগদম্বার স্বপ্নাদেশ মিথ্যে হবে কী করে? দেবীর মুখ এখনও বুঝি দেখতে পাচ্ছেন। ওঁর সেই কথাগুলো এখনও তো কানের ওপর বাজছে। শোনা বা বোঝার মধ্যে কোনও ভুল নেই। তাহলে?

হঠাৎ মাথায় একটা অন্য তরঙ্গ খেলে গিয়েছিল সত্যবানের। মা বলেছেন— বাড়ির সামনের রাস্তার গাছতলাটা খোঁড়। কিন্তু সামনে বলতে কত সামনে? ঠাকুরদেবতার

সামনে-দূরের হিসেবটা একটু অন্য ধরনের হতে পারে। সামনে বলতে একশো-দেড়শো-দুশো গজও হতে পারে। মেরুদণ্ড আবার একটু টানটান হয়ে উঠেছিল সত্যবানের।

বাড়ির সামনের রাস্তাটা দুদিকে একশো-সওয়াশো গজ যাওয়ার পরেই বাঁক নিয়েছে। লম্বা পায়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন সত্যবান। বাঁকের মুখে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত উত্তেজনায় টানটান হয়েছিলেন, কিন্তু ওখানে পৌঁছবার পরেই ঝিমিয়ে গেলেন। বাঁকের মুখ থেকে রাস্তা সোজা তিন-চারশো গজ চলে গেছে, কিন্তু কোথাও কোনও গাছের চিহ্ন নেই।

এখন চারিদিকে সকালের আলো। লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষ ভরসা এখন বাঁদিকের বাঁকের ওপাশের রাস্তাটা। পোড়-খাওয়া মানুষের ভঙ্গিতে কিছুটা হাঁটার পরই সত্যবানের মনে হল—বাঁদিকের রাস্তার বাঁকটা পেরুলেই একটা পোড়ো মন্দির, ওই মন্দিরের পাশেই একটা গাছ আছে না! আছে মনে হয়। খুব সম্ভবত কৃষ্ণচূড়া। শেষের দিকে সত্যবানের চলার গতি দ্রুত হয়ে উঠেছিল। ঝুঁকে-পড়া দেহ আবার টানটান। কিন্তু রাস্তার বাঁকের মুখে পৌঁছনোর পর টের পেলেন, ওঁর স্মৃতি কাজ করেনি ঠিক ভাবে। বাঁকটা পেরোবার ঠিক পরেই পোড়ো মন্দির, কিন্তু মন্দিরের পাশে কিংবা দূরে কোথাও কোনও গাছ নেই তো—। ওই যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছবিটা মাথায় খেলে গিয়েছিল, ওটা নির্ঘাত অন্য কোনও জায়গায়।

সকালের ঝকঝকে রোদ এর মধ্যেই কিছুটা চড়া হয়ে গিয়েছিল। রোদটা সত্যবানের আর ভাল লাগছিল না। চোখ জ্বালা-জ্বালা করছিল। রাতে, প্রথম রাতে, ওই যে এক-দেড় ঘন্টা ঘুমিয়েছিলেন--তারপর আর ঘুমই হয়নি।

উত্তেজনা থিতিয়ে যেতেই তীব্র এক অবসাদ নেমে এসেছিল সারা শরীরে। শরীর আবার খানিকটা নুয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। পা ফেলাও একটু বুঝি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মায়ের কথাগুলো এখনও কানে বাজছে। ভুল শোনার প্রশ্নই আসছে না। কিন্তু রাস্তায় গাছ না থাকলে স্বপ্নাদেশ ফলবে কী করে! গলার ভেতরটা বিচ্ছিরি ভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল ওঁর। রাত্তিতে ঘুমোতে না পারার জন্যে চোখ জ্বালা-জ্বালা করছিল।

বাড়ির সামনে এসে থমকে গেলেন সত্যবান। চার পুরুষের জরাজীর্ণ মস্ত একটা বাড়ি। বাড়ির কার্নিশে গজানো বটগাছে বসে কয়েকটা কাক তারস্বরে কা-কা করছে। ওই ডাকের মধ্যে কেমন যেন একটা ঠাট্টার ভাব। সদর দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিতেই লীলাবতীও কা-কা করে উঠলেন, 'কই, পেলে? পেলে তোমার সাত ঘড়া মোহর। হাত তো খালি দেখছি। ওগুলো কে নিয়ে আসছে তাহলে? কুলি?'

ঠাট্টার কোনও জবাব দেওয়ার চেষ্টাই করলেন না সত্যবান। শুকনো মুখে স্ত্রীর পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন।

এ পাড়ায় সত্যবানের চারজন বাল্যবন্ধু ছিলেন। একজন চাকরির সুবাদে বিহারে গিয়ে থিতু হয়েছেন। আর একজন শহরতলিতে ছোট একটা বাড়ি বানিয়ে উঠে গিয়েছেন সম্প্রতি। চতুর্থ বাল্যবন্ধু শিবনাথই শুধু টিকে আছে এখানে।

বন্ধুটি গলির মুখেই ভাড়াবাড়ির একটা ঘরে থাকেন। একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বছর-পাঁচেক। প্রাণের ওই বন্ধুটির সঙ্গেই সত্যবান সুখদুঃখের কথা বলে মন একটু হালকা করে থাকেন। সকালের দিকে শিবনাথ একবার আসেন। এক কাপ চা খেয়ে গল্পগাছা করেন কিছুক্ষণ। সহানুভূতিশীল এই বন্ধুটির দেখা পাওয়ার জন্য সত্যবান আজ বেশ ব্যাকুলই হয়ে পড়েছিলেন। বারবার মনে হচ্ছিল— শিবু এত দেরি করছে কেন?

শিবনাথ কিন্তু একটুও দেরি করেননি। অন্যান্য দিনের মতো আজও নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলেন বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুকে পেয়েই নড়েচড়ে বসলেন সত্যবান। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'চা হচ্ছে শিবু। চা খেয়েই আমরা একটু বেরোব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

অন্যান্য দিন চা আসার আগে, চা খেতে খেতে, অনেক গল্প হয়। আজ ধরতে গেলে কোনও কথাই হল না। চা শেষ করে দুই বন্ধুই বেরিয়ে পড়েছিলেন রাস্তায়। মোড়ের কাছে তেকোণা একটা ন্যাড়া মাঠ আছে। মাঠের একধারে লাটাইয়ের ছোট্ট একটা কারখানা। কারখানার পাশে পাথরের কয়েকটা স্ল্যাব পড়ে আছে।

দুই বন্ধু প্রায়ই ওখানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে থাকেন। আজ বসার পরে দুঃখী মানুষের গলায় সত্যবান বললেন,'শিবু, সবার সামনে সব কথা বলা যায় না। সবাই সব কথার মর্ম বোঝে না।'

শিবনাথের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এখানে 'সবাই' বলতে শুধুমাত্র লীলাবতীকেই বোঝানো হচ্ছে। বোঝার পরে অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল মানুষের গলায় বললেন,'তা ঠিক। কিন্তু হয়েছেটা কী?'

হঠাৎই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন সত্যবান। 'সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! তোমাকে বলতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। এই দ্যাখো।'

বন্ধুর বাড়ানো হাতের দিকে না তাকিয়ে শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন,'কী হয়েছে?'

উত্তরে সত্যবান বিস্তারিত ভাবে মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা বন্ধুকে জানালেন। সব শুনে বন্ধুর হাত জড়িয়ে ধরে শিবনাথ বললেন,'কী বলছ তুমি সতু! আমার তো গা ছমছম করছে!'

—স্বপ্নের কথা ভাবতে গেলে আমারও তো গা কেঁপে উঠছে। মায়ের সে কী জ্যোতির্ময়ী চেহারা! গলার স্বরে করুণা যেন ঝরে পড়ছিল, কিন্তু—।

— কিন্তু কী?

— মায়ের স্বপ্নাদেশ সত্যি হওয়ার কোনও উপায়ই তো দেখা যাচ্ছে না।

— কেন?

— শুধু আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা নয়, ডানদিক-বাঁদিকের চারশো গজের মধ্যে কোনও চারাগাছ পর্যন্ত নেই। গাছ থাকলে তো গাছের তলা খোঁড়ার প্রশ্ন। এখন খটকা লাগছে, আমি কি ভুল শুনলাম?

জোরালো প্রতিবাদ জানাবার গলায় শিবনাথ বললেন,'না না, তুমি ভুল শোনোনি।

তোমার কথা শুনেই আমি বুঝতে পারছি— তুমি যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ।'

সহানুভূতিশীল বন্ধুর কথা শুনে ভাল লাগল সত্যবানের, কিন্তু উনি মৃদু তর্ক তোলার গলায় বললেন, 'আমি যদি ঠিকই শুনে থাকি শিবু, বাড়ির সামনে তাহলে কোনও গাছ পাচ্ছি না কেন?'

উত্তরে প্রাণের বন্ধু শিবনাথ যা বলেছিলেন, তাতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যবান। শিবনাথ বললেন,'সতু, আমি এই ধরনের দু-তিনটে কেসের কথা শুনেছি। ঠাকুর-দেব্‌তারা স্বপ্নাদেশ নিয়ে একটু প্যাঁচ-পয়জার করতে ভালবাসেন। প্যাঁচ-পয়জার মানে হল ধাঁধা। ওই ধাঁধার জটটুকু ছাড়ালেই আসল ব্যাপারটা আপ্‌সে চোখের সামনে চলে আসে।'

— ধাঁধা!

— নয় কেন? ধাঁধা আর রহস্য একই ব্যাপার। কাছের মানুষের সঙ্গে রহস্য করে মানুষেরা মজা পায়। সেই রকম ভক্তদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে একটু ঠাট্টাতামাশা করে দেবদেবীরাও আনন্দ পান। একেই বলে বোধহয় ঠাকুরদেবতার লীলা। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে শুধু। পরে হয়তো মা জগদম্বাই ওই জট খোলার চাবি তোমার হাতে তুলে দেবেন।

— কিন্তু কী করে দেবেন?

বন্ধুর প্রশ্নে একচোট হেসে নিয়ে শিবনাথ বললেন, 'দ্যাখো কাণ্ড! তোমার মতো বিচক্ষণ মানুষের মুখে এই কথা! স্বপ্নাদেশ কী করে পেয়েছিলে? স্বপ্নেই তো! এমনও হতে পারে—মা হয়তো আজ রাতেই তোমাকে আবার স্বপ্নে দেখা দেবেন।'

বন্ধুর কথায় সত্যবানের সব সংশয় মুছে গিয়েছিল। শিবনাথের হাতে হাত রেখে বললেন,'আমারও তাই মনে হচ্ছে, শিবু—এ স্বপ্ন মিথ্যে হওয়ার নয়...।'

শিবনাথ জীবনে বহু কিছু দেখে বহুবার ঠেকে অনেক কিছু শিখেছেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পররামর্শদাতার গলায় বলসেন,'তোমাদের বাড়িতে মা জগদম্বার মূর্তিটা আমি দেখেছি। পেতলের মূর্তি। কিন্তু মাঝেমধ্যে পরিচর্যা না করলে মূর্তি তো কালচে মেরে যায়। আমি বলি কী, বাড়ি ফিরে গিয়ে তুমি মূর্তিটা তেঁতুল দিয়ে ভাল করে মাজো। মাজলেই দেখবে, পেতলের চকচকে রংটা বেরিয়ে এসেছে আবার। তারপর আর কী, দু-বেলা মূর্তির সামনে দুটো ধূপ জ্বেলে দাও। একটু বাতাসা-টাতাসা দাও। মায়ের ভক্ত তুমি। দুবেলা মূর্তির সামনে বসে মাকে ডাকতে তো কোনও দোষ নেই। কী বলো?'

অভিজ্ঞ মানুষ শিবনাথ কী বলতে চাইছেন— স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সত্যবানের কাছে। বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে বললেন,'তা ঠিক।'

বাল্যবন্ধুর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে সত্যবানের সব ক্লান্তি, সব অবসাদ একেবারে কেটে গিয়েছিল। রোদ্দুর আরও খানিকটা চড়া হওয়ার পরে বাড়ির পথ ধরেছিলেন। বহু বছরের চেনা পাড়া, চেনা রাস্তা। কিন্তু ফেরার পথে আড়চোখে রাস্তার দু'ধার খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন উনি। তবু সদ্যগজানো কোনও গাছ ওঁর চোখে পড়ল না।

।। দুই।।

পিতলের তৈরি জগদম্বার মূর্তি ঘষামাজা হয়নি বহু বছর, কিন্তু মূর্তিটি নিখুঁত। দেবীর মুখ স্বপ্নের ওই দেবীমূর্তির মতোই করুণামাখা। ঘরের তাক থেকে খুব যত্নের সঙ্গে মা জগদম্বাকে দু-হাতে তুলে নিয়েছিলেন সত্যবান, তারপর ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে মেঝেয় রাখলেন।

পুরনো তেঁতুল ঘরেই ছিল, সেই তেঁতুল দিয়ে পরম যত্নের সঙ্গে মাজতে শুরু করলেন দেবীমূর্তি। বছরের পর বছর ধুলোবালি খেয়ে পিতলের দেবীমূর্তি প্রায় কষ্টিপাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ তেঁতুল ঘষার পরেও মূর্তির গায়ে পিতলের রঙের আভাস পর্যন্ত ফুটল না। তবে এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন সত্যবান। সময় যত লাগে লাগুক, পরিশ্রম যত হয় হোক, মা জগদম্বার সোনার বরণ উনি ঠিক ফিরিয়ে আনবেন। পিতলের মূর্তিতে অবশ্য সোনার রঙ ফুটবে না, কিন্তু সোনার কাছাকাছি তো পৌঁছবে। চোখ বন্ধ করে ঘর-আলো-করা মায়ের স্বপ্নে দেখা রূপ আর একবার দেখে নিয়েছিলেন সত্যবান।

বেশ কিছুক্ষণ মূর্তি ঘষার পর হাত একটু টনটন করতে শুরু করেছিল ওঁর। কিন্তু মনে আনন্দ থাকলে কষ্ট কখনও কষ্ট বলে মনে হয় না। তবে রান্নাবান্নার প্রথম পর্ব শেষ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভক্তের মনেই খোঁচা মারলেন লীলাবতী। প্রথমে একদফা ঠাট্টার হাসি হাসলেন। তারপর ধারালো গলায় বললেন,'জগদম্বাকে তোয়াজ করছ, করো। প্রাণভরে করো। মা তোমাকে সাত নয়, একেবারে চোদ্দো ঘড়া মোহর পাইয়ে দেবেন।'

খোঁচা হজম করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সত্যবানের, কিন্তু মুখে রা কাটেননি। এতক্ষণ ধরে একটানা মূর্তি ঘষার জন্যে হাত ব্যথা-ব্যথা করছিল, তবে ওই খোঁচার প্রতিবাদ হিসেবেই উনি বুঝি মাজার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

লীলাবতীর কথার গতিও বেড়ে গিয়েছিল। 'ভালই তো মাজতে পারো। এবার থেকে আমার ঠাকুরের বাসনটাসনগুলোও মেজে দিও। এমনিতে বলতাম না। শখ চেপেছে বলেই বলছি! একটু খাটাখাটনি করা ভাল। রাত্তিরে ভাল ঘুম হবে। ঘুম ভাল হলে আর মাঝরাত্তিরে মোহর-মোহর করে চেঁচিয়ে উঠবে না। দয়া করে এবার থেকে আমাকে রাতে একটু ঘুমোতে দিও।'

লীলাবতীর প্রতিটি কথার পিঠেই ধমকে উঠতে ইচ্ছে করছিল সত্যবানের। অন্য সময় হলে উঠতেনও। কিন্তু নিজেকে মা জগদম্বার কৃপাধন্য ভাবার জন্য তুচ্ছ লৌকিক ব্যাপারগুলোর ওপর থেকে মন উঠে গিয়েছিল ওঁর। তবে এক-একটা সময় বোধহয় ভক্তজনেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। তেমন একটা জায়গায় পৌঁছবার পরে সত্যবান মূর্তি সাফাই তখনকার মতো বন্ধ রেখে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাইরে।

পুরনো আমলের বাড়ি। সদর দরজার পাশেই একটা রক আছে। শীতের দুপুরে বা গরমের সন্ধেয় এই রকে বসে অনেকটা সময় কেটে যায় দিব্যি। এখন রোদে বেশ তেজ, রকে বসতে ভাল লাগবে না; কিন্তু গিন্নির ওই বাক্যবাণ থেকে উদ্ধার পাওয়ার

আর কোনও উপায় ছিল না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন সত্যবান।

বেরুতেই রোগা, পাকানো চেহারার মাঝবয়সী একটা লোক ঝুঁকে পড়ে নমস্কার ঠুকে বলল,'কাকু, ভাল তো?'

পুরনো পাড়ায় এ ধরনের অনেক লোক আছে। চলাফেরার পথে নমস্কার ঠোকে, কুশলসংবাদ নেয়। কেউ-কেউ আবার দু-দশ টাকা চেয়েও বসে। নমস্কারের জবাবে সত্যবান মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ওদিকে তাকালেও বুঝতে পারছিলেন, লোকটা রকের ধারে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

একটু বাদে লোকটা পেছনদিক থেকে সামনে এসে দাঁত বার করে বলল,'আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, কাকু।'

—আমি!

—না, আপনি ঠিক বলেননি। গত রোববারে বাজারে দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে। আমিই বলেছিলাম বাড়ি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সত্যবান। 'কেন?'

প্রশ্নের জবাবে লোকটা পোকায়-খাওয়া দাঁত বার করে হাসল, তারপর গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'একটা খুব ভাল পার্টি আছে, কাকু।'

—কী আছে?

—পার্টি কাকু। কারবারি লোক। নগদ টাকায় কাজ করবে।

ব্যাপারটা এবার ধরতে পারলেন সত্যবান, কিন্তু আরও পরিষ্কার হবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ?'

—আপনার বাড়ি বিক্রির কাজ কাকু।

আচমকা শরীরের সব রক্ত বোধহয় মাথায় চড়ে গিয়েছিল সত্যবানের। চেঁচিয়ে বললেন, 'চলে যাও এখান থেকে। আর কখনও আসবে না। কে তোমাকে বলেছে যে আমি আমার বাড়ি বিক্রি করব?'

—নন্টেদা কাকু।

—কে নন্টেদা?

—ঘোড়াপুকুরের নন্টেদা।

চেঁচিয়ে উঠলেন সত্যবান। 'কোনও নন্টে-ফন্টেকে আমি চিনি না। এ আমার সাতপুরুষের ভিটে। মরে গেলেও এ বাড়ি আমি বেচব না।'

এসব কথার কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'আমার পার্টি কাকু, সত্যিকারের ভাল পার্টি। কোনও বায়না-টায়নার মধ্যে নেই। পুরো টাকা গুনে দেওয়ার পর দখল নেবে। ভাল টাকা পাবেন।'

উত্তেজনায় সত্যবানের মুখচোখ লাল হয়ে মুখের কথা আটকে গিয়েছিল প্রায়। লোকটা হঠাৎই খুব তড়বড় করে বলে উঠল, 'প্রচুর ফালতু দালাল এখানে ঘুরছে কাকু। কেউ এলে বলবেন—কানুর সঙ্গে আপনার কথা হয়ে গিয়েছে। পরে আবার আসব আমি।'

কথাগুলো বলেই চলে গিয়েছিল লোকটা।

ভেজানো দরজা খুলে ভয়-পাওয়া গলায় লীলাবতী বললেন, 'তুমি ভেতরে এসো তো। আমার ভয় করছে।'

—ভয়? এ পাড়ার আমি সাত পুরুষের বাসিন্দা। এখানেও ভয় পেতে হবে।

কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে শাসন আর অনুযোগ এনে লীলাবতী বললেন, 'তুমি ভেতরে এসো তো আগে।'

সত্যবান ঘরে ঢুকতেই লীলাবতী দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ওঁর হাত ধরে টেনে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মাথার ওপরের পাখা চালিয়ে দিলেন ফুলস্পিডে। একটু বাদে খুব নরম গলায় বললেন, 'তোমার বয়েস হয়েছে, তুমি এখনও এমন এক-একটা কাণ্ড করে বসো যে, ভয়ে আমার বুক উড়ে যায়।'

—ভয়!

হুঙ্কারের গলায় সত্যবান শব্দটা উচ্চারণ করতেই দুহাত তুলে লীলাবতী বললেন, 'আরে বাবা, আমি ওই সব ভয়ের কথা বলছি না। তুমি তোমার হাই-ব্লাডপ্রেশারের কথাটা তো মনে রাখবে সব সময়। ডাক্তার বারবার বলে দিয়েছে—কোনও অবস্থাতেই মাথা গরম করা চলবে না। অথচ ইদানীং তুমি কথায় কথায় দপ করে জ্বলে ওঠো। এত রাগ ভাল নয়।'

—রাগের কারণ যদি পরের পর ঘটে চলে, আমি কি দাঁত বের করে হাসব?

লীলাবতী কী যেন উত্তর দিতে গিয়েও দিলেন না। তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন, 'একটু কালো চা করে আনছি, চুপ করে খাও তো; পরে কথা হবে।'

কিছুক্ষণ বাদে লীলাবতী শুধু কালো চা নয়, সঙ্গে দুটো পোস্তর বড়াও নিয়ে এসেছিলেন। সত্যবান পোস্তর বড়ার সঙ্গে চা খেতে খুব ভালবাসেন। সুতরাং চা আর বড়া খাওয়ার পরেই ওঁর রাগ পড়ে গিয়েছিল খানিকটা।

লীলাবতী শান্ত গলায় বললেন, 'আমি ওষুধপত্তর খেলাম কি না তাই নিয়ে তো সব সময় খোঁজখবর নাও, কিন্তু নিজের দিকে একবারও ফিরে তাকাও না। কেন?'

—আরে, তোমার তো হার্টের অসুখ। আমারটা তো কিছুই নয়।

—ছাই হার্টের অসুখ। ডাক্তার শুধুশুধু একগাদা টাকা খরচ করিয়ে গুচ্ছের পরীক্ষা-টরিক্ষা করাল। কোনও দোষই তো পাওয়া গেল না।

—কে বলেছে?

—তুমিই বলেছ।

—না, মানে ডাক্তার যা ভয় করেছিল—সেসব অবশ্য হয়নি। কিন্তু তোমার বুকে তো প্যালপিটিশন হয়, এটা তো সত্যি। ওটা কমাবার জন্যেই ওই সব ওষুধপত্তর।

এবার লীলাবতীর গলায় সামান্য ঝাঁজ ফুটল। 'বাদ দাও তো ডাক্তারের কথা। অকারণে গাদাগাদা ওষুধপত্তর। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কত রকমের পরীক্ষা। এক ধাক্কায় বেশ কয়েক হাজার টাকা গলে গিয়েছে। এখন কদ্দিনে সেই ধার শোধ হবে কে জানে।'

পুরো টাকাটাই চড়া সুদে ধার করা। শোধ করতে দেরি হওয়া মানেই লাফিয়ে লাফিয়ে সেই সুদ বেড়ে যাওয়া। একটু উদ্বিগ্ন হলেন সত্যবান। কিন্তু জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, 'অসুখবিসুখ করলে চিকিৎসা তো করাতেই হবে। প্রয়োজনে সবাইকেই ধার করতে হয়, পরে সে ধার শোধ হয়েও যায়।'

আবার নরম হল লীলাবতীর গলা। 'আমার চিন্তা হয় তোমাকে নিয়ে। আজকাল তোমার বড্ড রাগ বেড়ে গিয়েছে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ওই ভাবে চেঁচামেচি করা উচিত হয়নি তোমার।'

—চেঁচামেচি তো সামান্য ব্যাপার, আমার উচিত ছিল লোকটার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেওয়া। কী বলেছে জানো?

—সব শুনেছি আমি।

—শুনেছ?

—শুনেছি। কিচ্ছু অন্যায় বলেনি। সাবেক কালের এই বাড়িটার ওপর থেকে তোমার মায়া এবার কাটাও তো।

মাথা আবার সামান্য গরম হয়ে উঠেছিল সত্যবানের, কিন্তু জোর করে সামাল দিয়ে বললেন, 'মায়া থাকা কি অস্বাভাবিক? সাত পুরুষের ভিটে—।'

—সাত পুরুষ নয়, চার পুরুষ। আর এটা ভিটে নয়, বাড়ি। বাড়িও আর বলা যায় না। বাড়িতে মোট একুশখানা ঘর ছিল, সেইসব ঘরের উনিশখানা এখন ভগ্নস্তূপ। বাড়ির ভেতর দিকে আর যাওয়ার উপায় নেই। সাপখোপের বাসা হয়েছে। সম্বল বলতে বাইরের দিকের এই দুটো ঘর। বর্ষাকাল এলেই আমার বুক উড়ে যায়। ছাত চুঁইয়ে জল পড়ে। কোনদিন কড়িবরগা ভেঙে পড়বে মাথায়। বাড়ি-বাড়ি করে মরছ, সেই বাড়ির তলাতেই আমরা চাপা পড়ে মরব একদিন। বিষয় তখন কে আগলাবে শুনি? বাড়ির দাম বলে তো কিছু আর পাবে না, যা পাবে তা জমির দাম। এটা বেচে দিলে যা টাকা আসবে, তাই দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কেনার পরেও কিছু টাকা থেকে যাবে। সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দাও। সুদের টাকায় দুজনের বাকি জীবনটা দিব্যি কেটে যাবে। আমাদের ছেলেপুলে থাকলে নাহয় সব কিছু আগলে রাখার একটা কারণ থাকতে পারত—।

সত্যবান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন— মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। এই মুহূর্তে তা করার একমাত্র উপায় হল, একটাও কথা না বলা। লীলাবতী এই ধরনের কথাবার্তা ইদানীং প্রায়ই বলে থাকেন। সত্যবান প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিতে। সব সময় অবশ্য পারেন না। না পারলে চেঁচামেচি করেন। সেই চেঁচামেচির জেরেই বোধহয় লীলাবতী চুপচাপ থাকেন কিছুদিন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে লীলাবতী গলার স্বর আরও নরম করে বললেন, 'পুষিদি সেদিন আমাকে খুব ভাল একটা পরামর্শ দিয়েছেন।'

ভেতরে ভেতরে আঁতকে উঠেছিলেন সত্যবান। 'আবার তোমার ওই পুষিদি! কী বললেন শুনি?'

কিছু-কিছু কথার ভেতরে আরও একটা কথা থাকে। এই কথাটার মধ্যেও আর একটা কথা খুঁজে পেয়ে লীলাবতী গলা সামান্য তুলে বললেন, 'ভদ্রমহিলাকে তুমি কেন যে দেখতে পারো না, জানি না। খুবই ভাল মানুষ। আমাদের ভাল চান বলেই আগ বাড়িয়ে সুপরামর্শ দেন।'

সত্যবানের চুপ থাকার পরিকল্পনায় বড় রকমের ফাটল ধরে গিয়েছিল এবার। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'সুপরামর্শগুলো খামোখা একে তাকে বিলি না করে নিজেদের জন্যে তুলে রাখতে বোলো। ভদ্রমহিলা তোমার মাথাটা খেয়েছেন। উলটোপালটা বোঝান আর সেগুলো বেদবাক্য হিসেবে মানতে গিয়ে আমাদের সংসারে বিস্তর ঝুটঝামেলা আর অশান্তি ডেকে আনো।'

—তুমি সেধে অশান্তি করতে চাও তাই হয়।

—আমি চাই?

—তা নয়তো কী?

কথার স্রোত কোন্‌দিকে গড়াবে টের পেয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। সুতরাং চুপ করে গিয়ে প্রতিজ্ঞার ওই ফাটল জোড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আসল কথাটা লীলাবতীর এখনও পাড়া হয়নি, সুতরাং উনিও চুপ করে গিয়েছিলেন। একটু বাদে মুখ খুললেন আবার। 'পুষিদির ভাসুরপো হালে প্রোমোটরিতে নেমেছে। অত্যন্ত সৎ, আদর্শবান ছেলে। গোটাকয়েক বাড়ি বানিয়েছে, যারা নিয়েছে তারা সবাই ধন্য-ধন্য করছে। নামমাত্র লাভে বিক্রি করেছে ফ্ল্যাটগুলো। লাভের পরিমাণ অনায়াসে বাড়াতে পারত, কিন্তু তা করেনি। ওর মুখে সব সময় একটাই কথা : লোকে বিশ্বাস করে আমার কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনবে, তারপর দুবেলা গালাগাল দেবে—আমি ওর মধ্যে নেই।'

কিছু বলবেন না ঠিক করেছিলেন সত্যবান, কিন্তু ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—

—প্রতিটি পাকা চোরই এই সব কথা বলে থাকে।

সামান্য ঝাঁজিয়ে উঠলেন লীলাবতী, 'মানুষকে অবিশ্বাস করাটা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।'

—বেছে বেছে শুধু চোর-জোচ্চোর আর ফড়েদের বিশ্বাস করাটাও তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এই স্বভাবটা তৈরি হয়েছে তোমার ওই পুষিদির কল্যাণে।

অন্য সময় হলে লীলাবতী এই রকম একটা জায়গায় নির্ঘাত ফেটে পড়তেন। কিন্তু এখন অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। আসলে, আসল কথাটা যে বলা হয়ে ওঠেনি। আবার মুখ খুলল সত্যবানের। 'তুমি কি ওই সৎ ভাসুরপোর কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনবে বলে ঠিক করেছ?'

লীলাবতীর কণ্ঠে এবার একটু অভিমানের সুর ফুটল। 'তুমি তো আসল কথাটাই আমাকে বলতে দিলে না।'

—কী কথা?

লীলাবতী আর একটু কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর মিহি গলায় বললেন, 'সেদিন

তুমি বাড়িতে ছিলে না—পুষিদির ভাইপো এসেছিল এখানে।'

আঁতকে উঠলেন সত্যবান। 'এখানে? এই বাড়িতে?'

—এখানে শুধু-শুধু আসবে কেন? কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তা, পুষিদিই জোর করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

—তোমাকে বলল, আর তুমি তাই বিশ্বাস করে গেলে! ভাসুরপোকে একটা খদ্দের ধরিয়ে দেবার জন্য তোমার পুষিদিই ওকে খবর দিয়ে ডেকে এনেছিল। তা, তোমাকে সাতমহলা বাড়ির ছবি দেখিয়ে ফ্ল্যাট পছন্দ করিয়ে নিয়ে গিয়েছে তো?

—ঠিক আছে, তুমি যখন সব বুঝেই গিয়েছ, তোমাকে আমি আর কিছু বলব না।

একটু রাগ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে ওদিকের মোড়ায় গিয়ে বসলেন লীলাবতী। ভেবেছিলেন, এতে কাজ হবে। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত তাই হয়। কিন্তু এখন হল না। তার কারণ ওই পুষিদি। পরের সংসারে নাক গলিয়ে সহজ-স্বাভাবিক ব্যাপারগুলো ঘোঁট পাকিয়ে দেওয়ার জন্য ওই মহিলার ওপর সত্যবানের বিতৃষ্ণা এখন যাচ্ছেতাই রকমের বেড়ে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে পাখা ঘোরার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না। সময় আরও কিছুটা গড়াবার পরে লীলাবতী ঠিক করলেন—দরকারি কথাগুলো বলে ফেলা দরকার। গলার স্বর যত দূর সম্ভব নরম করার পরে বললেন, 'ওঁর ভাসুরপো আমাদের বাড়ি এসে যখন শুনল, তুমি নেই—চলে যেতে চাইছিল। তা, আমিই জোর করে বসালাম। বললাম, যা বলাকওয়ার আমাকেই বলো। উনি ফিরলে আমি জানিয়ে দেব। তখন বলল, ঠিক আছে আমি তাহলে একটু ঘুরে দেখি।'

—ঘুরে দেখি মানে? কী ঘুরে দেখবে?

লীলাবতী ঢোক গিলে বললেন, 'তুমি বাড়ির ভেতরের দিকে গত কয়েক বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছ? যাওনি। আমিও যাইনি। তা, সেদিন পুষিদি আর ওর ভাসুরপোকে ভেতরে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখি—ভেতরের দরজার ওপাশের ঘরটাও ধসে পড়েছে। ছেলেটি তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে চারপাশটা ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করল—জমি কতটা? বললাম, সব মিলিয়ে সওয়া ছ'কাঠা। তাই তো?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না সত্যবান।

লীলাবতী বুঝলেন, উত্তর পাওয়া যাবে না। সুতরাং উনি আবার শুরু করলেন।

—পুষিদির ভাইপোর নাম সুদীপ। অসম্ভব ভদ্র। বলল—কাকিমা, আপনাদের বাড়িতে জমি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জমি উদ্ধার করাও আবার বহু খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। দেড়শো বছরের ভাঙাচোরা বাড়ি। ইটকাঠ কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। জমি থেকে চুন-বালি-সুরকির পাহাড় সরাতেই মোটা খরচের ধাক্কা। বাড়ি বানাবার কাজে হাত দিতে হবে তার পরে। এ কাজে আমার বিশেষ কিছুই থাকবে না। কিন্তু আপনি যখন পুষি-কাকিমার বন্ধু—একটা উপায় তো আমাকে বার করতেই হবে।

লীলাবতী আশা করেছিলেন, এবার অন্তত একটা প্রশ্ন শোনা যাবে। কিন্তু একমাত্র শ্রোতা এখনও আগের মতোই নীরব। লক্ষণটা ভাল ঠেকল না লীলাবতীর। বাকি

কথাগুলো চটপট বলার জন্যে মুখ খুললেন আবার। 'সুদীপ বলল, কর্পোরেশন থেকে বাড়ির প্ল্যান ওই বার করবে। বাড়ি বানাবার সব খরচও ওর। যদ্দিন না বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তদ্দিন পর্যন্ত আমাদের ভাড়া বাড়িতে থাকার খরচও ওই টানবে। নতুন বাড়ির একতলায় ও আমাদের একটা তিন-ঘরের ফ্ল্যাট দেবে। সঙ্গে কিছু টাকাও। যদি এখানে থাকতে না চাই, অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কিনিয়ে দেবে। এখানে চারতলা বাড়ি বানাবে ও। সব খরচ-খরচা এখন ওর। হিসেবটিসেব কষে বলল—নতুন বাড়ির মালিকানার পঁয়ষট্টি ভাগ ওর, পঁয়ত্রিশ ভাগ আমাদের।

ধৈর্যের সব বাঁধ এবার ভেঙে গেল সত্যবানের। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আমার আফসোস হচ্ছে—আমি কেন ওই সময় ছিলাম না! থাকলে তোমার ওই পুষি বেড়াল আর বেড়াল ভাসুরপোকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতাম বাড়ি থেকে।'

লীলাবতী আর একটাও কথা না বলে মুখ ভার করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সত্যবানের কানের পাশে আর ঘাড়ে আগুনের হলকা। চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর খানিকটা সহজ বোধ করলেন। কোণের দিকের তেপায়া টেবিলের ওপর জলের জাগ ছিল, দু-গ্লাস জল খেলেন চোঁ-চোঁ করে।

জল খাওয়ার পরেই তাকের নীচে তেঁতুলমাখানো জগদম্বার দিকে নজর গেল ওঁর। তারপর ওখানে গিয়ে বাবু হয়ে বসে তেঁতুল দিয়ে আবার মাজতে শুরু করে দিলেন দেবীমূর্তি।

আধঘণ্টাটাক মাজার পরে একটু বুঝি শিউরে উঠেছিলেন সত্যবান। কালো মূর্তির গা থেকে ঠিকরে বার হচ্ছে সোনালি আভা।

।। তিন।।

আজ সকালের ছবিটাও ঠিক কালকের মতোই। সত্যবান ঘরে বসে বাল্যবন্ধু শিবনাথের সঙ্গে চা খাচ্ছেন, কিন্তু কারও মুখে তেমন কোনও কথা নেই। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এখানে থাকলে দুই বন্ধুর চা খাওয়ার ধরন দেখে অনায়াসে বুঝতে পারত, দুজনেই চা খাওয়ার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারতে চাইছেন।

চা শেষ হওয়ার পরেই দুই বন্ধু একটু তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। বাড়ি কিছুটা পিছিয়ে পড়ার পরে শিবনাথ কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, কাল রাত্তিরে আর কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখলে?'

দুদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে শুকনো মুখে উত্তর দিলেন সত্যবান, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে কোনও কথা মুখে এল না শিবনাথের। আরও কয়েক পা হাঁটার পরে বললেন, 'ঠাকুরদেব্‌তার রহস্য আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। তবে আমার মন বলছে সতু, তোমার এ স্বপ্ন কিন্তু বৃথা যাবার নয়। কাল বাড়ি ফেরার পরে একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল পরিষ্কার। সিমুরা রাজবাড়ির কথা জানো তো?'

দুদিকে মাথা নাড়লেন সত্যবান।

—হুগলির দিকে। সিমুরা রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী বড় জাগ্রত দেবী। অনেক কাল আগে আমি রাজবাড়ির ওই মন্দিরে গিয়েছিলাম একবার। তখন আমার অল্প বয়েস। ঠাকুরদেবতা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতাম না তখন, কিন্তু মায়ের মুখটা আজও মনে আছে। মুখ না বলে চোখ বলাই ভাল। পাথরের মূর্তি। মুখের আন্দাজে চোখদুটো বেশ বড়। নাকের পাশ থেকে শুরু হয়ে একেবারে কান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর কী জ্বলজ্বলে চোখ! আচ্ছা, তোমার কি বিকাশ সিংহরায়ের কথা মনে আছে?

—উহুঁ।

—আমার কলেজ-আমলের বন্ধু। সেই সময় বেশ কয়েকবার এসেছে আমাদের বাড়িতে। তোমার সঙ্গে তো আলাপ হওয়ার কথা। হয়তো ভুলে গেছ। কমদিনের কথা তো নয়। তা, একবার ওই জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে বিকাশের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও দিকে খুব জগদ্ধাত্রী পুজো-টুজো হয়। বিকাশদের গ্রামের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মাপ ছিল বিশাল, প্রায় দেড়তলা সমান। পুজো উপলক্ষে গ্রামে মস্ত বড় মেলা বসত। জমজমাট মেলা। পুজোর আগে মেলা শুরু হত, শেষ হত বিসর্জনের দিন। ক'টা দিন ছিলাম বিকাশদের বাড়িতে। তা, কোথাও গেলে তো চারপাশটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। বিকাশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তোদের এখানে দেখার কী আছে রে? ওর উত্তরটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। বলেছিল—তোরা শহুরে ভূত। গ্রামে যখন এসে পড়েছিস, তখন ভাল করে গ্রামটা দেখ। তবে যদি হাঁটতে কষ্ট না হয়, গ্রামের বাইরে ভাঙাচোরা একটা রাজবাড়ি আছে, দেখে আসতে পারিস। বললাম—ভাঙা হলেও রাজবাড়ি তো। দেখতে যাব, চল্। তা, ওটাই হচ্ছে সিমুরা রাজবাড়ি।

রাজবাড়ি সম্পর্কে কোনওরকম আগ্রহ দেখালেন না সত্যবান।

স্মৃতিচারণ করে শিবনাথ কিন্তু বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন। 'গেলাম বিকাশের সঙ্গে রাজবাড়ি দেখতে। এক সময় নাকি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল গোটা রাজবাড়ি। সেই পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ কোথাও-কোথাও ছিল, বাকিটা গরু চরার মাঠ। রাজবাড়ি, কেল্লা ভেঙেচুরে পড়ে আছে। মস্ত মজা ইঁদারা। শুধু টিকে আছে একটা মন্দির। মন্দিরটা নাকি রাজার বাড়ি বানানোর অনেক পরে বানানো। মন্দিরের অবস্থাও খারাপ। পলেস্তারা খসে গিয়েছে। দেয়ালে অসংখ্য বটগাছ। বিকাশ বলল, এক সময়ে রাজা নাকি খুব ঘটা করে জগদ্ধাত্রী পুজো করতেন। তা এ আর কী এমন নতুন কথা! রাজারা ঘটা করবে না তো কে করবে? মন্দিরটা না দেখেই চলে আসার তাল করছিলাম। বিকাশ তখন বলেছিল—অ্যাদ্দুর যখন এসেছিস, মাকে একটা পেন্নাম ঠুকে যাবি না? দেবী খুব জাগ্রত। রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীকে তুলে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।'

স্বপ্নাদেশের কথা কানে যেতেই আগ্রহী শ্রোতা হয়ে উঠেছিলেন সত্যবান।

—কী স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রাজা?

কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু কারখানার পাশে ওই পাথরের স্ল্যাবটার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অনেক দিন ধরে এখানে আসার জন্যে পাথরের টুকরোটার দুটো জায়গা দুজনের বসার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বসার পরে শিবনাথ বললেন, 'বিকাশের

মুখে স্বপ্নে পাওয়া দেবীমূর্তির কথা শুনে বলেছিলাম—'স্বপ্নে পাওয়া? তা হলে তো দেখতেই হয়। গিয়ে দেখি, এক বুড়ো পুরুত জগদ্ধাত্রীর পুজো করছে। পুরুতও নাকি রহস্যময়। কবে এসেছে, কোত্থেকে এসেছে—কেউ জানে না। অল্প বয়েসে এসেছিল, আর আমি যখন দেখি তখন তো রীতিমত বুড়ো। পুরুত সম্পর্কেও জনশ্রুতি আছে। ওই পুরুত মারা গেলে আবার একজন অচেনা-অজানা পুরুত হাজির হয়ে যাবে মন্দিরে। এই ভাবেই নাকি চলে আসছে বহুকাল ধরে।'

কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। 'আরে! রাজা কী স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন, সেটা তো বললে না?'

—বলছি। রাজা এক রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলেন—দেবী জগদ্ধাত্রী বলছেন : আমি তোর দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে পড়ে আছি। আমাকে নিয়ে আয়।

—পেলেন রাজা?

—না। ভোরবেলায় দিঘির উত্তর-পশ্চিম পাড়ে গিয়ে রাজা দেখলেন, কোথাও কোনও মূর্তির চিহ্নমাত্র নেই। রাজার আমলে রাজবাড়ির প্রতিটি এলাকাই ছিল ঝকঝকে তকতকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আগাছা-টাগাছা নেই যে বিগ্রহ কোথাও চাপা পড়ে থাকবে। রাজা খুঁজলেন, রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজার লোকজনও খোঁজাখুঁজি চালাল। দিঘির শুধু একটা জায়গায় নয়, চারদিকে। কিন্তু মূর্তি তো দূরের কথা, পাথরের ছোট একটা টুকরোও কোথাও মিলল না।

সত্যবান পাথরের স্ল্যাবে টানটান হয়ে বসেছিলেন। চোখেমুখে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ার চিহ্ন। 'কোথায় পেলেন তা হলে?'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল শিবনাথের মুখে। 'সবাইতো রাজা হতে পারে না। রাজা আর প্রজার মধ্যে বুদ্ধির তফাত থাকে অনেক। কোথাও মূর্তি না পেয়ে রাজা আদেশ দিলেন : দিঘির উত্তর-পশ্চিম পাড়ের মাটি খুঁড়তে শুরু করে দাও। অমনি জনাপঞ্চাশ লোক গাঁইতি, কোদাল, শাবল নিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। তিনদিন ধরে সমানে অনেকটা জায়গা খোঁড়াখুঁড়ি করার পরে পাওয়া গেল পাথরের জগদ্ধাত্রী মূর্তি। সেই মূর্তিই এই মূর্তি। রাজা সে মূর্তি মাথায় করে প্রাসাদে ফিরলেন। সেই রাতেই আবার স্বপ্ন দেখলেন রাজা। স্বপ্নে দেবী জগদ্ধাত্রী বললেন, একটা মন্দির বানিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর। একটা কথা, নিজের হাতে তুই আমার পুজো করবি। পরদিন সকালেই শুরু হয়ে গেল মন্দির বানানোর কাজ। কয়েকশো লোক হাত লাগিয়েছিল একসঙ্গে। শোনা যায়, অতবড় মন্দির বানানোর কাজ শেষ হয়েছিল মাত্র তিনদিনের মধ্যে। ধুমধাম করে মন্দিরে জগদ্ধাত্রীর প্রতিষ্ঠা হল। রাজা প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরে দেবীর পূজা করতেন। ফলও পেলেন হাতে হাতে।'

—কী ফল?

—রাজার সমৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। যেখানে হাত দেন সেখানেই সোনা ফলে। অনেক রকম ব্যবসাবাণিজ্য ছিল রাজার, কিন্তু বাণিজ্যে মন্দা চলছিল। সেই মন্দা কেটে গিয়েছিল রাতারাতি। রাজবাড়ির কাছেই একটা নদী ছিল তখন। নদীতে জোরালো বান আসত

প্রতি বছর, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হত বিস্তর, কিন্তু মন্দিরে ওই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরে আর কখনও নাকি ভয়ঙ্কর ওই বন্যা হয়নি। অতিবৃষ্টি আর খরা—দুটোরই খুব উৎপাত ছিল; সে সবও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খেতে ফসল, পুকুরে মাছ—প্রজাদের অভাব-অনটন বলে আর কিছু রইল না। যে দেশে সবাই সুখেশান্তিতে থাকে, সেখানে চুরিডাকাতিও হয় না। সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল রাজাকে। রাজা নাকি তার উত্তরে হাতজোড় করে বলতেন : আমি কিছু নই, কৃতজ্ঞতা যদি তোমাদের জানাতেই হয়, মন্দিরে গিয়ে জানাও। মাঝেমধ্যে ওই রাজ্যে বর্গির হাঙ্গামা হত, কিন্তু রাজার সৈন্যরা তাদের এবার এমন পেটান পেটাল যে, বর্গিরা আর কখনও ওমুখো হয়নি।

মুগ্ধ হয়ে রাজকাহিনী শুনছিলেন সত্যবান, বন্ধু থামতেই বললেন, 'তা রাজত্ব নষ্ট হল কবে? ওই রাজা মারা যাওয়ার পরে?'

আর একবার রহস্যময় হাসি ফুটল শিবনাথের মুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'না-না, ওই রাজা বেঁচে থাকতে থাকতেই। সোনার দেশ পুড়ে ছাই হল। মহামারীতেও গাঁয়ের অনেকে এক ধাক্কায় উজাড় হল। পুকুর, দিঘির জল শুকলো। এমনকি নদীও গতিপথ পালটে সরে গিয়েছিল অনেক দূরে।'

—সে কী? কেন?

—কেন আবার! রাজার মতিভ্রম হয়েছিল। সম্পদ কয়েকশো গুণ বেড়ে যাওয়ার পরে রাজার মনে হয়েছিল—তিনিই জগদীশ্বর। এই যে এত বাড়বাড়ন্ত, সে সব ওঁর বিচক্ষণতাতেই হয়েছে। বিলাসে গা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন রাজা। দিনরাত কাটত নাচঘরেই। সকালে স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে মন্দিরে গিয়ে পুজো করা শিকেয় উঠল। শোনা যায়, ওই সময় দেবী নাকি একবার রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বিস্তর বকাবকিও করেছিলেন—!

—বকাবকি?

—হ্যাঁ, এও শোনা যায়, রাজা নাকি ওই স্বপ্নের মধ্যেই দেবীকে গালমন্দ করেছিলেন। ব্যস, তারপরেই বেলুন চিপসে গিয়েছিল। রাজ্য জুড়ে অত যে রমরমা, সে সব নাকি ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গিয়েছিল। অত বড় রাজা দেখতে দেখতে ফকির হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বিচ্ছিরি অসুখে ধরল রাজাকে। ওই অসুখেই মারা যান তিনি।

—সত্যি?

—সত্যিমিথ্যে আমি কী করে বলব সতু? সে দিন যা শুনেছিলাম, তাই তোমাকে বললাম। লোকের মুখে মুখে কথা একটু বেড়ে যায় সত্যি, কিন্তু কিছু বাদছাদ দিলেও যা থাকে, তাও তো ভয়ঙ্কর! তবে রাজবাড়ির পাশ থেকে নদী সরে যাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি। আর লোকে রাতারাতি ভীষণ ফুলেফেঁপে উঠলে যে সাপের পাঁচ পা দেখে— এটাও তো বাজে কথা নয়।

সব শুনে কেমন যেন থম্ মেরে গিয়েছিলেন সত্যবান।

স্মৃতিচারণের জের এখনও শিবনাথের কথায়। নিচু গলায় বললেন, 'কাল তোমার সঙ্গে কথাটথা বলে বাড়ি ফেরার পরেই এই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। আমার কী মনে হয় জানো?'

—কী?

—তোমার স্বপ্নাদেশ সত্যি হবে।

বিষণ্ণ একটা হাসি ফুটে উঠেছিল সত্যবানের মুখে। তারপর আপত্তি তোলার গলায় বললেন, 'কিন্তু তার তো কোনও সম্ভাবনাই দেখছি না। বাড়ির সামনে গাছ থাকলে তবে তো তার তলা খুঁড়ব। ঘড়াভর্তি মোহর পাই বা না পাই—সে তো তার পরের ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা কী জানো, ইদানীং খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কলসির জল গড়িয়ে খেলে সে জল তো একদিন ফুরোবেই। জমানো টাকা ভাঙতে ভাঙতে একেবারে শেষের দিকে এসে পড়েছে। লীলার অসুখে দেনাও হয়ে গিয়েছে একগাদা। অন্যান্য কিছু ধারবাকিও আছে। দুর্ভাবনায় মনের জোর কমে। আর জোর কমলেই লোকে দুঃস্বপ্ন দেখে। আমার ওই স্বপ্নটা বোধ হয় ওই রকমই কিছু একটা হবে।'

রীতিমত প্রতিবাদ করার গলায় বলে উঠলেন শিবনাথ, 'এটা দুঃস্বপ্ন কোথায়? এ তো স্বপ্নাদেশ। তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো সতু, এমন স্বপ্ন তুমি কি তোমার জীবনে আর কখনও দেখেছ?'

প্রশ্নের জবাবে সত্যবান কিছুই বললেন না।

নিজের কথার আবার খেই ধরলেন শিবনাথ। 'দেখনি, কখনওই দেখনি। দেখলে আমাকে বলতে। আমিও আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কোনও স্বপ্ন তোমার ওই স্বপ্নের ধারকাছ দিয়ে যায়নি। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তো অনেক স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে, কিন্তু কই, কেউ কি স্বপ্নাদেশ পেয়েছে? বলো?'

সত্যবান এবারও কিছু বললেন না।

—পায়নি। পেলে আমাদের বলত। স্বপ্ন আর স্বপ্নাদেশ এক নয়। রাজা প্রতাপাদিত্য স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। দেবী যশোরেশ্বরী রাজাকে স্বপ্নের মধ্যেই জানিয়েছিলেন—আমি জঙ্গলে অমুক জায়গায় পড়ে আছি। আমাকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করো। ঘুম ভাঙার পরেই রাজা জঙ্গলে ছুটে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বিগ্রহ পেয়েছিলেন। তারপরেই তো সে মন্দিরে যশোরেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা। যশোরেশ্বরীর মন্দির তো গালগপ্পো নয়, ঐতিহাসিক সত্য। মন্দিরটা যখন সত্যি, পেছনের ওই কাহিনিকে অবিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। শোনো, বয়েসের সুবাদে তোমার আমার ধর্মে একটু মতি হয়েছে। কিন্তু ধম্মকম্ম করা বলতে যা বোঝায়, তা তো তুমি বা আমি কেউই করি না। তোমার হঠাৎ এমন একটা স্বপ্নাদেশ পাওয়া, কী বলব—যাকে বলে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সব মানুষেরই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা কখনও কখনও কমবেশি কাজ করে থাকে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এ স্বপ্নাদেশ মিথ্যে হওয়ার নয়। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। মা হয়তো তোমাকে আর একবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলবেন। কাল দেখা পাওনি, তাতে কী হয়েছে? হয়তো আজ রাতেই স্বপ্নে—।

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে হতাশ মানুষের ভঙ্গিতে সত্যবান বললেন, 'আর স্বপ্ন! ঘুমোলে তবে তো স্বপ্ন দেখার প্রশ্ন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, কাল রাত্তিরে দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। জেগেজেগেই রাতটা কাবার করে দিয়েছি।'

বাগে পেলে মানুষের গলা যেমন হয়, ঠিক সেই গলাতেই শিবনাথ বললেন, 'তবে! তুমি ঘুমোবেই না, অথচ স্বপ্ন দেখার আশা করছ! তা কী করে হয়? এটা তো জেগে স্বপ্ন দেখার বিষয় নয়। শোনো সতু, তুমি নাস্তিক হতে চাও, হও। কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এক্ষুনি-এক্ষুনি হোয়ো না। দৈবীলীলা দেখার জন্যে ক'টা দিন সরল মনে অপেক্ষা করো। দেবদেবীরা যাকে-তাকে কৃপা করেন না। করার আগে নিজস্ব ধাঁচে ওঁরাও একটু স্ক্রুটিনি করে নেন। কাল রাত্তিরে তুমি ঘুমোতে পারনি শুনে আমি তো বেশ আশ্বস্ত বোধ করছি। আজ রাতেই হয়তো মা জগদম্বা তোমাকে দেখা দেবেন।'

বন্ধুর কথা শুনে হতাশ সত্যবানের চোখেমুখে বোধ হয় একচিলতে আলোর রেখা ফুটে উঠেছিল। আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে বাড়ির পথ ধরেছিল দুই বন্ধু। সত্যবান এখন আবার কিছুটা সহজ-স্বাভাবিক বোধ করছিলেন। রোদ্দুরে চড়া ভাব থাকলেও গায়ে তেমন লাগছিল না। কিন্তু বন্ধুকে ছেড়ে একা বাড়ি ফিরতেই ওঁর মধ্যে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব জেগে উঠেছিল। লীলাবতী তীব্র দৃষ্টিতে একবার ওঁকে দেখে নিলেন।

দ্বিতীয়বার ওই দৃষ্টির সামনে না পড়ার জন্যেই খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে মুখটা আড়াল করলেন সত্যবান। ভঙ্গিটা কাগজ পড়ার, কিন্তু অক্ষরগুলো চোখের সামনে ভাসলেও অর্থ মগজে ঢুকছিল না।

ধারালো চোখের লীলাবতী ঘরের মধ্যেই ছিলেন। একটু বাদে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কই, এল না তো?'

মুখের সামনে থেকে কাগজ সরালেন সত্যবান। 'কে?'

—যার আসার কথা ছিল।

—কার?

—কার আবার, কুলির।

—কুলি!

নির্মম ঠাট্টাটা এবার অক্লেশে বেরিয়ে এল লীলাবতীর মুখ থেকে। 'সাত ঘড়া মোহর নিয়ে কুলির আসার কথা ছিল, এল না তো এখনও!'

খবরের কাগজ দিয়ে আবার মুখ আড়াল করলেন সত্যবান। লীলাবতী কিন্তু থামলেন না। 'বড় বড় ঘড়া বোধ হয়। আনতে কি সেইজন্যেই এত সময় লাগছে?'

কাগজের আড়ালটা মুখের আরও কাছে নিয়ে এসেছিলেন সত্যবান। ঠাট্টার হাসি একচোট হেসে নিয়ে লীলাবতী বললেন, 'নাকি মোহরের কথা পাঁচ কান হওয়ার ভয়ে বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছ এখন।'

কথার জ্বলুনি গায়ে ধরে গিয়েছিল সত্যবানের। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। আর ক'টা দিন প্রতিটি ব্যাপারে অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। একটু আগেই শিবনাথ দৈবীলীলার কথা বলছিল। ওই দৈবীলীলার কাছে লীলাবতী কিছুই নয়।

কানের দুপাশে আগুনের হলকা বইতে শুরু করেছিল সত্যবানের। রক্তচাপ হঠাৎই বুঝি বেড়ে গেছে কিছুটা কিন্তু সেটা মন্দের ভাল। ওই চাপের জন্যেই বোধ হয় লীলাবতীর বাকি কথাগুলো ওঁর কানে ঠিক ভাবে ঢুকতে পারছিল না।

।। চার ।।

বহুকালের পুরনো পাড়া, কিন্তু বাড়িঘরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ পুরনো হতে পারে না। সত্যবান কিছুদিন আগেও এখানে বেশ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের দেখা পেতেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ইদানীং বেশ কমে গেছে। কেউ পট করে মারা গিয়েছেন, কেউ বা বিছানা নিয়েছেন। কারও কারও ক্ষেত্রে ওই বিছানাটাই শেষ বিছানা। কেউ বা কোনও মতে সামাল দিয়ে পথে বের হন মাঝেমধ্যে। গিরিশ বিশ্বাস এঁদেরই একজন। লাঠি ঠুকঠুক করে সত্যবানদের বাড়ির সামনে এসে হাঁক পাড়লেন, 'সতু, বাড়ি আছ নাকি?'

দরজার কাছাকাছিই ছিলেন লীলাবতী, পরম সমাদরের সঙ্গে বৃদ্ধ মানুষটিকে ঘরে এনে বসালেন। গিরিশ বিশ্বাসের দু-তিনটির বেশি দাঁত নেই, একগাল হেসে বললেন, 'চলেই গিয়েছিলাম প্রায়। তা ভগবানের কী ইচ্ছে কে জানে! হয়তো তোমাদের শেষবারের মতো দেখার জন্যেই শরীরে একটু জুত এনে দিয়েছেন। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করছিল, কিন্তু আমি শুনিনি। দাঁড়াতে যখন পেরেছি, আস্তে আস্তে একটুখানি বেরুতেও পারব। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই তো শিবমন্দির, মন্দির দর্শন করেই সোজা চলে এলাম তোমাদের বাড়িতে।'

লীলাবতী বললেন, 'খুব ভাল করেছেন। এককালে কত আসতেন, কত গল্প করতেন। সেই দিনগুলোর কথা প্রায়ই মনে পড়ে যায় আমাদের।'

গিরিশ বিশ্বাসেরা এ পাড়ার তিন পুরুষের বাসিন্দা। লীলাবতীর কথায় একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'আমরা পুরনো দিনের মানুষ, আমাদের শেষ সম্বল বলতে এখন শুধুই পুরনো দিনের স্মৃতি। জন্মেছি এই পাড়ায়। বয়স নব্বই হতে চলল। চোখের সামনে কত কিছুই পালটে যেতে দেখলাম। এখন আর কিছু পালটে যাওয়া দেখতে ভাল লাগে না। কী ছিল আমাদের সেই সময়টা!'

বুড়ো মানুষেরা সবচেয়ে ভালবাসেন পুরনো দিনের গল্প করতে। তো সেই গল্পই জুড়ে দিয়েছিলেন গিরিশ বিশ্বাস। সত্যবান দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে একটু ভেতরের ঘরে শুয়েছিলেন। আগের রাত্তিরে ঘুম তেমন হয়নি বলেই শুতে না শুতেই চোখ জুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেননি। গিরিশ বিশ্বাসের গলা বেশ ভারী, আর কানে কম শোনেন বলেই বোধ হয় গলা সামান্য উঁচুতে তুলে কথা বলেন। সত্যবান ঘরে ঢুকতেই আগের কথার জের টেনে বললেন, 'কবেকার কথা! সতু, তুমি তখন জন্মাওনি—।'

মধ্যযাটের মানুষেরা এ ধরনের কথা ধরতে গেলে কখনওই শোনেন না। একটু বুঝি চমকে উঠে সত্যবান ও দিকের চেয়ারে বসতেই গিরিশ বিশ্বাস ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তখন আমার বয়েস বাইশ-তেইশ। এখন যেখানে দুধের ডিপো, সেখানে তখন সদানন্দবাবুর কুস্তির আখড়া ছিল। আমরা কুস্তি করতাম। লাঠি আর ছুরি খেলাও শিখতাম। তখন আমাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল দেশ থেকে ব্রিটিশ তাড়ানো।

আজ এখানে, কাল সেখানে পিকেটিং করতাম। তোমার বাবা, মানে প্রণবদার আমাদের দলে আসার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওঁর বাবা অর্থাৎ তোমার ঠাকুরদার ভয়ে আসতে পারতেন না। তোমার ঠাকুরদা হরিহর জ্যাঠার তখন লালমুখো সাহেবসুবোর সঙ্গে ওঠাবসা। কী দাপট ছিল ওঁর! এ পাড়ায় তখন বেশ কয়েকটা গোয়াল ছিল, গোয়ালে গরু ছিল বিস্তর; কিন্তু একটাও বাঘ ছিল না। থাকলে হরিহর জ্যাঠা নির্ঘাত সেই বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন।'

নিজের রসিকতায় নিজেই একচোট হেসে নিয়েছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি। হাসি-হাসি মুখে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'গিরিশকাকু, আপনার বয়েস এখন ঠিক কত হল?'

ঠোঁট নাড়িয়ে বিড়বিড় করে একটু হিসেবে কযে উত্তর দিলেন কাকু, 'অষ্টআশি। এ পাড়ায় পুরনো আমলের যে দু-চারটে লোক এখনও বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে আমার বয়েসই সব চাইতে বেশি। বেশিদিন বাঁচাটা বড় কষ্টের। বেশি শোকতাপ পেতে হয়।'

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য লীলাবতী বললেন, 'ওঁর ঠাকুরদার আমলে এ বাড়িতে তো আপনার খুব যাতায়াত ছিল। তাই না?'

মধুর স্মৃতিচারণে আবার মজে গেলেন বৃদ্ধ মানুষটি। ঝলমলে মুখে বললেন, 'খুব যাতায়াত ছিল। আমরা ছিলাম বাড়ির ছেলে। হয়তো সকালে আড্ডা মারতে এসেছি, গল্পে গল্পে বেলা হয়ে গিয়েছে। ব্যস, আর বেরুবার জো নেই।'

'কেন?'

'এ বাড়ির হুকুম বড় কড়া ছিল। দুপুর হয়ে গেলে কোনও অতিথিই ভাত না খেয়ে এখান থেকে বেরুতে পারত না। রোজ দুপুরে এই বাড়িতে তিরিশ-চল্লিশটা করে পাত পড়ত। তোমার ঠাকুরদার আমলে এ বাড়ির চেহারা ছিল রাজবাড়ির মতো। বাড়ির পেছনদিকে এক বিঘে জমি ছিল তোমাদের। সেই জমিতে মস্ত একটা বাগান ছিল। বাড়ি-বাগান দেখাশোনা করার জন্য কত যে দাসদাসী ছিল তোমাদের! লোকে বলত, এ বাড়িতে লক্ষ্মী অচলা। ব্যবসার পত্তন তোমার ঠাকুরদার বাবার আমলে, কিন্তু রাতারাতি সেটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন তোমার ঠাকুরদা। অমন ব্যবসাবুদ্ধি তখন খুব কম বাঙালিরই ছিল। দানধ্যানও করতেন প্রচুর। কিন্তু গ্রহের ফেরে সব গেল।'

'গ্রহের ফের কেন বলছেন?'

'গ্রহের ফের না হলে বিচক্ষণ মানুষের কি কখনও মতিভ্রম হয়? বদবুদ্ধি দেওয়ার লোক জুটে গেল কয়েকটা। সেই সঙ্গে একঝাঁক তোষামুদে পরগাছা। সেই আমলে কারবারি বড়মানুষদের অনেকেই রাজার জাতকে খুশি করতে গিয়ে একটু-আধটু মদ ধরেছিল। বাগানবাড়িতে পার্টিটার্টিও দিতে হত। বাইনাচ না হলে কি আর বাগানবাড়ির ফুর্তি জমে! আমি কিন্তু তার মধ্যে কোনও দোষ দেখি না। যেখানকার যে নিয়ম। তুমি এটা না করলে তোমার ব্যবসা অন্য হাতে চলে যাবে। কিন্তু সব কিছুর তো একটা মাত্রা থাকা উচিত। কী, আমি অন্যায় কিছু বলেছি?'

সত্যবান বুঝলেন, ওঁর দিকে তাকিয়ে বলা হলেও এ প্রশ্নটা ওঁকে করা হয়নি। গিরিশ

বিশ্বাস আগের কথার খেই ধরলেন আবার। 'মাত্রা যাচ্ছেতাই ভাবে ছাড়িয়ে গেলে কী বিপদ হতে পারে, সে তো আমাদের নিজের চোখে দেখা—। সব ঘটে গিয়েছিল ভোজবাজির মতো। রাজার ফকির হওয়া বলতে কী বোঝায়—তা তোমার ঠাকুরদাকে দেখেই বুঝেছিলাম। প্রথমে গেল মোটরকার, তারপর এক এক করে তিনটে ফিটনগাড়িই। তোমাদের বাড়ির পেছনে একবিঘে ফলন্ত বাগানও গেল। বাড়ির বেশ কিছু কাজের লোককে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। ব্যবসার হাল তো বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তবে আমি কিছু-কিছু শুনেছি তোমার বাবার মুখে। মাঝেমধ্যে ভাবি, প্রণবদা যদি ওই সময় একটু শক্ত হাতে হাল ধরতেন! ওঁকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঠিক সময়ে হাল ধরার সুযোগটা তো পাওয়া দরকার। উল্কা দেখেছ তো? যেমন তাড়াতাড়ি ওঠে, তেমন তাড়াতাড়িই পড়ে। প্রণবদা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তোমার ঠাকুরদার অত বড় কারবার একেবারে ভোঁ-ভাঁ। মাঝবয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলেন তোমার ঠাকুরদা। আর, তোমার বাবা জীবন শুরুই করলেন মস্ত দেনা মাথায় নিয়ে। তবে ভেঙে পড়ার মানুষ ছিলেন না প্রণবদা। কয়েকটা বছর ওঁকে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছিল। অনেকটাই সামলে নিয়েছিলেন। প্রণবদা আমাকে খুব ভালবাসতেন। একদিন বলেছিলেন —গিরিশ, ইতিহাস বইতে তো কত রাজত্ব পুনরুদ্ধারের কাহিনি লেখা থাকে। আমি কি আমাদের হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারব না? বড় টান ভাই। যখন দখলে ছিল, তখন বুঝতে পারিনি ওগুলোর ওপর আমার কত মায়া! হাতছাড়া হওয়ার পরেই টের পেয়েছিলাম—কত গভীরে ছড়িয়ে গেছে আমার শেকড়। ওহ্! ফলন্ত বাগানের কাছে খুব লম্বা একতলা একটা দালানও ছিল তোমাদের। সহিস, মালি আর দারোয়ানরা থাকত। তুমি কি দেখেছ সেই বাড়িটা?'

গিরিশ বিশ্বাসের মুখে দূর অতীতের নানা কাহিনি শুনতে শুনতে সুখস্মৃতিতে ডুব দিয়েছিলেন সত্যবান। বয়েস হয়ে গেলে পুরনো দিনের কথা শুধু বলতেই নয়, শুনতেও বুঝি সমান ভাল লাগে। প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ মানুষটি মধ্যষাটের সত্যবানের সঙ্গে এমন ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন—যেন অল্পবয়সী কাউকে রূপকথা শোনাতে বসেছেন। স্মৃতির অতলে চলে গিয়েছিলেন সত্যবান, একই প্রশ্ন আর একবার শোনার পরে বললেন, 'হ্যাঁ, মনে আছে। তখন আমি খুবই ছোট। অনেকগুলো মোটা-মোটা থাম ছিল ওই বাড়িতে। আমরা ওখানে লুকোচুরি খেলতাম।'

সায় দিয়ে গিরিশ বিশ্বাস বললেন, 'ঠিক বলেছ। লম্বাটে দালানবাড়িটার সঙ্গে আর কোনও বাড়ির মিল ছিল না। বাড়িটাকে এখনও আমি ছবির মতো দেখতে পাই। তোমার ঠাকুরদার অবস্থা তখন রাতারাতি পড়ে গেছে। হরেন সাহা জলের দরে ওই বাড়িটা কিনে নিয়ে ওখানে তিনতলা বাড়ি বানাল। তোমার বাবা ওই বাড়িটার দিকে তাকাতে পারতেন না। ওই বাড়ির পাশ দিয়ে বাজারে যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা ছিল, কিন্তু তোমার বাবা কখনও ওই পথ দিয়ে বাজারে যেতেন না। ঘুরপথে বেশ কিছুটা পথ ভেঙে বাজারে যাতায়াত করতেন। তখন আমরা ওই নিয়ে হাসাহাসি করতাম। কিন্তু বয়েস বাড়ার পর বুঝেছিলাম, তোমার বাবার ব্যথাটা কোথায়, আর তা কতখানি খাঁটি!

বাপ-ঠাকুরদার বাড়িতে বেড়ে উঠলে বোধ হয় সে বাড়ির বন্ধন নাড়ির বন্ধনের মতোই হয়ে যায়।'

গিরিশ বিশ্বাসের কথায় লম্বা করে সায় দিলেন সত্যবান। 'ঠিক বলেছেন আপনি।'

বৃদ্ধ মানুষটি বহু পেছনের সেই দিনগুলির মধ্যেই বোধ হয় রয়ে গিয়েছিলেন। স্মৃতি-চারণের গলায় বললেন, 'তোমার বাবা অবস্থা বেশ কিছুটা সামাল দিতে পেরেছিলেন। ব্যবসাবুদ্ধি ওঁরও কিছু ছিল। আর ছিল পরিশ্রম করার ক্ষমতা। সব তো আমাদের চোখে দেখা। রাতে চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোতেন। বাকি সময়টা সে কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম! মহাজনের দেনা শোধ করলেন। তারপর শুরু হয়েছিল গড়ার পালা। কিন্তু গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। তবু মনে হয়—উনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত পেরে উঠতেন। কিন্তু ভবিতব্যকে কে খণ্ডাবে বলো?'

অতিরিক্ত পরিশ্রমই ওঁর অকালমৃত্যুর কারণ। তুমি যখন পারিবারিক ব্যবসা ছেড়েছুড়ে চাকরি করতে গেলে, অনেকে অনেক কিছু বললেও আমি কিন্তু খুশি হয়েছিলাম। চাকরি মানেই বাঁধাধরা সময়ের কাজ। রোজ রাত্তিরে দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে যাওয়া নয়। বিশ্রাম আছে, অবসর সময়ের নির্ভেজাল আনন্দ আছে। ছোট সংসার, বাড়তি দায়দায়িত্ব নেই। তা ছাড়া তোমার অভাবটাই বা কোথায়? এত বড় পৈতৃক বাড়ি!'

লীলাবতী এবার একটু ঠোঁট ওলটালেন, 'বড় বাড়ি থাকলেই তো শুধু হয় না। তার তো রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। বাড়ির দশা তো দেখছেন আপনি। আমার রীতিমত ভয় হয় কোনদিন না বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে মাথায়!'

বিরক্ত হলেন সত্যবান। চাপা গলায় বললেন, 'কিচ্ছু ভেঙে পড়ার দশা হয়নি। গত বর্ষার আগেই তো বাড়ি সারিয়েছি।'

—ওটাকে কি সারানো বলে? কোনওরকমে জোড়াতালি দেওয়া। কাজের কাজ কিচ্ছু হয় না, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ!

অসহিষ্ণুতা বাড়ছিল সত্যবানের। 'কেন কাজ হবে না? যথেষ্টই হয়েছে। আগে বর্ষায় সিলিং চুঁইয়ে জল পড়ত ঘরে, কিন্তু গতবার তো এককোঁটাও পড়েনি।'

—গতবার পড়েনি তো কী হয়েছে, এবার পড়বে।

সত্যবান একটু গলা তুলে বললেন, 'বুঝলেন গিরিশকাকু, দু-তিন বছর আগে এক এনজিনিয়ারকে এনে বাড়িটা দেখিয়েছিলাম। বলেছিলাম, গোটা বাড়িটাই সারাব। শুধু সারানোই নয়, কনস্ট্রাকশন একটু এদিক-ওদিক করে নিয়ে খানিকটা হাল ফ্যাশনেরও করে নেব। তা, আপনি একটা এস্টিমেট দিন তো। উনি দিয়েওছিলেন। আসলে বাড়িটা প্রকাণ্ড, তার ওপর এতদিনের পুরনো। খরচ একটু বেশি তো হবেই। আপনি বাড়িরই লোক, আপনাকে বলতে কোনও বাধা নেই। গোটাতিনেক ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর হবে শিগ্‌গিরই। তারপরই কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছে আছে আমার।'

খুব চাপা হিসহিসে গলায় লীলাবতী বললেন, 'ওই টাকা এই পোড়োবাড়ির পেছনে খরচা করলে খাবেটা কী? হাওয়া?'

গিরিশ বিশ্বাস কানে খাটো। কথাটা নির্ঘাত উনি শুনতে পাননি। সত্যবান শুনেছেন।

কথার জ্বালায় গা চিড়বিড় করে উঠেছিল, কিন্তু এমন ভাব দেখালেন যেন কথাটা ওঁর কানেও যায়নি।

আবার দূর অতীতে ডুব দিয়েছিলেন গিরিশ বিশ্বাস। 'আহা! কী চেহারা ছিল তখন এ বাড়ির! এখানে তো নয়ই, আশেপাশের কোনও এলাকাতেই এমন বাড়ি তখন আর একটাও ছিল না। বাড়ির বয়েস তো কম হল না। আজকের এই বাড়ি দেখে সে দিনের সেই বাড়ির চেহারা কল্পনা করা কঠিন। তবে তুমি বেশ ভাল ভাবে বাড়ি সংস্কার করাতে চাও জেনে খুব আনন্দ পেলাম, সতু। বাড়ি মানে শুধু ইঁট, বালি, সিমেন্ট নয়—এই সব বাড়ির সঙ্গে পিতৃপুরুষদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাড়ির সংস্কার মানে তাঁদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জানানো।'

অসন্তুষ্ট লীলাবতী এবার গলার স্বর একটু ওপরে তুলে বললেন, 'কিন্তু গিরিশকাকু, আদ্যিকালের এই বাড়ি ঢেলে সাজিয়ে কী লাভ আমাদের! কার জন্যে সাজাব? আমাদের কে আছে, বলুন তো?'

প্রশ্ন শুনে একটু বিচলিত বোধ করলেন গিরিশ বিশ্বাস। সত্যবান-লীলাবতী নিঃসন্তান। এই বাড়ির উত্তরাধিকার কার ওপর বর্তাবে এই মুহূর্তে মনে পড়ল না ওঁর। কিন্তু কোনও স্পর্শকাতর বিষয়ই বোধ হয় বৃদ্ধ মানুষদের থামিয়ে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। গলা খাঁকারি দিয়ে উনি বললেন, 'আমি তো তোমাদের সামনে জলজ্যান্ত বসে আছি। আমার বয়েসকেও ছাপিয়ে যাবে তোমরা। তার মানে এখনও অনেকগুলো বছর। বাড়ি সংস্কার করে এই সময়টা আনন্দে থাকো। পরের কথা পরে ভাবার সময় পাবে অনেক।'

বুড়োমানুষরা সাধারণত একটিমাত্র পথ ধরেই চলতে ভালবাসেন, সুতরাং পুরনো এই বাড়িটা নিয়ে আরও অনেকক্ষণ ধরে গল্প চালাবার পর গিরিশ বিশ্বাস উঠলেন। উনি চলে যাওয়ার পরেই লীলাবতী খরখরে গলায় সত্যবানকে বললেন, 'একেই বলে বুড়ো বয়েসের ভীমরতি। যে কোনওদিন চোখ বুজবে বুড়ো, অথচ এখনও মাথার মধ্যে শুধুই বিষয়চিন্তা! এই বয়েসের মানুষের মুখে ধর্মের কথা, পরকালের কথা শোনা যায়; কিন্তু ওই পথে বুড়ো একবারের জন্যেও গেল না। দেড় দু-ঘণ্টা ছিল, অথচ বাড়ি-ঘর-জমির বাইরে একটাও কথা নেই।'

সত্যবানের এতক্ষণের চাপা রাগ-বিরক্তি এবার বুঝি একটু ধাক্কা দিয়েই বেরিয়ে এল। 'কিচ্ছু বোঝোনি তুমি। ওঁর কথার মধ্যে বিষয়চিন্তা কোথায় দেখলে? যা ছিল তা হল পুরনো ভালবাসার জিনিসের প্রতি মায়া-মমতা। উত্তরাধিকারের একটা দায় আছে, সেটাও স্নেহের সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন আমাদের। কিন্তু তোমাকে এ সব বলা না-বলা যে অর্থহীন—সেটা উনি জানতেন না।'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন লীলাবতী। 'আমার আর জেনে কাজ নেই। তুমি জানলেই যথেষ্ট। প্রকাণ্ড এই পোড়োবাড়িটা সারাবার স্বপ্ন দেখা আর পাগলামোর মধ্যে কোনও তফাত নেই। জীবনভর তোমার বড় বড় বোলচাল শুনে গেলাম, এবার একটু রেহাই দাও।'

'আমি তো বহুকাল ধরেই রেহাই দিয়ে রেখেছি তোমাকে। আমার শখ-সাধ-ইচ্ছের কথা বলি কখনও? ভুল করেও কিছু বোঝাতে যাই না তোমাকে। আমি যা বলি বা বলব—

সব তাতেই তোমার 'না'। সাদা কোনও কিছু দেখিয়ে যদি বলি—এটা সাদা; তুমি বলবে কালো। আসলে এটা তোমাকে বোঝানো হয়েছে।'

'বোঝানো হয়েছে? কে বুঝিয়েছে?' ঝাঁজিয়ে উঠলেন লীলাবতী।

'বোঝাবার লোক তো একজনই আছে।'

লীলাবতীর ফরসা মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। 'যা বলার ঠারেঠোরে বোলো না। স্পষ্ট করে বলো। কার কথা বলছ তুমি?'

'নতুন করে বলার আর কী আছে? মগজ ধোলাই করার মানুষ তো ওই একজনই—তোমার পুষিদিদি। এখন তো আবার বেড়াল-ভাইপোও জুটেছে। সাতমহলা বাড়ি বানাবে এখানে। একটা মহল দিয়ে দেবে তোমাকে। সঙ্গে আবার একগাদা টাকাও।'

রণচণ্ডী আর লীলাবতীর মধ্যে এই মুহূর্তে বোধ হয় কোনও তফাত নেই। ঠোঁট কয়েকবার কাঁপার পরে একঝাঁক আগুনে-গোলা বেরিয়ে এল মুখ থেকে। 'সে কপাল করে আসিনি আমি। করলে এমন দগ্ধে-দগ্ধে মরতে হত না। তুমি মরবে এই ইটের পাঁজা বুকে আগলে রেখে। তারপর যক্ষ হয়ে এখানেই থাকবে। ভালমানুষের কদর তুমি কী করে করবে? সবাইকেই তো নিজের মতো ভাবো।'

দীর্ঘদিনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় সত্যবান বুঝে গেলেন—এ যুদ্ধ জেতার নয়। লড়াই আরও খানিকক্ষণ চালাবার অর্থই হল, গায়ে ফোসকা আর বুকের মধ্যে রক্তপাত। সুতরাং প্রায় লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন উনি, আর উঠতেই তাকের ওপর রাখা মা জগদম্বার করুণাঘন চোখের ওপর চোখ পড়ে গেল।

কিছুদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলেন—সেরা জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, সেরা প্রেম ভগবৎ-প্রেম, সেরা কৃপা ভগবৎকৃপা। দু-তিন দফা তেঁতুল দিয়ে মাজার ফলে জগদম্বার মূর্তির নানা জায়গায় উজ্জ্বল হলুদ আভা ফুটে উঠেছে। পিতলের মূর্তিটা তুলে নিলেন সত্যবান। তারপর এক খাবলা তেঁতুল তুলে নিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে প্রাণপণ মাজতে শুরু করে দিলেন জগদম্বাকে।

এক ঝটকায় মাথা এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরিয়ে লীলাবতী মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'যত পারো তোয়াজ করে যাও মাকে। মা তোমাকে সাতঘড়া নয়, তিন সাত্তা একুশ ঘড়া মোহর বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে। মা, তুমি আমাকে কোন্ পাগলের হাতে তুলে দিয়ে গেছ!'

শেষের মা'টি লীলাবতীর পরলোকগতা গর্ভধারিণী মা। বিকৃত গলার কান্নার দমক কোনওমতে সামলে দুম্-দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি। হাঁটার ওই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূর্তি মাজার গতিও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সত্যবান।

।। পাঁচ ।।

চেনা জায়গায় মুখোমুখি বসলেও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন শিবনাথ। একটু বাদে গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি এটা কিন্তু অন্যায় করে ফেলেছ, সতু।'

বন্ধুর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান, 'অন্যায়! কী অন্যায় করলাম?'

—তোমার বয়েসটার কথা ভুলে গেলে তো চলবে না। এই বয়েসে কি কেউ দুপুরবেলা অমন পাট-পাট হয়ে ঘুমোয়? ওই ভাবে ঘুমিয়েছ বলে কাল রাতে আর ঘুম আসেনি! কিন্তু না ঘুমোলে স্বপ্ন দেখবে কোত্থেকে? ধরা যাক, কাল রাত্তিরে স্বপ্নের মধ্যে কেউ তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সুযোগটা তিনি তো পেলেনই না।

অপরাধীর মতো চেহারা হয়ে উঠেছিল সত্যবানের। একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'না, মানে পরশু রাতে তো দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি, তাই কাল দুপুরে বিছানায় পড়ামাত্তর ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরে আমি কিন্তু শুইটুই না। কদাচিৎ ছোট্টখাট্টো একটা ঘুম, কিন্তু তার জন্য রাতের ঘুম নষ্ট হয়নি কখনও।'

একটু বুঝি বিরক্ত হলেন শিবনাথ। 'অন্য সময়ের কথা বাদ দাও। এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। মাথার মধ্যে তোমার তো সব সময় একটা অন্য চিন্তা ঘুরছে। ঘুরছে কিনা বলো?'

উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেলেন সত্যবান। ওঁকে একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে চাপা গলায় বললেন, 'আচ্ছা শিবু, তুমি কি সত্যিই এটা বিশ্বাস করো?'

'কোন্‌টা?'

ঢোক গিললেন সত্যবান। 'এই স্বপ্নাদেশের ব্যাপারটা...। উদ্ভট স্বপ্ন তো মানুষ নানা কারণে দেখে থাকে। এমনও তো হতে পারে, অজীর্ণ বা বায়ুর প্রকোপে...।'

জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি ফেলে বন্ধুকে থামিয়ে দিলেন শিবনাথ। 'এই ভয়টাই আমি পাচ্ছিলাম, সতু। সংসারী বা অবিশ্বাসী মানুষের কাছে আসতে ঠাকুরদেবতাদের ভারী বয়ে গেছে। পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হতে না পারলে কেউ কাউকে কিচ্ছু দেয় না। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। একটু নিবেদিত-প্রাণ হতে হবে। দৈবী কৃপা কি আর এমনি এমনি জোটে!'

আরও একবার ঢোক গিললেন সত্যবান। 'তুমি যে শিবু এতখানি ঈশ্বর-বিশ্বাসী—আগে জানতাম না তো!'

এবারও একটু চটলেন প্রিয় বন্ধুটি। 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে? আমি পুজো-আচ্চা করি না। মন্দিরেটন্দিরে যাই না। তার মানে কি আমি নাস্তিক? আবার এই প্রশ্ন তোলার জন্যেই কেউ-কেউ আমার গায়ে ঈশ্বরবিশ্বাসীর ছাপ্পা লাগিয়ে দেবে। এটাও কিন্তু ঠিক নয়। স্বপ্নাদেশ পেয়েছ তুমি, আমি নই। তবে তোমার কাছ থেকে শোনার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে—এটা সত্যি না হয়ে যায় না। কেন এমন মনে হচ্ছে, তা জানি না। তবে হচ্ছে। রাজার ওই স্বপ্নের কথা শুনিয়েছি তো তোমাকে। স্বপ্নেই জগদ্ধাত্রী মূর্তির হদিস পেয়েছিলেন রাজা। ওটা সত্যি হলে এটা সত্যি হবে না কেন?' সত্যবান তর্ক তুলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিলেন।

দুই বন্ধুর মধ্যে আজ আর তেমন গল্প জমেনি। আরও কিছুক্ষণ আড্ডার জায়গায় বসে থাকার পরে উঠে পড়েছিলেন ওঁরা।

বাড়িতে ঢোকার মুখে সত্যবান দেখলেন, কে একজন কথা বলছে লীলাবতীর সঙ্গে। কিছুটা এগিয়ে আসার পর চিনতে পারলেন লোকটাকে। সামন্ত—ট্রামরাস্তার ওপরে বিল্ডিং মেটিরিয়ালের একটা দোকান আছে ওর। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ে গেলেন সামন্তের। ছোট্ট একটা নমস্কার ঠুকে সামন্ত কাছে এসে বলল, 'এদিকেই এসেছিলাম। তা ভাবলাম, এসেছি যখন আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই একবার। একটা পুরনো বিলও বাকি আছে...।'

—বিল!

—হ্যাঁ, পুরনো বিল। তখন কাজ চলছিল আপনার বাড়িতে। আপনি মাল চেয়ে বেশ কয়েকটা স্লিপ পাঠিয়েছিলেন। কাজ শেষ হওয়ার পরে সব পেমেন্টই করে দিয়েছিলেন, শুধু একটা রয়ে গেছে। এই যে দেখুন না—বিল আর স্লিপ দুটোই পিন করা আছে একসঙ্গে।

সত্যবানের হাতে বিলটা ধরিয়ে দিয়েছিল সামন্ত। বিলের ওপর চোখ বোলালেন সত্যবান। টাকার অঙ্কটা গোল্লাপাকানো। পাশে 'ডিউ' লেখা। নীচে ওঁর সই আর তারিখ। শুকনো হাসি হেসে সত্যবান বললেন, 'এটা বাকি পড়ে আছে কী ভাবে! আমি তো পেমেন্ট করার সময় সব বিলই চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, এখন এটা রেখে দিন আপনার কাছে। আমি শিগ্‌গিরই একদিন আপনার দোকানে যাচ্ছি।'

আর একটা নমস্কার ঠুকে চলে গেল সামন্ত। নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলেন সত্যবান, 'এত বড় একটা বিল বাকি পড়ে আছে! দোষ আসলে দোকানদারের তখন নির্ঘাত অন্য বিলটিলের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন হাতে পড়তেই ছুটে এসেছে। তখন দিলে একধাক্কায় সব পেমেন্ট হয়ে যেত। হাত একদম খালি। এত টাকা এখন কোথায় পাব?'

চাপা গলার কথাগুলো কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। দু-পা এগিয়ে এসে সহানুভূতি-মাখানো গলায় লীলাবতী বললেন, 'দোষ দোকানদারের। তুমি তো তখন ওর সমস্ত টাকাই মেটাতে গিয়েছিলে। বিল যখন বার করতে পারেনি, ভুগুক এখন।'

—ব্যবসাদারদের ভোগান্তি বলে কিছু নেই। আজ দিলেও যা, দু-দশদিন পরে দিলেও তাই। কষ্ট আমাদের মতো কম আয়ের মানুষদের।

—দু-দশ দিনের কথা ভাবছ কেন তুমি? বছরখানেক বাদেই দিয়ে দিও।

—বছরখানেক বাদে কেন?

—ওই সময় তো ওই দোকানে তোমাকে আরও অনেকগুলো টাকা দিতে হবে। একসঙ্গে দিয়ে দিও তখন। গায়ে লাগবে না।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। 'এই একটা ছাড়া বাকি সব বিলই তো মেটানো হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো টাকা আবার আসছে কোত্থেকে?'

—বাহ্! ওগুলো তখন ম্যাচিওর হবে না?

—ম্যাচিওর? কী ম্যাচিওর হওয়ার কথা বলছ?

সত্যবানের বিস্ময় আরও কয়েক মুহূর্ত জিইয়ে রাখার পরে লীলাবতী বললেন,

'ওই সময় তো তোমার দু-তিনটে ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করার কথা। হলে সেগুলো ভেঙে তুমি এই ইঁটের পাঁজা মেরামত করে ইমারত বানাবে না? গিরিশ বিশ্বাসকে তো বলছিলে সেদিন...।'

লীলাবতীর সহানুভূতি যে ছদ্ম, আর সব কথা যে বিচ্ছিরি ভাবে এই দিকে ঘুরে যাবে—কল্পনাও করতে পারেননি সত্যবান। ওঁর চোখমুখ লালচে হয়ে উঠেছিল।

খোঁচার ফল চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন লীলাবতী, কিন্তু তাতেও উনি শান্ত হলেন না। গলা আর একটু তুলে বললেন, 'ওই সময় তো এই দোকান থেকে তোমাকে বহু টাকার ইঁট-বালি-সিমেন্ট কিনতে হবে। তা, এই বিলটা না হয় তখনই মিটিয়ে দিও।'

একটা সময় এ বাড়িতে সরে যাবার জায়গা ছিল অনেকখানি। অপ্রীতিকর কথার ঝাঁজ এড়ানো এতখানি কঠিন ছিল না। একতলা-দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর ছিল তখন, ছাতেও দুটো চিলেকোঠা ছিল। কারও চোখকানের আড়ালে যেতে চাইলেই যাওয়া যেত স্বচ্ছন্দে। এখন আর তার কোনও উপায় নেই। একতলার এই ঘরদুটো ছাড়া বাড়ির বাকি অংশ পোড়োবাড়িমার্কা হয়ে গিয়েছে।

শরীরে জ্বলুনি ধরে গিয়েছিল সত্যবানের, কিন্তু তার মধ্যেই পুরনো দিনের সেই খোলামেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মস্ত বাড়িটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একবার। এখন বাড়ির মধ্যে পালাতে গেলে এ-ঘর থেকে পাশের ঘর, কিংবা পাশের ঘর থেকে এ-ঘর। পাশের ঘরেই চলে গিয়েছিলেন সত্যবান।

রাতে কিন্তু লীলাবতীর চেহারা পালটে গিয়েছিল একদম। প্রতিটি কথাই মধুর। কোথাও কোনও বেয়াড়া প্যাঁচ নেই। সত্যবানের যত্নআত্তি করার দিকে বড্ড বেশি নজর। রাতের খাবারদাবারও দিয়েছিলেন বেশ সাজিয়েগুছিয়ে। রুটি নরম আর সুডৌল। বাড়তি পদ আলু-পোস্ত গৃহকর্তার খুবই প্রিয়। এ বাড়িতে পানও বোধহয় বাড়তি পদের মধ্যে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার পরে লীলাবতী একটা মিষ্টি পান এগিয়ে দিয়েছিলেন কর্তার দিকে।

পুরনো কলকাতার এই পাড়াটা এখন বেশ শান্ত। দিনের বেলার বিচ্ছিরি আওয়াজ-গুলো নেই। শান্ত রাত একটু-একটু করে জাঁকিয়ে বসছিল। মিষ্টি পান মিহি হতে শুরু করেছিল সত্যবানের মুখের মধ্যে। এমন সময় খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে আসল কথার ঝাঁপি খুললেন লীলাবতী। গোড়ার দিকে অবশ্য কর্তার জন্যে স্নেহ উথলে উঠছিল বেশ খানিকটা। একটু ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'তোমার জন্যে না আজকাল খুব চিন্তা হয় আমার। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছ। যে দেখে সেই বলে। স্বাস্থ্যের দিকে তোমার নজর দেওয়া দরকার। ভোরের দিকে একটু বেড়াতে বেরুলে পারো...। অনেকেই তো বেড়ায়। ভোরে বেড়ানো শরীরের পক্ষে সব দিক থেকে উপকারী।'

সত্যবানের বলতে ইচ্ছে করছিল—সারা দিনে বিস্তর ফেক খাটি তোমার। বহুবার দোকানবাজারে ছোটাও, ওতেই আমার যথেষ্ট ব্যায়াম হয়ে যায়। আর ব্যায়ামের দরকার নেই। কিন্তু মনের কথা আর মুখে আনা গেল না। মুখের মিষ্টি পান ওদিকে মিহি হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল প্রায়।

লীলাবতী আর একটু কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। গলাতেও কাছের মানুষের সুর। 'জীবনে দায়দায়িত্ব, বোঝা তো কম টানলাম না। এবার একটু নিজেদের মতো থাকতে চাই।'

সত্যবানের মুখ দিয়ে আর একটু হলেই বেরিয়ে আসছিল—কেন, আমরা কি নিজেদের মতো নেই? কোনওমতে সামলে নিলেন নিজেকে।

পালটা যুক্তি বা তর্ক না ওঠার জন্য লীলাবতীর আত্মবিশ্বাস বোধহয় একটু জমাট হয়ে উঠেছিল। বললেন, 'হুটহাট করে কোথাও আমরা যেতে পারি না। পুরনো বাড়ি—কোথাও যাওয়া মানে কত তোড়জোড়! নেলির বিয়েতে সেবার এলাহাবাদ যাওয়ার সময় বাড়িতে রীতিমত পাহারাদার বসিয়ে যেতে হয়েছিল।'

একটু বিরক্ত হলেন সত্যবান। 'পাহারাদার কোথায়? ও তো ভোলা, পাড়ার ছেলে। কিছুদিন হোমগার্ডের চাকরি করেছিল বলে মজা করে অনেকে ওকে পাহারাদার বলে ডাকে।'

—সে যাই হোক, রাত্তিরে পাহারা দেবে বলেই তো ওকে বাড়িতে রেখে যাওয়া। একটা সময় ছিল, যখন বাড়ির দরজা হাট করে রেখে গেলেও চুরির ভয় ছিল না। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। বড় চুরি না হলেও ছিঁচকে চুরি তো লেগেই আছে। আমি বলছিলাম কি...।

বলার কথাটা পরিষ্কার আন্দাজ করতে পেরেছিলেন সত্যবান।

গলার স্বর আর একটু সুরেলা করে লীলাবতী বললেন, 'বাকি জীবনটা আর এই সব ধকল নিতে ইচ্ছে করছে না। একটু চেষ্টা করলেই আমরা কিন্তু দিব্যি আরামে থাকতে পারি। অনেক তো ভোগ করলাম এ বাড়ি। চিরকাল কিছুই থাকে না। তুমিও থাকবে না, আমিও না। এ বাড়িও লয় হবে। অকারণে মায়া বাড়িয়ে লাভ কী বলো তো? সুদীপ বরং যে প্রস্তাবটা দিয়েছে...।'

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না সত্যবান। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সুদীপ কে?'

—ওই তো ওর কথাই তোমাকে বলছিলাম সেদিন। অল্পবয়সী ছেলে, কিন্তু এর মধ্যেই কাজকর্ম শিখে নিয়েছে চমৎকার। কথাবার্তাতেও ভাল। অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির।

একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন সত্যবান। 'কে সুদীপ?'

—ওই যে প্রোমোটারির ব্যবসায় নেমেছে এখন। পুষিদির ভাশুরপো।

ধক্ করে বুঝি জ্বলে উঠেছিল সত্যবানের চোখ। 'পুষিবেড়ালটা দেখছি এ বাড়ি থেকে আমাকে উৎখাত না করে ছাড়বে না। কবে হাজির হয়েছিল আবার? আজ?'

লীলাবতীর সুরেলা গলা হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল আচমকা। বিকৃত গলায় বললেন, 'বাজে কথা বোলো না। অন্যের দোষ দেখে বেড়ানোটা এখন তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির কোনও সুরাহা হল কি না—তা নিয়ে ওর কী স্বার্থ?'

কী স্বার্থ—তাই নিয়ে এই মুহূর্তে কমপক্ষে গোটা-সাতেক পয়েন্ট দাখিল করতে পারেন সত্যবান, কিন্তু অতিকষ্টে সংযত করলেন নিজেকে। এখন এই নিয়ে কিছু বলা

মানেই বিচ্ছিরি একটা তর্ক শুরু হয়ে যাওয়া। তর্কাতর্কি মানেই মাথা গরম। মাথা গরম হয়ে গেলে রাত্তিরে ঘুমনো মুশকিল হয়ে যাবে। আর ঘুম না হলে স্বপ্ন দেখার কোনও উপায় থাকছে না। কিন্তু এক্ষুনি-এক্ষুনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লীলাবতীর হুলফোটানো কথা থামবে না চট করে। বিষ কিছুটা বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এটা ভেবেই নির্বাক শ্রোতা হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ গালাগাল দেওয়ার পরে নিজের দুর্ভাগ্যের দিকে ঘুরে গিয়েছিলেন লীলাবতী। এটাও বুঝি নিয়মের মধ্যে পড়ে। ঠাকুর যে কেন ওঁকে টেনে নিচ্ছেন না—তাই নিয়ে ঠাকুরকেও দু-কথা শোনাতে ছাড়লেন না। শেষে উনি একটু ঝিমিয়ে পড়তেই এ-ঘর থেকে ও-ঘরে চলে গিয়েছিলেন গৃহকর্তা।

এককালে যোগব্যায়াম করতেন সত্যবান। ওই ব্যায়ামের সুবাদে উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা করার কিছু কৌশল জানা আছে ওঁর। প্রথমেই দরকার স্নায়ু শিথিল করার আসন। ওটা এখন করার পরেই অন্য আসনে ঢুকে পড়েছিলেন।

সুফল পাওয়া গিয়েছিল আধঘণ্টাটাক বাদে। শরীরের দপদপানি কমেছে। মাথা ঠাণ্ডা। একটু বুঝি প্রসন্নতার ভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল মগজের বিভিন্ন কোষে। বিছানায় শোবার পরেই মা জগদম্বার করুণাঘন মুখটিও ভেসে উঠেছিল। মায়ের মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয়।

একটু-একটু করে ব্যাকুলতা জাগছিল ভক্তের মনে। বিড়বিড় করে বললেন, আর একবার দেখা দাও মা। কর্তব্যকর্ম কী একটু পরিষ্কার করে বলো। প্রার্থনা কিছুক্ষণ চালাবার পর চোখ বুজেছিলেন সত্যবান।

কিন্তু স্নেহময়ী মা জগদম্বা বুঝি ভক্তের ঘুমে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাননি। অঘোরে ঘুমোলেন সত্যবান। রাত কাবার হয়ে গেল গভীর ঘুমের মধ্যেই।

সকালের ঝকঝকে আলোর মধ্যে চোখ খোলার পরে কেমন যেন একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছিল ওঁর। কী যেন হওয়ার কথা ছিল, কী যেন হয়নি! বিষয়টা শেষে পরিষ্কার হয়ে যেতেই ধড়মড় করে বিছানার ওপরে উঠে বসেছিলেন সত্যবান। লম্বা ঘুমে শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছে। পরিষ্কার মাথায় এখন সব চিন্তাই পরিষ্কার। কিন্তু নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হচ্ছিল। খুব আশা করেছিলেন, মা জগদম্বা আবার দেখা দেবেন। কিন্তু কই, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ছিটেফোঁটাও তো ছিল না!

সকালের চা খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন শিবনাথ। ওঁকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত গোছের দেখাচ্ছিল। চুল উসকোখুসকো, চোখের মধ্যে সামান্য লালচে ভাব। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, শরীর খারাপ?'

জবাবে দুদিকে মাথা নাড়লেন শিবনাথ।

—আজ আসতে বেশ দেরি করে ফেলেছ। চা করতে বলি আর একবার?

এবারও দুপাশে মাথা নাড়লেন শিবনাথ। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'বেরুবে তো? জরুরি কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

—চলো। চটপট একটা পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে নিয়েছিলেন সত্যবান।

পথে বেরিয়ে শিবনাথ আগেরই মতো চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিককার খবরটবর কী? কাল রাত্তিরে কি স্বপ্নটপ্ন দেখেছিলে?'

ভেঙে-পড়া মানুষের গলায় উত্তর দিলেন সত্যবান, 'আর বোলো না! কাল বিছানায় পড়ামাত্তর ঘুম। একঘুমে রাত কাবার। কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখিনি। আচ্ছা, ঘুম খুব গাঢ় হলে বোধহয় স্বপ্নটপ্ন দেখা যায় না। যায় কি?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না শিবনাথ। বন্ধুর পাশাপাশি গম্ভীর মুখে কয়েক পা হেঁটে যাওয়ার পরে বললেন, 'কাল রাত্তিতে আমি কিন্তু একেবারেই ঘুমোতে পারিনি। তোমার ওই স্বপ্নাদেশের ধাঁধাটা কেমন যেন চেপে বসেছিল। কিছুতেই জট খোলে না...। শেষে ভোরের দিকে।'

উত্তেজিত হয়ে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'সমাধান পেয়েছ?'

—মনে হয় পেয়েছি।

—কী?

—চলো, বসে বলছি। তেকোণা মাঠের ওই বসার জায়গার দিকে বেশ জোরেই পা চালিয়ে দিয়েছিলেন দুই বন্ধু।

।। ছয়।।

পাথরের সেই স্ল্যাবে এসে বসলেন দুই বন্ধু। এলাকাটা এই সময় প্রতিদিনই বেশ নির্জন থাকে। আজও তাই। চারদিকে দ্রুত একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে শিবনাথ বললেন, 'তোমার বাড়ির সামনে, পাশে—কোথাও কোনও গাছপালা নেই। তাই তো?'

মাথা নেড়ে বন্ধুর কথায় সায় দিলেন সত্যবান।

—কিন্তু আমি যদি বলি গাছ তোমার বাড়িতেই আছে।

—বাড়িতে!

—হ্যাঁ, বাড়িতেই। তোমাদের বাড়ির দেয়াল, কার্নিশ আর ছাত তো ছেয়ে গেছে বটগাছে। বাইরেই যখন এই, ভেতরদিকে না জানি কী অবস্থা! ভেতরদিকের একগাদা ঘর তো ভেঙেচুরে পড়ে আছে বহুকাল। ওখানেও নির্ঘাত গাছপালা গজিয়েছে বিস্তর। তুমি কি এর মধ্যে বাড়ির ভেতরদিকে ঢুকেছিলে?

জবাবে শুকনো মুখে দুদিকে মাথা নাড়লেন সত্যবান।

—যাওয়ার অবশ্য দরকার নেই। বাইরেটা দেখেই ভেতরটা আঁচ করা যায়। বাইরের দিকে মাঝেমধ্যে সংস্কার করো, তাতেই এই অবস্থা। ভেতরে না জানি কী হয়ে রয়েছে! যাকগে, তুমি বাড়ির গাছপালাগুলো কাটার ব্যবস্থা করো আগে। মাটিতেও কিছু গাছ গজিয়েছে, ওগুলোর তলা খোঁড়ো।

সত্যবানের চোখেমুখে উত্তেজনার ছোট্ট একটা ঝিলিক খেলে গিয়েছিল, তবে পরক্ষণেই মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'স্বপ্নের কথা আমার কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে শিবু।

মা জগদম্বা আমাকে বাড়ির সামনের রাস্তার গাছতলাটা খুঁড়তে বলেছিলেন।'

চাপা গলায় ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে শিবনাথ বললেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি—এই স্বপ্নাদেশ দেওয়ার ব্যাপারে দেবদেবীরা একটু রহস্য করতে ভালবাসেন। রহস্য বলো, মজা বলো, দৈবী লীলা বলো—স্বপ্নাদেশের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলো নাকি জড়িয়ে-মিশিয়ে থাকে। স্বপ্নে কখনওই ঠিক জায়গাটা পরিষ্কার করে চিনিয়ে দেওয়া হয় না। ওটা মাথা খাটিয়ে ভক্তকেই খুঁজে বার করতে হয়। ধাঁধার এই জটটা আমাদের আগেই ছাড়ানো উচিত ছিল। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তুমি কাজটা শুরু করে দাও এবার।'

সত্যবানের চোখমুখ রীতিমত চকচকে হয়ে উঠেছিল। 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শিবু। যা বলছ, তা যেন সত্যি হয়। কিন্তু কী করতে হবে এখন?'

—মিস্ত্রি আনতে হবে প্রথমে। একজন রাজ, একজন ছুতোর।

—মিস্ত্রি এখন পাব কোথায়?

—রাস্তার চৌমাথায় গেলেই পাবে। ওখানে ফুটপাথে সার দিয়ে বসে থাকে সব রকম মিস্ত্রি। এখনই চলো। বেলা হয়ে গেলে ওদের আর পাওয়া যাবে না।

সত্যবানের শরীরে, মনে বেশ একটা চনমনে ভাব এসে গিয়েছিল। তড়াক করে উঠে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, চলো।'

চৌমাথা এখান থেকে মিনিট-পনেরোর হাঁটা পথ। দুই বন্ধুই হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন জোর পায়ে। সকাল এখনও তেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। রাস্তায়, ফুটপাথে অফিসবাবুদের ভিড় শুরু হবে ঘণ্টাখানেক পর থেকে। ফাঁকা রাস্তায় লম্বা পায়ে হাঁটছিলেন দুই বন্ধু, কিন্তু কারও মুখে কোনও কথা ছিল না।

রাস্তার চৌমাথায় পৌঁছবার পর মিস্ত্রিদের দেখা মিলল। ফুটপাথে সার বেঁধে বসে আছে বেশ কয়েকজন মিস্ত্রি। প্রত্যেকের সামনেই একটা করে মুখখোলা ব্যাগ। ব্যাগের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামই চিনিয়ে দিচ্ছিল কে কীসের মিস্ত্রি। কোনও ব্যাগে কর্নিক, কোনওটায় করাত, কোথাও বা রঙের ব্রাশ।

শিবনাথ বন্ধুকে বললেন, 'তুমি তো বাড়িঘর মাঝেমধ্যে সারাও সতু। মিস্ত্রিদের ব্যাপার তুমিই সামলাতে পারবে ভাল। নাও, কথাটথা বলে নাও।'

সত্যবানের মধ্যে সজাগ, সতর্ক ভাবটা ফিরে এসেছিল আবার। সেই সঙ্গে শরীরে বাড়তি কিছু উত্তেজনা। একজন রাজমিস্ত্রি আর একজন কাঠের মিস্ত্রিকে ডেকে নিয়ে কাজের কথা পাড়লেন।

কাজ দেখার পরে মিস্ত্রি ডাকতে আসা হয়নি। সুতরাং সব কিছু গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। সত্যবান দুই মিস্ত্রিকে বললেন, 'বাড়িতে না গেলে বোঝা যাবে না কী কাজ, আর সময়ই বা লাগবে কতটা! তবে তোমাদের দুজনেরই কাজ আছে। বিস্তর আগাছা গজিয়েছে বাড়িতে। দেয়াল, কার্নিশ ফুটো করে মেঝেয় ঢুকে গেছে গাছপালা। ওই গাছগুলো কাটতে হবে। শেকড় উপড়ে ফেলতে হবে মেঝে থেকে। তারপর মেরামতি। কাজ বলতে এই সবই—।'

কাজের ফিরিস্তি দেওয়ার পরে দুই মিস্ত্রি আর এক মজুরকে নিয়ে বাড়ির পথে

রওনা দিয়েছিলেন সত্যবান। সঙ্গে প্রিয় বন্ধু শিবনাথ। পথে খুব একটা কথা হয়নি। কিন্তু বাড়ির দূরত্ব যত কমছিল, গৃহকর্তার শরীরে উত্তেজনা বাড়ছিল তত।

রাস্তার শেষ বাঁকটা ঘুরতেই বাড়ি দেখতে পেলেন সত্যবান। নিজের বাড়ির দিকে দিনে কমপক্ষে দশবার তাকান, কিন্তু আজকের এই দেখাটা বুঝি একেবারেই অন্য ধাঁচের। পুরনো আমলের মস্ত বাড়িটার দেয়াল আর কার্নিশে বেশ কয়েকটা বটগাছ। বেশিরভাগ গাছই ছোট আর মাঝারি। তবে দুটো বড় গাছ ঝুরি নামিয়ে দিয়েছিল নীচে পর্যন্ত।

সত্যবানের মনে হচ্ছিল, এই সব গাছপালা বুঝি ওঁর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই বোধহয় আর আলাদা করে চোখে পড়ে না। তবে এখন ওগুলো দেখার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। আলাদা ওই কারণটার কথা আর একবার মনে পড়তেই ওঁর শরীরের অস্থিরতা এক লাফে বেড়ে গিয়েছিল বেশ কিছুটা।

সদর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওই দলটাকে আসতে দেখলেন লীলাবতী। ওঁর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন শিবনাথ। বাড়িতে লোকজন এলে খুশি হন লীলাবতী। স্বামীর ছেলেবেলার এই বন্ধুটিকে বাড়তি একটু খাতিরযত্নও করে থাকেন। সবই ভাল, কিন্তু শিবনাথ মাঝেমধ্যে এটাও টের পেয়ে থাকেন—আড়াল থেকে ওঁর দিকে ধারালো চোখে তাকাচ্ছেন বন্ধুপত্নী।

কিছু-কিছু মা আছেন—ছেলে সাবালক হলেও তাঁরা ধরে নেন ছেলেকে খারাপ করার জন্য কয়েকটা বদ ছেলে সর্বক্ষণ ওঁত পেতে আছে। একই কায়দায় কিছু-কিছু স্ত্রীও ধরে নেন, তাঁদের সদাশিব কর্তার মাথা খাওয়ার তালে আছে দু-তিনটে সর্বনেশে বন্ধু। লীলাবতীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হওয়ার কারণ বুঝি এটাই। চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতেই একটু-একটু করে বেশ পিছিয়ে গিয়েছিলেন শিবনাথ।

মিস্ত্রি নিয়ে বাড়িতে ঢোকার মুখে পথ প্রায় আগলে রেখে লীলাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? এরা কারা?'

অদ্ভুত সেই অস্থিরতা সত্যবানের গোটা শরীরে এখন বোধহয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। চোখেমুখে লালচে ভাব। গলার স্বরও কেমন যেন পালটে গিয়েছিল। অন্যরকম গলায় লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে সত্যবান বললেন, 'পথ ছেড়ে দাঁড়াও। এরা মা জগদম্বার কাজে এসেছে, ভেতরে যাবে।'

চেনা মানুষের অচেনা গলা শুনে আর রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন লীলাবতী। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াবার পরে ছুটে পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। মানুষটির যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—সে বিষয়ে এখন আর ওঁর কোনও সন্দেহ নেই। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খাটের ওপর প্রায় আছড়ে পড়েছিলেন লীলাবতী।

একটু দূর থেকে গৃহকর্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলেন শিবনাথ। মানুষটি ঘরে ঢুকে যেতেই উনি লম্বা পায়ে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বাড়ির ভেতরদিকে যাওয়ার প্রথম দরজাটা খোলা গেল কোনওমতে। কিন্তু ভেতরে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ওদিকের একটা দেয়াল আর সিলিঙের কিছুটা অংশ ধসে পড়েছে। চুনসুরকি আর ইঁটবালি ডাঁই হয়ে আছে চারদিকে।

রাজমিস্ত্রি আর মজুর হাত লাগাবার পরে পায়ে চলার মতো একটা পথ তৈরি হল। ওই পথ দিয়ে গিয়ে ভেতরের মস্ত উঠোনে পা দিয়েই ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিলেন সত্যবান আর শিবনাথ।

কয়েকটা বছর এদিক আর মাড়ানো হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই এ কী অবস্থা! নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না দুই বন্ধু। উঠোন, ঘর, সিঁড়ি কোথায়! এ তো রীতিমত জঙ্গল।

জঙ্গলটা ভাল করে দেখে নেওয়ার পরে শিবনাথ প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বাড়ির ভেতরদিকে কদ্দিন আসোনি বলো তো সতু?'

—কদ্দিন হবে! বড় জোর বছরসাতেক!

—না-না, তারও বেশি। এই গাছগুলোর গুঁড়ি দেখছ না—কী মোটা-মোটা! অনেক-গুলো বছর নিশ্চিন্তে বাড়তে না পারলে গাছের গুঁড়ি কক্ষনো অত মোটা হয় না। আর জঙ্গল কী ঠাসা! একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

—কী?

—এ পাড়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আজকাল এত বেড়ে গিয়েছে কেন—এবার বোঝা গেল।

—কেন? বন্ধুর হেঁয়ালিমার্কা কথাটা একেবারেই পরিষ্কার হয়নি সত্যবানের কাছে।

দুদিকে দু-হাত ছড়িয়ে, চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে শিবনাথ বললেন, 'তোমার বাড়ির পেছনদিকটা রীতিমত একটা অভয়ারণ্য। এত বড় একটা অরণ্য থাকলে এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তো বাড়বেই।'

বন্ধুর কথার কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না সত্যবান। রীতিমত বিহ্বল দেখাচ্ছিল ওঁকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না শিবু। আমাদের বাড়ির ভেতরদিকেই তো এ বাড়ির বারো আনা অংশ। অনেকটা ভেঙেচুরে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু এই ক'বছরে এতটা!'

ঠাসা গাছপালার জঙ্গল ঠেলে ঠেলে ভেতর দিক থেকে এক পাক ঘুরে এসে শিবনাথ অবাক চোখে বললেন, 'বটগাছ আছে কয়েকটা, কিন্তু বাকি গাছগুলো তো চিনতে পারলাম না। তুমি কি এখানে কোনও গাছপালা লাগিয়েছিলে?'

বন্ধুর প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হলেন সত্যবান, 'বাড়ির উঠোনে কেউ কি কখনও এত গাছ লাগায়?'

—না, ভাবছিলাম কি—শখ করে হয়তো দু-একটা লাগিয়েছিলে। তারপর সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। মধ্যিখানে অনেকগুলো বছর তো আর এ-মুখো হওনি। যাকগে, যে ভাবেই হোক না কেন—হয়েছে তো। হয়তো পাখিই সোর্স। এখন আমাদের কাজ হল গাছপালাগুলো কাটা আর সব গুঁড়ি উপড়ে ফেলা।

বাড়ির ভেতরদিকে হঠাৎই এত বড় জঙ্গল দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান, কিন্তু বন্ধুর কথায় সজাগ হয়ে উঠলেন আবার। দুই মিস্ত্রি আর এক মজুর জঙ্গল তদারকির কাজ শুরু করে দিয়েছিল জঙ্গল ঠেলেঠুলে একটা চক্কর মেরে কাছে আসতেই সত্যবান

বললেন, 'কী, কাজ দেখলে তোমরা?'

দুই মিস্ত্রির মধ্যে কাঠের মিস্ত্রিই একটু বেশি বলিয়ে-কইয়ে। বলল, 'আমাদের ঠিক কী করতে হবে বলুন তো?'

—কী করতে হবে তা তো আগেই বলেছি। গাছপালাগুলো কাটতে হবে। শুধু কাটাই নয়, গোড়াগুলোও খুঁড়ে ফেলতে হবে। দেয়াল, কার্নিশ, ছাত ফুটো করে দিয়েছে বেশ কিছু গাছপালা। ওগুলো কাটার পরে বাড়ি মেরামতির কাজও করতে হবে কিছুটা। ফুরনে কাজ করবে তো?

দুই মিস্ত্রিই মাথা নাড়ল একসঙ্গে। 'না বাবু, এ কাজ ফুরনে হবার নয়।'

—কেন?

—কাজে হাত লাগালেই অনেক কাজ বেরিয়ে পড়বে। আপনি তো বাড়ির দেয়াল-কার্নিশের গাছ কাটার কথা বলেছিলেন, কিন্তু এ তো দেখছি মস্ত এক জঙ্গল সাফাই। এ কাজের জন্যে রোজ দিতে হবে আমাদের।

সত্যবানের শরীরে আগের সেই অস্থিরতা ফিরে এসেছিল আবার। শুধু অস্থিরতাই নয়, সেই সঙ্গে চাপা উত্তেজনাও ছিল। একটু ঘোর-লাগা গলায় বললেন, 'এ কাজ আর পাঁচটা কাজের মতো নয়। এ কাজ করলে ভাল হবে তোমাদের। আলাদা-আলাদা না করে দুজনে মিলে একসঙ্গে করো। ক'টা রোজ লাগবে, মালপত্তরই বা কী দরকার—সব হিসেব করে জানিয়ে দাও আমাকে।'

দুই মিস্ত্রির মধ্যে এ নিয়ে কথা হয়েছিল আগেই। দুজনে মিলে প্রয়োজনের সব কথা জানিয়ে দিল এক-এক করে। এত বড়-বড় গাছ কাটার জন্যে বড় করাত ভাড়া করতে হবে। গাছের গোড়া খোঁড়ার জন্যে লাগবে বড় শাবল। ভারা বাঁধতে হবে ছাত পর্যন্ত। মিস্ত্রিরা হিসেব কষে বলল, রোজ দশটা করে লোক কাজ করলে এক মাসের মধ্যে সব কাজ উঠে যাবে।

বেশ বড় রকমের কাজের ধাক্কা। টাকা গলে যাবে অনেকগুলো। কিন্তু সত্যবান এখনও সেই ঘোরের মধ্যেই। গলা একটু তুলে বললেন, 'যা-যা লাগবে—তোমরা সব জোগাড় করে নাও। কাজ শুরু হবে আজ থেকেই। তবে খেয়াল রেখো, কাজ কিন্তু একটা দিনের জন্যেও বন্ধ করা চলবে না।'

শুরু হয়ে গেল বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। বড় করাত আর বড় শাবল এল। গাঁইতি, হাতুড়ি, ছেনি কেমন যেন পালা করে ঘুরতে লাগল দশটা লোকের হাতে। ওদিকে আবার অনেকখানি জায়গা নিয়ে মস্ত এক ভারা বাঁধা হয়েছে। ভারায় বসেও মিস্ত্রিরা কাজ করে যাচ্ছিল সমানে।

প্রতিদিন কাজ করছে দশটা মিস্ত্রি। ওদের দেখাশোনার কাজে আছে দুজন সজাগ মানুষ। সুতরাং কাজ এগোচ্ছিল দ্রুত। ইতিমধ্যেই অনেকগুলো গাছ কাটা হয়ে গিয়েছে। শুধু কাটাই হয়নি। ওগুলো সুন্দরভাবে সাইজ করে থাক দিয়ে রাখা হয়েছে বাড়ির সামনে। থাক প্রতিদিনই বাড়ছে। পাড়ার মধ্যে রটে গিয়েছিল কাঠের ব্যবসায় নেমেছেন সত্যবান। গোলা হয়েছে বাড়ির সামনেই।

হালে এক উৎপাত শুরু হয়েছিল। দালালদের সঙ্গে নিয়ে কাঠের কারবারিরা ভিড় জমাচ্ছিল ওই গোলার সামনে। কারবারিদের রকমসকমই আলাদা। ওরা কাঠের গন্ধ শুঁকে, কাঠের গুঁড়ো জিভে লাগিয়ে, তক্তা খুঁটে দর দিচ্ছিল। মোটা দর। দর শুনে মাথা ঝিমঝিম করে উঠছিল সত্যবানের।

এক কারবারি এসে বলেছিল—আপনার বাড়ির সামনে যা মাল আছে, সব তুলে নেব আমি। পঞ্চাশ হাজার দেব। রাজি?

প্রস্তাবটা দু-তিন কান হতে না হতেই আর এক কারবারি এসে অন্য দর দিয়েছিল—আমি নগদ এক লাখ টাকা দিচ্ছি। সব কাঠ আমাকে দিয়ে দিন।

একবেলার মধ্যে কাঠের দাম দ্বিগুণ হয়ে যেতেই নড়েচড়ে বসেছিলেন সত্যবান। শিবনাথ খবর নিয়ে জানলেন—সব কাঠই দুষ্প্রাপ্য। বেশির ভাগই এক নম্বরি সেগুন, সঙ্গে কিছু মেহগনিও আছে। এই সব কাঠের দাম আর সোনার দামের মধ্যে বোধহয় খুব একটা তফাত নেই।

সব দেখেশুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বাড়ির আগাছার মধ্যে এইসব গাছ জন্মাল কী করে! আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না।'

সত্যবানের কথায় মুচকি হেসেছিলেন শিবনাথ। 'বলতে পারো এটা প্রকৃতির খেয়াল। কিংবা হয়তো মা জগদম্বার লীলা। কিন্তু সতু, বাজারদর যাচাই না করে এ কাঠ তুমি ছাড়বে না।'

পরামর্শটা মনে ধরে গিয়েছিল সত্যবানের। কাঠের কারবারি আর দালালদের খেদিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন কোনও কথা নয়। সব গাছ কাটা হোক আগে, তারপর দেখা যাবে।'

।। সাত ।।

দশজন মিস্ত্রির দশটা দিন কাজ হয়ে গেল, কিন্তু বাড়ির ভেতর দিকের জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ এখনও অনেক বাকি। আসলে গাছগুলো গজিয়েছে এলোমেলো ভাবে। একটা গাছের পাশেই ঠিক আর একটা গাছ। ফাঁকা জমি কোথাও নেই। দুটো গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি থাকলে কী হবে, ওপরের ডালপালা কাঁথা সেলাইয়ের কায়দায় জড়িয়ে গিয়েছে অন্যান্য গাছের সঙ্গে। বাড়ির ধসে-পড়া কাঠামোর মধ্যেও গাছপালা। বটগাছের শেকড় আর ঝুরির বাঁধনেও আটকে পড়েছে জঙ্গল-এলাকার বেশ কিছুটা অংশ। হুড়মুড় করে জঙ্গল সাফাই হলে আদ্যিকালের বাড়িটার বাকি অংশ ধসে পড়তে পারে। ওদিকেও নজর রেখেছে মিস্ত্রিরা। সুতরাং কাজের গতি কখনও কখনও খুব ধীর।

গাছের তলাও খোঁড়া হয় আস্তে আস্তে। ওই সময় আবার ওখানে হাজির থাকেন সত্যবান আর শিবনাথ। গাছের গোড়ায় শাবল পড়ার ধাক্কা বুঝি দুই বন্ধুর বুকের মধ্যেও লাগে। দুজনেই ভাবেন—এই বুঝি ঠুং করে একটা শব্দ উঠল। পিতলের ঘড়ার

গায়ে শাবলের আঘাত পড়লে তো ওই রকমই শব্দ ওঠার কথা। কিন্তু না, এখনও পর্যন্ত ওই ধরনের কোনও শব্দ ওঠেনি।

গাছের তলা খোঁড়ার কাজ শেষ হলে মিইয়ে যান দুই বন্ধু। কিন্তু মিইয়ে যাওয়ার ভাবটা বেশিক্ষণ ওঁদের আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আশায় বুক বাঁধেন দুজনেই। স্বপ্নাদেশ তো পালন করা হচ্ছে। ফল নিশ্চয়ই ফলবে একদিন।

এই সব নিয়েই গল্প শুরু হয়েছিল দুই বন্ধুর মধ্যে। বাড়ির মধ্যে মিস্ত্রিদের কাজের বিকট আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে লীলাবতী এখন দিনের অনেকটা সময় কাটান ওঁর পুষিদির বাড়িতে। আজ দ্বিতীয় দফার চা করার একটু পরেই উনি চলে গিয়েছেন পাশের বাড়িতে।

চায়ের কাপে তিন নম্বর চুমুকটা দেওয়ার পরে শিবনাথ বললেন, 'তোমার বাড়িতে মিস্ত্রি লাগার পরে দশ-দশটা দিন কেটে গেল, অথচ তুমি মা জগদম্বাকে আর একটিবারও স্বপ্নে দেখতে পেলে না! যদি দেখতে পেতে, মা যদি দু-একটা কথা বলতেন, আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত।'

জগদম্বা স্বপ্নে দেখা দেননি—এ দোষটা সত্যবানের নয়। তবু অপরাধীর মতো মুখ করে উনি হাসার চেষ্টা করলেন। শিবনাথ বললেন, 'মা স্বপ্নে তোমাকে দেখা দিয়ে একটু যদি হাসতেনও...।'

—হাসলে কী হত?

—ওটাকেই আমরা গ্রিন সিগন্যাল ভেবে নিতে পারতাম!

—কীসের গ্রিন সিগন্যাল?

—এই যে, যা করছি, ঠিক করছি। এই পথেই সিদ্ধি মিলবে।

—সিদ্ধি! কীসের সিদ্ধি?

গলার স্বর একটু নামিয়ে বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন শিবনাথ। 'সিদ্ধি তো একটাই—সাতঘড়া মোহর।'

শুকনো মুখ করে সত্যবান বললেন, 'দিনের বেলা এতগুলো মিস্ত্রি খাটাই, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে একটু যে গড়াব—তারও উপায় নেই। তার ফল এই হয়েছে যে, রাত একটু বাড়লেই ঝিমুনি ধরে। আর রাতের খাওয়া সেরে বিছানায় পড়ামাত্তর ঘুম। ঘুম খুব গাঢ় হলে আবার স্বপ্ন দেখা যায় না। যায় কি?'

ইদানীং এই প্রশ্নটা সত্যবান মাঝেমধ্যেই তোলেন, কিন্তু শিবনাথ কখনও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন না। তবে আজ দিলেন। একটু বুঝি ধমকে ওঠার গলায় বললেন, 'সাধারণ ভাবে স্বপ্ন দেখার নিয়মটিয়মগুলো কিন্তু এখানে একেবারেই খাটে না। এটা হচ্ছে গিয়ে ঠাকুরদেবতার ব্যাপার। জগদম্বার যদি মনে হত—তোমার স্বপ্নের মধ্যে একবার ঢুকে পড়ে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলা দরকার—উনি কি আর ঢুকতেন না? আসলে উনি বোধহয় তোমার দৌড়টা দেখতে চাইছেন।'

—দৌড়! কীসের দৌড়?

—আরে দৌড় মানে, তোমার বুদ্ধির দৌড়, কিংবা বলা চলে—ভক্তির দৌড়। সবাই

বাজিয়ে দেখতে চায়। ভগবান বাজাতে চায়, গুরু বাজাতে চায়, এমনকি অফিসের বড়বাবু বাজিয়ে দেখতে চায়। বাজিয়ে দেখার ব্যাপারে বুঝি স্বর্গে-মর্ত্যে একই নিয়ম।

সত্যবানের চোখেমুখে অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। 'এই দৌড়টা তো আমি তোমার পরামর্শে দৌড়চ্ছি। বাড়িঘরের গাছপালা তুমি কাটাতে বলেছ বলেই কাটাচ্ছি।'

বন্ধুর কথায় শিবনাথও হাসলেন, তবে আর এক ধরনের হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, 'দৈবী লীলা তুমি যদি মানতে চাও, অনেক কিছুই মানতে হবে তোমাকে। এই যে তোমাকে আমি গায়ে পড়ে পরামর্শ দিলাম, এর পেছনেও হয়তো অন্য কারও নির্দেশ আছে।'

থমথমে মুখ করে সত্যবান বললেন, 'সে সব জানি না, তবে মস্ত বড় একটা অঘটন তো ঘটেই গেছে।'

—অঘটন! কোন অঘটনের কথা বলছ?

—এই যে বাড়ির ভিতরদিকের উঠোনে দেয়ালে নিজের খেয়ালে গজিয়ে ওঠা সেগুন-মেহগনি—এমন আজগুবি কথা কেউ কখনও শুনেছে?

—না, আমরা শুনিনি, আমাদের জানাশোনা কেউও কখনও শোনেনি। কিন্তু নানা ধরনের আজগুবি ঘটনা এই পৃথিবীতেই ঘটে চলেছে সব সময়। হয়তো কোটিতে একটা। কিন্তু ঘটে। আর ঘটতে দেখলে তাজ্জব হয়ে যায় সব্বাই। তোমার বাড়ির আগাছার মধ্যে এই যে অমূল্য সব গাছ গজিয়েছে—এটা কিন্তু মস্ত বড় একটা সুলক্ষণ। আরও বড় অসম্ভব কাণ্ড খোলা মনে যাতে তুমি মেনে নিতে পারো—তার জন্যে হয়তো মা জগদম্বা তোমাকে প্রস্তুত করে তুলছেন।

দুটো হাত সত্যবানের বুকের কাছে উঠে এসেছিল। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না শিবু। আগাছার মধ্যে সেগুন, মেহগনি পাওয়ার ধাক্কাটা আমি এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারিনি। বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু একা নই। অনেকে আবার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছে এককথায়।'

বন্ধুর কথায় একটু বুঝি অসন্তুষ্ট হলেন শিবনাথ। 'এ নিয়ে তোমার কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করা উচিত হয়নি।'

—না-না। গল্প করিনি কারও সঙ্গে। কী ভাবে যেন জেনে গেছে অনেকে। হয়তো মিস্ত্রিদের কারও কাছ থেকে শুনেছে। যাদের কৌতূহল বেশি, তারা কেউ কেউ আবার এই নিয়ে প্রশ্নও করেছিল। আমি পরিষ্কার কোনও উত্তর না দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। তবে কেউই যে উদ্ভট এই ব্যাপারটা খুব একটা বিশ্বাস করেনি, এটা বুঝতে পেরেছি।

আশ্বস্ত হওয়ার ভঙ্গিতে শিবনাথ বললেন, 'সেটা আমাদের পক্ষে ভাল। লোকে যতই অবিশ্বাস করবে, ততই মঙ্গল। এই সব দামি কাঠ বাড়ির সামনে থাক দিয়ে রাখা হয়েছে—রাতের অন্ধকারে চুরি হওয়ার একটা ভয় কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।'

কথাটাকে উড়িয়ে দিলেন সত্যবান। 'তুমি তো এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা। এখানে এই ধরনের চুরিটুরির কথা শুনেছ কখনও? তুমিই তো সেদিন বলছিলে—পাড়া পুরনো

হওয়ার এটা একটা মস্ত সুবিধে। সব্বাই সব্বাইকে চেনে। উটকো লোকের পক্ষে এই এলাকায় ঢুকে চুরি-ছিনতাই করাটা কঠিন।'

—তা ঠিক, কিন্তু কাঠগুলো যে মহামূল্যবান—এ খবর আর কেউ জানুক না জানুক, কাঠের কিছু কারবারি তো জেনে গেছে। মাঝরাত্তিরে ট্রাক এনে চুরি করার তাল করতে পারে।

এ পাড়ার চারপুরুষের বাসিন্দা সত্যবান একটু খেপে উঠে বললেন, 'মাইরি আর কী! আমার বাড়ির সামনে থেকে মাল সরাবে? অত সোজা! এবার থেকে রাতের দিকে একটু সজাগ হয়ে থাকতে হবে।'

হায়-হায় করে ওঠার গলায় শিবনাথ বললেন, 'ও কম্মটি কোরো না কক্ষনো। বরং রাতে পাহারাদারি করার জন্য একটা লোককে বসিয়ে দাও এখানে। পাহারার প্রয়োজন হবে বড়জোর মাসখানেক। তারপর তো সব বেচেটেচে দেবে। এত যখন খরচা করছ, পাহারাদারির জন্যে না হয় আরও কিছু খরচা হবে।'

—খরচা করতে আপত্তি নেই, তবে ওটা মনবোঝানো পাহারাদারি হবে। মাঝরাত্তিরের পর লোকটা নির্ঘাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। বরং আমিই না হয় ক'টা রাত একটু সজাগ থাকি...।

—ওটা কখনওই কোরো না।

—তুমি কি ভাবছ আমি পেরে উঠব না?

বন্ধুর কথার জবাবে হাত নেড়ে শিবনাথ বললেন, 'খুব পারবে। তবে এই দায়িত্বটা কাঁধে নিলে রাত্তিরগুলো ধরতে গেলে তোমার না ঘুমিয়েই কাটবে।'

—ক'টা দিনের তো মামলা—ওতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

চাপা গলায় এবার একটা ধমক দিলেন শিবনাথ। 'অন্য ধরনের অসুবিধে হবে। যত কম ঘুমোবে, তেমার স্বপ্ন দেখার সুযোগও তত কমে যাবে। সেটা কি ঠিক কাজ হবে?'

একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন এবার সত্যবান। 'আসলে আমার মাথা এখন ঠিক ভাবে কাজ করছে না সব সময়। চারদিক থেকে এমন একটা চাপ...।'

অভয় দেওয়ার মতো একটা সুর ফুটে উঠেছিল শিবনাথের গলায়। 'শোনো, রাত্তিরে কাঠ পাহারা দেওয়ার কাজে ভোলাকে লাগিয়ে দেব। ওকে না পাওয়া গেলে বিজয় তো আছেই। ওটা আমি দেখছি। ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ঠিক আছে, আমি তাহলে চলি এখন, পরে আসব আবার।'

শিবনাথ বাড়ি চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে সত্যবানের বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি এসে দাঁড়াল। মিস্ত্রিদের কাজের তদারকিতে যাবেন বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন গৃহকর্তা, কিন্তু ঠিক সদর দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেখে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

গাড়ির পেছনের সিটে-বসা লোকটি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, সত্যবানকে দেখেই গলা সামান্য তুলে বলল, 'দাদা, এটা কি টুয়েলভ্ বাই সি...?'

জবাবে সত্যবান ঘাড় নাড়তেই লোকটি টক করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলল,

'গরমের দুপুরে এসব পাড়ায় বাড়ি খুঁজে বের করাটা বেশ ঝকমারির কাজ। বাড়িতে যারা থাকে, তারা আবার দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুমোয়। রাস্তা শুনশান, কাউকে ডেকে যে একটু খোঁজখবর নেব—তারও উপায় নেই। এই সব এলাকার বেশির ভাগ বাড়ির দেয়ালে আবার ঠিকানা থাকে না—ভাগ্যিস আপনি বেরিয়েছিলেন। আচ্ছা, এই বাড়িটার বাড়িওয়ালা কে বলুন তো?'

—কেন? সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন সত্যবান।

—আমি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে এসেছি, বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি কি জানেন ওঁর নামটা?

—ঢোক গিললেন সত্যবান। 'আমিই বাড়িওয়ালা—।'

সত্যবান লক্ষ করলেন, উত্তর শুনে কেমন যেন চেহারা পালটে গিয়েছে মানুষটার। বেঁটে, মোটা এবং কালো লোকটার দুই চোয়ালেই একটু বেশি পরিমাণে মাংস। মাথার মধ্যিখানের টাক একদিকের লম্বা চুল পেতে যত্ন করে ঢাকা। বাড়িওয়ালার পরিচয় পাবার পর থেকেই লোকটার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল। সত্যবানকে কয়েক মুহূর্ত ধরে মাপজোখ করার পরে বলল, 'আপনিই বাড়িওয়ালা?'

—হ্যাঁ, বললাম তো আপনাকে।

বাড়ির সামনে থাক দেওয়া সেগুন আর মেহগনি গাছগুলো বেশ খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসারটি বলল, 'এই গাছগুলো কি আপনি কাটিয়েছেন?'

—হ্যাঁ।

—কোথায় হয়েছিল এগুলো?

—আমার বাড়ির ভেতরদিকের উঠোনে।

—উঠোনে! কিন্তু কাটালেন কেন?

পরের পর এই ধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে ভেতরে ভেতরে একটু তেতে উঠেছিলেন সত্যবান, কিন্তু কষ্ট করে ঠাণ্ডা ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে বললেন, 'বেশ কয়েক বছর বাড়ির ভেতরদিকে যাওয়া হয়নি। জানতামই না যে ওদিকটা ধসে পড়েছে। শুধু ধসলে অবশ্য চিন্তার কোনও কারণ ছিল না, আসলে প্রচুর আগাছা গজিয়ে গিয়েছিল। মিস্ত্রি ডেকে এনে শেষে ওগুলো-কাটাই।'

পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছোটকর্তার চোখ বোধহয় আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল। ফাঁদে ফেলে দেওয়ার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এইসব গাছ কি আগাছা?'

—আমি সে কথা কিন্তু একবারও বলিনি। আগাছার পরিমাণ এর চাইতে ঢের বেশি ছিল—সেগুলো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—আপনি কি বলতে চান, আপনার বাড়ির উঠোনে এইসব দুষ্প্রাপ্য সেগুন, মেহগনি আপনাআপনি গজিয়েছে?

—ঠিক তাই। এটা প্রকৃতির খেয়াল বলতে পারেন।

সত্যবানের কথা শুনে পরিবেশ দূষণ পর্ষদের এই কর্তাটি গা জ্বালাবার ভঙ্গিতে

হেসে উঠে বলল, 'প্রকৃতির নানা রকম খেয়ালের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু এটা তো খেয়াল নয়, বদখেয়াল। বদখেয়াল মানুষের হতে পারে, প্রকৃতির হয় না।'

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না সত্যবান। গলার স্বর কয়েক পর্দা ওপরে তুলে বললেন, 'কী বলতে চাইছেন আপনি? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?'

—সত্যি-মিথ্যে বিচার করাটা আমার কাজের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আমি শুধু এটা বলব, আপনি মস্ত একটা বেআইনি কাজ করেছেন।

—বেআইনি কাজ! সত্যবানের গা চিড়বিড় করে উঠেছিল।

—আলবত বেআইনি কাজ। গাছপালা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। দুমদাম করে আপনি বাড়ির সামনের গাছপালা কেটে ফেলতে পারেন না।

—এটা বাড়ির সামনে কোথায় হল? এ তো বাড়ির ভেতরে, উঠোনে...।

—একই ব্যাপার।

—সামনে-পেছনে, ওপরে-নীচে, কাছে-দূরে—সবই এক ব্যাপার? অদ্ভুত!

—অযথা ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলবেন না। এই ভাবে গাছপালা কাটার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। সরকারের আরও একটা দফতর থেকেও লোক আসবে আপনার কাছে। গাছটাছগুলো আবার অসম্ভব দামি। আপনি রীতিমত বিপদে পড়ে যাবেন।

সত্যবান আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না। একটু ঝাঁজালো গলায় বলে উঠলেন, 'আপনি দেখছি শরৎ চাটুজ্যের সেই অভাগীর স্বর্গের চরিত্রটার মতো কথা বলছেন! নিজের জমির গাছ, অথচ সেই গাছ কেটে মায়ের চিতা সাজাবার অধিকার নেই। মনে পড়ছে গল্পটার কথা?'

পর্ষদের এই ছোট অফিসারটি চিরকাল টুকে পাশ করেছে পরীক্ষায়। তার ফলে অদ্ভুত ধরনের একটা শিক্ষকভীতি এঁর মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। সত্যবানকে একজন কড়া ধাঁচের শিক্ষক ভেবে নিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন, 'এই সব অমূল্য গাছ আপনার জমিতে আপনাআপনি গজিয়েছে—এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমার কাছে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।'

—আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কোনও দায় পড়েনি আমার।

—তা বললে হবে কী করে!

—অদ্ভুত ব্যাপার! আমার জমির গাছ। কেন তা আমি কাটলাম—সে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনার কাছে! আপনার কথার ধরনও দেখছি ওই গল্পের জমিদারবাবুর মতো। আপনি কি অভাগীর স্বর্গ পড়েছেন?

ঢোক গিলল পর্ষদের এই দাপুটে অফিসারটি। স্কুলজীবনে যে ভয় রক্তের মধ্যে বাসা বাঁধে, তার হাত থেকে বোধহয় কখনওই পুরোপুরি নিস্তার পাওয়া যায় না। অফিসারের হাত মাথার পিছনদিকে পৌঁছে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে ঘাড় একটু চুলকেও নিল।

—গল্পের ওই জমিদারবাবুর নামটা কী বলুন তো?

পর্ষদে বেশ কয়েক বছর চাকরি হয়ে গিয়েছে এই মানুষটির। কাজ করতে গিয়ে বেয়াড়া অবস্থার মধ্যে পড়েছে বহুবার, কিন্তু এমন কাণ্ড আর কখনও ঘটেনি। সত্যবান একটু বুঝি ধমকে ওঠার গলায় প্রশ্ন করলেন, 'গল্পের মূল ব্যাপারটা মনে আছে তো আপনার?'

ছাত্রজীবনের সেই মাস্টারমশাই-ভীতি অফিসারকে এবার একেবারে গ্রাস করে ফেলল। ধাক্কা-দেওয়া গলায় কোনওমতে বলে উঠল, 'অভাগীর স্বর্গ আমাদের সিলেবাসে ছিল না। ঠিক আছে, আমি এখন আসছি। পরে আসব আবার।'

প্রায় ছুটে পালাবার ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে পড়েছিল পর্ষদের ছোট কর্তাটি। সত্যবান ভূয়োদর্শী মানুষ, বুঝে গেলেন লোকটি আর কখনও এমুখো হবে না।

।। আট ।।

লীলাবতীর ব্যবহারের মধ্যে হঠাৎই বেশ বড় রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ করছেন সত্যবান। এখন উনি আর আগের মতো কথায় কথায় রেগে যান না। সাত ঘড়া মোহরের স্বপ্নাদেশ পাওয়া নিয়ে যে সব খোঁচা মারা কথা শুরু করেছিলেন, সেগুলোও থামিয়ে দিয়েছেন একদম। স্বভাবের এই রাতারাতি পরিবর্তনের রহস্য সেদিন খানিকটা পরিষ্কার হয়েছিল সত্যবানের কাছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারার পরে বিছানায় খানিকটা গড়িয়ে নেন সত্যবান। ওই গড়িয়ে নেওয়ার সময় এখন কমেছে। একটুখানি বিশ্রাম নেওয়ার পরেই মিস্ত্রিদের কাজের তদারকি করতে ছোটেন। আজ ওঠার মুখেই লীলাবতী এসে হাজির। এসেই দরদমাখানো গলায় বললেন, 'বাব্বা! যা চড়া রোদ! একটু পরে যেও।'

সত্যবানের আর ওঠা হল না। একটু বুঝি আলসেমিতেও চেপে ধরেছিল। খাটের পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসলেন লীলাবতী। তারপর গল্প করার ঢঙে বললেন, 'বাড়ির ভেতরে যে এত বড় একটা জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল, টেরই পাইনি। টের অবশ্য পাবই বা কী করে! দেয়াল ধসে পড়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পথই তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি এটা টের পেলে কী ভাবে? দু-একটা গাছের ডাল কি ছাত টপকে ঝুলে পড়েছিল ওদিকে?' -

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না সত্যবান।

—আন্দাজে কি?

এবারও কোনও উত্তর নেই।

পরপর দুটো প্রশ্নের উত্তর না পেলে লীলাবতীর চটে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখন উনি চটলেন না। বরং গলার স্বর বেশ খানিকটা খাদে নামিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বাড়ির ভেতরদিকের ওই গাছগুলো নাকি খুব দামি গাছ?'

একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন সত্যবান। 'কে বলেছে?'

—কাজের লোক বলছিল। পাড়ার লোকেরা নাকি বলাবলি করছে। সত্যি দামি কি?

—হতে পারে।

এবার একটুখানি অভিমান জমে উঠেছিল লীলাবতীর গলায়। 'তুমি কিন্তু এই ব্যাপারে কিছুই আমাকে বলোনি। কিছুই অবশ্য বলো না আজকাল।'

এ-কথার একটা স্পষ্ট জবাব এসেছিল সত্যবানের মুখে, কিন্তু অপ্রিয় হবে ভেবে সেটা উনি আর বার করলেন না।

লীলাবতী একটা ঢোক গিললেন। ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর গলার কাছে জমে-ওঠা অভিমানটুকুও সরে গিয়েছিল। একটু চাপা কিন্তু বেশ সহজ গলায় বললেন, 'কাঠের তো শুনেছি আজকাল ভীষণ দাম। কেউ কোনও দরটর দিয়েছে কি?'

প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার ভঙ্গিতে সত্যবান বললেন, 'সব গাছ তো কাটা হয়নি এখনও। কাটা শেষ হোক আগে, তারপর দরটর নিয়ে ভাবা যাবে।'

একটু পাশ কাটিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ার তাল করেছিলেন সত্যবান, কিন্তু লীলাবতী ওঁকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'না, আমি বলছিলাম কি— ।'

স্ত্রীর দিকে একটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সত্যবান।

আগের কথার খেই ধরলেন লীলাবতী। 'বলছিলাম কি—তুমি কিন্তু আবার আমার কথাটা উলটো ভাবে ধোরো না। আজকাল তোমাকে কিছু বলতে ভীষণ ভয় লাগে আমার। সুদীপ মাঝখানে একদিন এসেছিল।'

—সুদীপ কে?

—ওই তো সেই ছেলেটা, ওর কথাই তো বলছিলাম তোমায় সেদিন...।

—কোন্ ছেলেটা?

—পুষিদির ভাসুরপো।

উত্তর শুনে সত্যবানের চোয়ালের দুটো হাড় সামান্য উঁচু হয়ে উঠেছিল।

তড়বড় করে বলে উঠলেন 'লীলাবতী, আমি কিন্তু সুদীপকে ডাকিনি। কী একটা দরকারে ওর কাকার কাছে এসেছিল। তা, যাতায়াতের পথে ওই কাঠগুলো ওর চোখে পড়ে যায়। পরে ওর কাকিমাকে দিয়ে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আমার কাছে।'

—প্রস্তাব! কী প্রস্তাব? সত্যবানের গলাটা এখন অদ্ভুত রকমের ঠাণ্ডা।

—বলছিল কি, কাঠগুলো ও কিনতে চায়। কিছু নগদ টাকা এখনই দিয়ে দেবে, বাকিটা অ্যাডজাস্ট করবে পরে।

নিজেকে বেশ কষ্ট করেই সামলে নিয়েছিলেন সত্যবান। 'কিসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট?'

—ওই যে... যে প্রস্তাবটা ও আগেই দিয়েছিল। আমাদের এই জমির ওপরে একটা বড় বাড়ি বানাবে। একটা ফ্ল্যাট দেবে আমাদের, সেই সঙ্গে কিছু টাকাও। এই কাঠ দিয়েই ফ্ল্যাটের বেশ কিছু জানলা-দরজা হয়ে যাবে। পরে সব হিসেবনিকেশ হবে। জানলা-দরজার জন্যে কিছুই হয়তো আমাদের দিতে হবে না। এমনকি এই খাতে হয়তো বাড়তি কিছু টাকাপয়সাও পেয়ে যেতে পারি।

সংযমের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে নিজের সঙ্গেই বুঝি বাজি ধরেছিলেন সত্যবান। অতি কষ্টে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে একটু কেটে কেটে বললেন, 'কাঠের

জন্যে এখন কত টাকা দেবে বলেছে?'

—পনেরো হাজার টাকা।

—প-নে-রো হাজার! খামোখা অত টাকা এখন আটকে রাখার কী দরকার? এই জমিতে একটা হাইরাইজ বাড়ি তৈরি হোক আগে। তারপর সেই বাড়িতে আমাদের এই কাঠ দিয়ে কিছু জানলা-দরজা তৈরি হোক। দামটামের ব্যাপার তারপর ভাবা যাবে। তোমার ওই ছোকরা প্রোমোটরের গোঁফ আছে?

—গোঁফ!

—থাকা উচিত। আছে নিশ্চয়ই। ওকে ওর গোঁফে তেল মাখিয়ে রাখতে বলো। গাছের কাঁঠাল পাকতে একটু দেরি আছে, কিন্তু পাকবেই। ওই কাঁঠাল খেতে গিয়ে গোঁফে যাতে তেল না লেগে যায়, তার জন্যে একটু আগে থেকে তৈরি থাকা ভাল।

লীলাবতীর চোখমুখ বেশ লালচে হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিরি ভাবে ফেটে পড়ার আগে ওঁর চোখমুখের চেহারা ঠিক এইরকমই হয়ে থাকে। এটা বুঝি বিদ্যুতের ঝলক। ওই ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, একটু বাদে মেঘ ডাকবে কড়-কড়-কড়াত্‌। ভয়ঙ্কর ওই আওয়াজ শোনার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন সত্যবান, কিন্তু অবাক কাণ্ড! নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরেও বুক-কাঁপানো ওই শব্দ শোনা গেল না। উঠে পড়েছিলেন সত্যবান। কিন্তু ঘর থেকে বেরুবার মুখে দরজা প্রায় আটকে রেখে লীলাবতী বললেন, 'ওই সব কাঠের ভাল রকম দর পেয়েছ তুমি, তাই না?'

—কেন, এ-কথা বলছ কেন?

—ভাল দর না পেলে সুদীপের ওই প্রস্তাবটা তুমি এভাবে উড়িয়ে দিতে না।

—সে তো একশোবার সত্যি। কিছু না চাইতেই আমি যথেষ্ট ভাল দর পেয়ে গিয়েছি। এ দর আরও অনেক ওপরে উঠবে। তাও তো সব গাছ এখনও কাটা হয়নি।

চোখ ধারালো করে লীলাবতী প্রশ্ন করলেন, 'কী দর পেয়েছ শুনি?'

—অনেক।

—কত?

—একজন নিজে থেকে এসে পঞ্চাশ হাজার টাকার দর দিয়েছে।

—পঞ্চাশ হাজার!

—হ্যাঁ, পরদিনই একজন এসে বলল, এক লাখ। বলল, নগদ টাকা গুনে দিয়ে মাল তুলে নিয়ে যাবে।

—এক লাখ টাকা!

বিস্মিত লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সত্যবান বললেন, 'দরদামের মধ্যে না যেতেই এক লাখ। ওই দর আপসে আরও কয়েক গুণ ওপরে উঠবে। তোমার পুষিদিদি আর বেড়াল ভাসুরপোকে কি আর সাধে ধড়িবাজ বলি! মাত্র পনেরো হাজার ঠেকিয়ে লাখটাকার ওপরের কাঠ গাপ করার তালে ছিল পুষি বেড়ালরা।'

কথাগুলো শুনে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন লীলাবতী।

সত্যবান জীবনে নানা ধরনের মানুষের মুখোমুখি হয়েছেন অসংখ্যবার। দেখা আর

শেখার কাজ চলেছে পাশাপাশি। উনি জানেন, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে প্রায় ষাট শতাংশ সমস্যা তৈরি হয় টাকাপয়সার অভাব থেকে। যথেষ্ট পরিমাণে টাকা থাকলে ওই সমস্যাগুলো হয়তো সমস্যা হিসেবে মাথাই তুলতে পারত না। সত্যবান ধরে নিলেন, লীলাবতীর মাথা রাতারাতি এত ঠাণ্ডা হওয়ার কারণটি অর্থনৈতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। বাড়ির সামনে থাক দিয়ে রাখা দুষ্প্রাপ্য কাঠ আর সোনার বাঁটের মধ্যে দামের দিক থেকে খুব একটা তফাত নেই আজকাল। লীলাবতী এখন তো লাগাম ছেড়ে সুখের স্বপ্ন দেখতেই পারেন, হয়তো দেখছেনও। না হলে স্বভাবের মধ্যে এমন একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব দেখা যেত না!

কিন্তু লোকচরিত্রের অনেকগুলো দিক এখনও সত্যবানের জ্ঞানগম্যির বাইরে। নিজের পিঠ চাপড়ানোর দিকে এগোবার মুখে মানুষটি বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলেন। কর্তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পরে হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠলেন লীলাবতী। ঘাবড়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। 'কী হল? কান্না কেন? আরে!'

সত্যবানের প্রশ্নগুলোর মধ্যে বিস্ময়, স্নেহ আর শাসন ঘুরেফিরে আসছিল, কিন্তু কোনওরকম উত্তর দেওয়ার মধ্যে গেলেন না লীলাবতী। কিছুক্ষণ কাঁদার পরে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন মুখে। কান্নার বেগ আস্তে আস্তে কমে আসার পরে কেমন যেন কপাল চাপড়ানোর গলায় বলে উঠলেন, 'টাকা-টাকা করে পাগল হয়ে গিয়েছে লোকটা, নইলে কেউ কি অমন বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখে!'

—বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন! একটু বুঝি কেঁপে উঠেছিলেন সত্যবান।

—তা নয়তো কী? তোমার বাড়িতে সাত ঘড়া মোহর বয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্যে ঠাকুরদেব্‌তারা পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! এমন আজগুবি কথা কেউ কখনও শুনেছে কি?

প্রসঙ্গটা যে এমন একটা বেয়াড়া দিকে ঘুরে যাবে—কল্পনাও করতে পারেননি সত্যবান! হতভম্ব হয়ে থাকার মুখে আবার মুখ ছোটালেন লীলাবতী। 'যে যা বোঝায় তাই বুঝে যায়। লোকে বুঝিয়েছে, ওগুলো জঙ্গুলে গাছ নয়—চন্দন গাছ। ব্যস, উনি তাই বুঝে গেছেন!'

নিজের কানকে বুঝি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সত্যবান। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পর বললেন, 'যে যা বোঝায় মানে! ওগুলো জঙ্গুলে গাছ' কাঠের কারবারিরা কি উজবুক? কাঠ না চিনে ওরা ওই দর দিয়ে গেছে?'

—সত্যিসত্যি দর দিয়েছে নাকি! মজা করেছে, স্রেফ মজা!

হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। 'কী বলছ তুমি! সরকারি দফতরের লোকও তো এসেছিল। ওরা পর্যন্ত বলে গেছে গাছগুলো দামি। ভাল জাতের সেগুন আর মেহগনি আছে এর মধ্যে। ওরাও কি মজা করতে এসেছিল নাকি আমার সঙ্গে!'

—ওরা যে সরকারেরই লোক—সেটা বুঝলে কী করে? বদলোকেরা ওই পরিচয় দিয়ে ঠাট্টা করে গেছে তোমার সঙ্গে।

লীলাবতীর বিচিত্র এই কথাটায় তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। বেশ কিছুক্ষণ

থমকে থাকার পরে বললেন, 'তোমার কথা শুনে একটা গল্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। এক বোকা বামুন হাট থেকে একটা ছাগল কিনেছিল। তারপর বনের ভেতর দিয়ে ঘরের পথে যাবার সময় কাঁধে তুলে নিয়েছিল ছাগলটাকে। তাই দেখে তিন জোচ্চোর একটা মতলব এঁটেছিল। বামুন কিছুটা যাওয়ার পরে এক জোচ্চোর এসে বলল : এ কী ঠাকুরমশাই! তুমি কাঁধে করে একটা কুকুর নিয়ে যাচ্ছ! গাঁয়ের লোকে দেখলে তো ছি-ছি করবে! বামুন কথাটাকে পাত্তাই দিল না। আরও কিছুটা যাওয়ার পরে দ্বিতীয় জোচ্চোর এসে একই কথা শোনাল। বামুনের খটকা লাগল এবার। ব্যাপারটা কী! আরও কিছুটা পথ এগোবার পরে হাজির হল তৃতীয় জোচ্চোর। সেও ওই একই কথা শোনাল চোখ বড়-বড় করে। বোকা বামুন তখন ভাবল, তিন-তিনটে লোক কি আর ভুল বলছে! ভুলটা নিশ্চয়ই ওর নিজের। ভাগ্যিস ওরা ধরিয়ে দিয়েছে! নইলে কুকুর কাঁধে গাঁয়ে ঢুকে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়তে হত। কাঁধ থেকে ছাগল নামিয়ে দিয়ে ঘরের পথ ধরেছিল বোকা বামুন। ওদিকে তখনই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছাগলটাকে হাতিয়ে নিয়েছিল তিন জোচ্চোর।'

বেশ জমিয়ে গল্প শোনালেন সত্যবান, কিন্তু গল্পের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না লীলাবতীর মধ্যে। ওঁর কান্না অবশ্য থেমে গিয়েছিল একদম। আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছেও নিয়েছিলেন। গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে সত্যবান বললেন, 'আমি বোকা বামুন নই। দামি কাঠগুলোকে আজেবাজে কাঠ বলে বুঝিয়ে দেবার চাল খাটবে না এখানে। চালটা নিশ্চয়ই তোমার পুষিদিদি আর বেড়াল ভাসুরপোর।'

শেষ কথাটা কানে যেতেই দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন লীলাবতী। কিন্তু ফেটে পড়ার আগেই বাড়ির ভেতরদিকের উঠোনে সরে পড়েছিলেন সত্যবান।

আদ্যিকালের বাড়ির মস্ত এই উঠোনে এখনও ছোটখাটো একটা জঙ্গল। বিস্তর গাছপালা কাটা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যা আছে তাও কম নয়। ছেলেবেলায় পড়া ভূগোলের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সত্যবানের। শুধু পাঠ্য অংশটুকু নয়, বইয়ের সেই ছবিটাও যেন দেখতে পাচ্ছিলেন পরিষ্কার। ঠাসা গাছপালা সমেত রেন-ফরেস্ট। অসম্ভব ঘন জঙ্গল। ধরতে গেলে সারা বছরই প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ে ওখানে। চিরসবুজ ওই বনে ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই। শুধু গাছ আর গাছ। ছেলেবেলার সেই ভূগোল বইতে ছাপা দুর্ভেদ্য রেন-ফরেস্টের পাতাজোড়া ছবিটা বারকয়েক চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সত্যবানের।

এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ওই সব এলাকার তুলনায় অনেক কম, কিন্তু ছোট্ট এই জঙ্গলের চেহারা অনেকটা বুঝি ওই রকমই। মাটিতে একটুও ফাঁকা জমি নেই। একটা গাছের ঠিক পাশেই আর একটা গাছ। প্রতিটি গাছই দারুণ ঝাঁকড়া। ওদিকের জড়ানো মেশানো ডালপালাগুলো ঠিক যেন চাঁদোয়ার মতো।

ওপর থেকে এবার নীচের দিকে দৃষ্টি চলে এসেছিল সত্যবানের। এদিকের গাছটা কাটা হয়ে গিয়েছে, এবার শাবল চালানো হচ্ছে গাছের গোড়ায়। পায়ে পায়ে ওখানে এগিয়ে গেলেন সত্যবান। মিস্ত্রিদের বলা আছে, প্রতিটি গাছের গুঁড়িই যত দূর সম্ভব খুঁড়ে বার করতে হবে। গুঁড়ির সঙ্গে কিছু পরিমাণ শিকড়বাকড়ও কেটে বের করা

হচ্ছে। এই নির্দেশের একরকম ব্যাখ্যা মিস্ত্রিরা নিশ্চয়ই করেছে। সহজ ব্যাখ্যা। গুঁড়ির একেবারে শেষ পর্যন্ত তুলে আনতে পারলে কাঠের দর কিছুটা বাড়বে। কিন্তু যে দুজন আসল কারণটা জানেন, তাঁরা উদগ্রীব হয়ে থাকেন এই পর্বে।

ওই দুজনের একজন এখন এখানে নেই। উৎকণ্ঠার চাপ টের পাচ্ছিলেন সত্যবান। আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। এই গাছটা গোড়া থেকে কাটা হয়ে গিয়েছে আগেই। এবার চারপাশের মাটিতে শাবল মেরে গুঁড়িটাকে ওপরে তুলে আনতে হবে।

।। নয়।।

গাছের গুঁড়ির দুদিক থেকে দুজন মিস্ত্রি শাবল চালাচ্ছিল। বেশ কিছুটা মাটি উঠে এসেছে ওপরে। চারদিকের গর্ত একটু-একটু করে বাড়ছিল। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছিল সত্যবানের উৎকণ্ঠা।

গাছের গুঁড়ির চারপাশের গর্ত আরও খানিকটা গভীর হতেই মা জগদম্বার সেই জ্যোতির্ময়ী রূপ স্পষ্ট দেখতে পেলেন সত্যবান। মায়ের সেই কথাগুলোও আছড়ে পড়ছিল কানের ওপর। মা বলেছিলেন : বাড়ির সামনের গাছের তলা খুঁড়লেই সাত ঘড়া মোহর পাবি।

স্বপ্নাদেশ দেওয়ার সময় ঠাকুরদেবতারা একটু রহস্য করতে ভালবাসেন। বেশ কয়েকবার শোনার পরে শিবনাথের এই ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস করে ফেলেছেন সত্যবান। বাড়ির সামনের দিকে কোনও গাছ নেই, কিন্তু পেছনে তো আছে। একটা নয়, অনেকগুলো। দিকবদল করলেই স্বপ্নের রহস্য মিটে যায়। বেশ কয়েকটা গাছের তলা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে আরও কিছু। এই সব গাছের একটার তলা থেকে নির্ঘাত...।

হঠাৎই সামনের মিস্ত্রির শাবলের মাথা থেকে একটা ধাতব শব্দ ছিটকে উঠল বাতাসে। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সত্যবানের। শাবলের মাথা কাঁসা বা পেতলের ঘড়ায় আঘাত করলে এই রকমই তো শব্দ ওঠার কথা! মিস্ত্রিরা শাবল চালিয়ে যাচ্ছিল একই ভঙ্গিতে। মাঝেমধ্যে শাবল থামিয়ে গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাটি তুলে আনছিল ওপরে।

এবার যে তালগুলো তুলল, তার মধ্যে বেশ বড় মাপের একটা টিনের চাকতি ছিল। কোনও বাতিল টিনের বাক্সের অংশ হতে পারে। হয়তো টানা শ-দেড়েক বছর চাপা পড়ে ছিল মাটির তলায়।

দুই মিস্ত্রিই শাবল চালাচ্ছিল মাটির মধ্যে। গর্ত একটু একটু করে আরও গভীর হচ্ছে, কিন্তু ওই ধরনের ধাতব শব্দ আর একবারও শোনা গেল না। তবে অদ্ভুত এক বিশ্বাস কেমন যেন চেপে ধরেছিল সত্যবানকে। বারবার মনে হচ্ছিল মায়ের স্বপ্নাদেশ সত্যি হবেই।

ভোররাতের দিকে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। হাওয়ায় এখন বেশ চমৎকার একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। বিচ্ছিরি গরম পড়েছিল এ ক'টা দিন, কিন্তু এক পশলা বৃষ্টিই অস্বস্তি কাটিয়ে দিয়েছে সবার। দু-বন্ধুকে দু-কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে কাছের দোকানে

টুকটাক কিছু কেনাকাটা করতে গেছেন লীলাবতী, সুতরাং খোলামেলা আলোচনা সারার ব্যাপারে কোনও বাধা নেই এই মুহূর্তে।

চায়ের কাপে তৃতীয় চুমুক দেওয়ার পরে শিবনাথ বন্ধুকে বললেন, 'দু'দিন হল গাছ কাটানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে তোমার। আর কী, এবার কাঠগুলো বেচে দাও। খদ্দের তো ঘুরঘুর করছে সমানে। ওদিকে তোমার পাহারাদার একজনের জায়গায় তিনজন হয়েছে। পুরনো চেনা পাড়া মানছি, কিন্তু এত দামি কাঠ বাইরে এ ভাবে ফেলে রাখা ঠিক নয়। কারও সঙ্গে কথা পাকা করলে?'

দুদিকে মাথা নাড়ালেন সত্যবান। 'বিক্রি করা দেখছি রীতিমত ঝঞ্ঝাটের কাজ।'

—কেন, ঝঞ্ঝাটের কেন? যে খদ্দের সবচেয়ে বেশি দাম দেবে, তাকেই বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে কাউকে খাতির করার কোনও প্রশ্ন উঠছে না। সহজ ব্যাপার। তা, তোমার এখন আটকাচ্ছে কোথায়?

—আরে, এই ফ্যাকড়াটা তো কালকেই জানতে পারলাম।

—ফ্যাকড়া! কীসের ফ্যাকড়া?

—প্রত্যেকেই তো এক এক রকম দর হেঁকে গেল! তা, কাল সন্ধেয় ওদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম—পেমেন্ট করার কায়দাটা প্রত্যেকেরই এক রকম।

—কীরকম?

—পেমেন্ট করবে সাদা-কালো মিশিয়ে। প্রথমজন দর দিল আট লাখ—কিন্তু ওই টাকার মধ্যে ছ'লাখ দেবে কালোয়, মাত্র দু'লাখ সাদায়। দ্বিতীয়জনের দর ন'লাখ, কিন্তু সাদার পরিমাণ দেড়। তৃতীয়জনের দর দশ, কিন্তু সাদা মাত্র একলাখ।

অবাক হয়ে সব শোনার পরে শিবনাথ বললেন, 'সাদা-কালোর ভাগের মধ্যে বেশ একটা মিল আছে দেখছি। দর যত উঠছে, সাদার পরিমাণ তত কমছে। তা, তুমি কী বললে?'

—কী আবার বলব? বললাম পরে জানাব। আমার হিসেব তো অন্যরকম ছিল। অনেকটা ওই নিলামের মতো। যে সবচেয়ে চড়া দর হাঁকবে, মাল তার কাছেই বেচে দেব। সাদা-কালোর হিসেবটা তো মাথাতেই আসেনি।

শিবনাথ হাসলেন। 'তুমি ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে হলে কী হবে, তুমি নিজে তো কখনও ব্যবসা করোনি। এই অঙ্কগুলো তাই তোমার মাথায় খেলেনি। আমার কলেজ-আমলের এক বন্ধু সামন্তদের লোহালক্কড়ের ব্যবসা ছিল, পারিবারিক ব্যবসা। ওর কাছে ব্যবসার অন্দরমহলের অনেক কথা শুনেছি আমি। কতটা সত্যিমিথ্যে, তা অবশ্য জানি না। তবে ঘুষ বা কালো টাকা নিয়ে সামন্তের কোনও চক্ষুলজ্জা ছিল না। ও বলত, ভারতে এই ব্যাপারটা বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে। এটাই দস্তুর। ব্যবসার দুটো পথ। একটা এক-নম্বরি, আর একটা দু-নম্বরি। যে ব্যবসায়ী বলে দু'নম্বরি করে না—সে ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।'

বিরক্ত হলেন সত্যবান। 'বাজে কথা। আগ বাড়িয়ে অপকর্মের ফিরিস্তি দেবার মধ্যে এক ধরনের বাহাদুরি আছে। কিছু লোক বাহাদুরির লোভে এই সব প্রচার করে,

সত্যিকারের মিথ্যেবাদী ওরাই। ভাল ব্যবসার সঙ্গে সততার একটা সম্পর্ক আছে। আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।'

শিবনাথ হেসে উঠে বললেন, 'আমার কথা নয়, সামন্তর কথাই বলছি। তোমার কথাটাই ও ঠিক উলটো ভাবে বলেছিল। বলেছিল, 'আমাদের দেশে ভাল ব্যবসার সঙ্গে সততার সম্পর্ক কখনও ছিল না, কখনও থাকবেও না।'

—বাজে কথা। প্রমাণ কোথায়? যা হোক, কিছু একটা বলে দিলেই হল!

সত্যবানদের পরিবারে আগের তিন পুরুষ ব্যবসা করেছে, সুতরাং ওঁকে একটু বুঝি উত্তেজিত দেখাল।

শিবনাথ মজা পাচ্ছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'সামন্ত বোধহয় সব কথা ওর বাপ-জ্যাঠার কাছেই শুনেছিল। না হলে পটাপট একগাদা উদাহরণ দিতে পারত না। সব উদাহরণ আজ আর মনে নেই। প্রাচীন যুগের কয়েকজন হিন্দু রাজার নাম বলেছিল। উপঢৌকন, উৎকোচ—এই সব তখন নাকি খুব চলত। এই ঘুষের ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায় মুঘলযুগে। নবাব-বাদশা আর তাদের লোকজন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দু'হাতে ঘুষ নিত। সব চেয়ে বেশি গলাকাটা হত বিদেশী বণিকদের। ভারতে তখন বিস্তর পুর্তগিজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ বণিক আসত। তাদের কাছ থেকে দফায় দফায় ঘুষ নেওয়া হত। এত ঘুষ দেবে না বলেই এদেশে কেল্লা বানাতে শুরু করেছিল বিদেশিরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্গ বানাবার পেছনে ওটাই নাকি সবচেয়ে বড় কারণ। তবে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে গিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলেও প্রচণ্ড ঘুষ খাওয়াখাওয়ি শুরু হয়ে যায়।'

ব্যবসায়ী তিন পুরুষের সততা প্রমাণ করার জন্যেই সত্যবান বেশ ভারিক্কি চালে বলে উঠলেন, 'কাঠ বেচতে গিয়ে আমি কিন্তু কোনওরকম কালো টাকার লেনদেনের মধ্যে যাব না। তার জন্যে কিছু কম টাকা পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। ছেলেবেলা থেকে আমাদের পরিবারে দু-নম্বরি ব্যাপারটা কখনও দেখিনি, এখনও দেখা যাবে না।'

শিবনাথ বুঝলেন, এই নিয়ে এখন আর হাসি বা মজার মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ তুমি। অকারণে সাদা-কালোর হিসেবের মধ্যে যাবার দরকার নেই। তবে বলছিলাম কী, এ ব্যাপারে একবার কোনও উকিলের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া ভাল—মোড অফ পেমেন্ট কেমন হবে না হবে...।'

—কথা বলা হয়ে গিয়েছে আমার।

—হয়ে গিয়েছে? বাহ্! কার সঙ্গে বললে?

—কাল সন্ধেয় সরোজবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। কোর্ট থেকে ফিরছিলেন। তা, ওঁকে সব বলার পরে জিজ্ঞেস করলাম—টাকাপয়সাটা কীভাবে নেওয়া যায় বলুন তো? সরোজবাবুর কথা খুব পরিষ্কার। বললেন, চেক আর নগদ টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন। সবচেয়ে ভাল হয়, টাকা যদি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে পাওয়া যায়। নিয়ে গিয়ে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফেলে দেবেন। ব্যস।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শিবনাথ বললেন, 'খুব ভাল পরামর্শ। চেক বাউন্স করা নিয়ে একটা ভয় তো থেকেই যায়। নগদে নেওয়ার হ্যাপাও কম নয়। আজকাল পাঁচশো আর হাজার টাকার নোট খুব জাল হচ্ছে। এত টাকার পেমেন্টে তো ওই সব বড় টাকার নোট একগাদা থাকবে। ওগুলোর মধ্যে বেশ কিছু জাল নোট থাকতেই পারে। সেগুলো এখন কে বুঝবে বলো? তোমার আমার দ্বারা তো হবে না। জাল নোট নেওয়ার মস্ত ঝুঁকি। শুধু ঠকেই যে পার পাবে, তা নয়। লেনদেনের সময় তোমার হাতের নোট জাল হিসেবে ধরা পড়লে তো কেলেঙ্কারি। উকিলবাবু ঠিকই বলেছেন, এক্ষেত্রে বেচাকেনার সেরা উপায় হল, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট। এক মিনিটেই মিটে যাবে ব্যাপারটা। তোমার ব্যাঙ্ক এখান থেকে একটু দূরেই। কিন্তু পকেটে করে নিয়ে গিয়ে জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও ঝুঁকি নেই। নগদ টাকা হলে ব্যাপারটা অন্য রকমের হয়ে যেত। অত টাকা ব্যাঙ্ক পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ঝুঁকির। কী দরে ছাড়ছ, তা নিয়ে কিছু বলেছ উকিলবাবুকে?'

—না, তবে কাঠের খবর ওঁর কাছে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

—তাই! কীরকম?

—বললেন, আপনার বাড়ির ভেতরদিকের জমিতে বেশ কিছু গাছপালা গজিয়েছে—সে খবর আগেই আমার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ওই সব গাছ থেকে বেশ কিছু তক্তা বেরুবে। তবে গুজবের চেহারাটা কীরকম দেখুন—রটে গিয়েছে ওই সব গাছের মধ্যে অনেকগুলো সেগুন আর মেহগনি আছে। লোকগুলোর কাণ্ডজ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। গুজব আপনার কানে আসেনি?

শিবনাথ টানটান হয়ে বসেছিলেন। 'তা, কী বললে তুমি সতু?'

—একটু এড়িয়ে গেলাম। বললাম, একেবারে যে শুনিনি—তা নয়। তবে ধরেই নিয়েছিলাম ওগুলো বাজে লোকের বদ রসিকতা। কিছু আবার বোকা লোকের রটনাও হতে পারে।

—ভাল করেছ, আগ বাড়িয়ে সকলকে ভেতরের কথা না বলাই ভাল। কিছু লোক যদি এটাকে গুজব ভাবে, সেটা আমাদের পক্ষে ভাল। দিনকাল ভাল নয়। তা ছাড়া, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গেলে ব্যাপারটাকে আজগুবি ছাড়া আর কিছুই বোধহয় বলা যায় না। বাড়ির ভেতর দিকের উঠোনে, তোমার সে উঠোন যতই বড় হোক না কেন, আপনাআপনি মেহগনি আর সেগুন গজানো তো অসম্ভব। ভাবতে গেলে এখনও থই পাই না!

মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল সত্যবানের মুখে। 'দৈবী কৃপার কথা তুমিই তো বলে যাচ্ছ গোড়া থেকে। ভগবান সহায় হলে সবই নাকি হয়, এমনকি জলেও পাথর ভাসে।'

—হয়ই তো। মুখের ভাষায় যাকে আমরা মিরাক্‌ল বলি, তেমন কাণ্ড এই পৃথিবীতে এখনও ঘটে। স্বাভাবিক কারণেই সেগুলো সংখ্যায় খুব কম, কিন্তু ঘটে তো। এই তোমার ব্যাপারটাই ধরো না কেন। এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে চলেছে—সেটার আভাস তুমি আবার স্বপ্নেই পেয়ে গিয়েছিলে।

হঠাৎই এক টুকরো মেঘ এসে জমল সত্যবানের মুখে। 'না-না, স্বপ্নাদেশের সঙ্গে

এর কোনও মিল নেই। মা জগদম্বা স্বপ্নে জানিয়েছিলেন—বাড়ির সামনের গাছতলা খোঁড়। সাত ঘড়া মোহর পাবি। স্পষ্ট কথা। কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে। কিন্তু কই, হল না তো! তুমি একটা ব্যাখ্যা দিলে শিবু, স্বপ্নাদেশের ওই সামনের দিকটাকে পেছনের দিক হিসেবে ধরতে হবে। ভাল কথা। বাড়ির ভেতরদিকে অত গাছ দেখে আমি এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলাম—একটা না একটা গাছের তলা থেকে ঠিক মোহর পেয়ে যাব। কিন্তু কই, তেমন কিছুই তো ঘটল না...।'

শিবনাথের চোখমুখের চেহারা একটু বুঝি কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'কিছুই ঘটেনি—এ কথা বোলো না সতু। মোহরের বদলে যা পেয়েছ, তাও তো অকল্পনীয়! এ তো আর আকবরের আমল নয় যে, কথায় কথায় মোহরের কথা উঠবে! ঠাকুরদেব্‌তারা তোমার আমার মতো এ যুগে জন্মাননি। তাঁরা আছেন সৃষ্টির আগে থেকে। একটা সময় তো বিনিময়-মুদ্রা বলতে কড়ির চল্ ছিল। তখন দেবদেবীরা নিশ্চয়ই স্বপ্নাদেশে কড়ির কথা বলতেন। তারপর এল মোহর। স্বপ্নাদেশে অমনি কড়ির জায়গায় মোহর চলে এল। এখন কারেন্সি নোটের যুগ। মোহরের বদলে নোট ধরতে হবে। ঠাকুরদেব্‌তারা তো বহুকাল আগের, আজকের কনভারশন টেব্‌ল ব্যবহার করার কথা সব সময় ওঁদের মনে নাও থাকতে পারে। আমার মনে হয় সতু, মা জগদম্বা পরে তোমাকে স্বপ্নের মধ্যেই একটা কারেকশন দিয়ে দেবেন।'

বন্ধুর কথা শুনে সত্যবান একই সঙ্গে একটু বিরক্ত আর সতর্ক হলেন। অদৃশ্য কাউকে বুঝি শোনাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'যা পেয়েছি তা মা জগদম্বার দয়াতেই। মায়ের এই কৃপায় আমি ধন্য। এই কৃপার কথা আমি একটা দিনের জন্যও ভুলতে পারব না। কিন্তু তুমি আমার কথাটার সম্পূর্ণ উলটো ব্যাখ্যা করেছ শিবু। আর একটা কথা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁর হাতে; তিনি দরকারের সময় হাতের কাছে কনভারশন টেবল পেলেন না—তাই কখনও হয়! উনি ভুল করে সাত ঘড়া মোহরের কথা বলে ফেলেননি—যা বলতে চেয়েছিলেন, তাই বলেছেন। এখন আমি যদি ওগুলো না পাই, ধরে নিতে হবে —আমি ওঁর ওই কৃপা পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি।'

শিবনাথ হাসলেন। 'তুমি ভক্ত মানুষের মতো কথা বলছ। ভক্তরা চিরকালই নিজেদের অধম বলে থাকে। তুমি কৃপা পাবার যোগ্য কি না সেটা তো মা ঠিক করেছেন। এ ব্যাপারে মায়ের অধিকার নিয়ে কোয়েশ্চেন করার কেউ নেই। মানুষ মায়াবদ্ধ জীব, মায়ার আবরণ না সরলে সত্যিটাকে পরিষ্কার দেখা যায় না। এ কথাটা আমার নয়। বড়-বড় সাধকরা বলেছেন। তোমার এখন কাজ হল, ওয়েট অ্যান্ড সি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সেই সঙ্গে সারতে হবে হাতের কাজকর্মগুলো। কাঠবিক্রির ব্যাপারটা কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। রাস্তার ওপর অতগুলো দামি কাঠ...। গোডাউন হলে আলাদা কথা ছিল।'

সায় দিয়ে সত্যবান বললেন, 'আজ বিকেলেই কয়েকটা পার্টি আসবে। আমি পরিষ্কার আমার টার্মস বলব। যারা রাজি হবে, তাদের সঙ্গেই বাকি কথাবার্তা হবে। ধরে রেখে দর তোলার লাইনে একেবারেই যাব না।'

এক পার্টির আসার কথা ছিল বিকেল চারটেয়, সে এসে হাজির হল তিনটেয়। লোকটা ঝানু ব্যবসাদার। মুলুক ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা করছে পঁচাশ সাল। সত্যবানের প্রস্তাব শুনে আঁতকে উঠে বলল, আপনার কথায় কউনো কারবারি রাজি হবে না। আপনি হামার একটা সিধা কথা শুনুন—।

ব্যবসায়ীর সিধা বলতে ঢেউ-খেলানো সিধা। কিন্তু সত্যবান গোঁ ধরে বসেছিলেন : আমার টাকা কিছু কম হয় হোক, কিচ্ছু এসে যায় না—আমি মাল বেচব শুধুমাত্র সাদা টাকায়।

ঝানু কারবারি কথাবার্তা চালাবার মধ্যে বহুবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, দরজার কাছে চলেও গিয়েছিল কয়েকবার। শেষকালে সত্যবানের হাতদুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলল : সাত লাখ টাকায় রাজি হয়ে যান বাবু। এর বেশি হলে হামার খুব নুকসান হয়ে যাবে। আমি কাল সকালে এসে পুরো টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিয়ে মাল তুলে নিয়ে যাব।

সত্যবান ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে মোটা লাভ করার মধ্যে একেবারেই যেতে চাননি, সুতরাং পাকা ব্যবসায়ীর আবেদনে সাড়া দিলেন। বললেন : ঠিক আছে, কাল সকালে কখন আসছেন?

—সাড়ে-দশটায়।

পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে-দশটাতেই লরি নিয়ে হাজির হয়েছিল কারবারি। ব্যাঙ্ক ড্রাফট হাতে ধরিয়ে দুষ্প্রাপ্য সব কাঠ লরিতে তুলতে লাগল। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে সাফ হয়ে গেল বাড়ির সামনের অস্থায়ী কাঠগুদাম।

গোড়া থেকেই বন্ধুর পাশে ছিলেন শিবনাথ। পুরো ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পর বললেন, 'যাক, সব ভালয় ভালয় চুকে গেল। এখন কি তোমার ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফ্‌টটা জমা দিয়ে আসবে?'

লাজুক মুখে উত্তর দিলেন সত্যবান, 'হ্যাঁ, ভাবছি দিয়েই আসি একেবারে। যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

—আরে! এর আবার বলার কী আছে!

কিন্তু রাস্তার মোড়ের মাথায় পৌঁছবার পরে সত্যিকারের অবাক হলেন শিবনাথ। বাসে, মিনিবাসে ওঠার জায়গা আছে দিব্যি, কিন্তু হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন সত্যবান। ট্যাক্সিটা পাশে এসে দাঁড়াতেই সত্যবান এক হাতে দরজা খুলে বললেন, 'নাও, উঠে পড়ো।'

অন্য সময় হলে অকারণে ট্যাক্সি ডাকার জন্যে বন্ধুর সঙ্গে নির্ঘাত মজা করতেন শিবনাথ, এখন আর তার মধ্যে গেলেন না। ট্যাক্সি ছুটে চলেছিল সোজা। বন্ধুর পকেটে সাত লাখ টাকার ড্রাফ্‌ট। হঠাৎই বন্ধুর সঙ্গে কেমন যেন একটা দূরত্ব বোধ করলেন শিবনাথ। তবে এই বোধটা বেশিক্ষণ ওঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি।

প্রতিদিনের মতো আবার গল্পগুজবের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন শিবনাথ। ড্রাফ্‌টটা ব্যাঙ্কে জমা দেবার পরে ফেরার পথে মিনিবাস ধরা হয়েছিল। অফিস-টাইমে উলটোদিকের বাসেট্রামে ভিড় বেশ কম থাকে। সুতরাং ফেরাটাও বেশ আরামের হল। কিন্তু পাড়ার

স্টপে নামার পরেই মেজাজ খাট্টা হয়ে গিয়েছিল সত্যবানের। বাড়ির সেই দালাল পথ আগলে দাঁত বার করে বলল, 'কাকু, এখন কি আমি সেই পার্টিকে নিয়ে আসব?'

দালালটাকে দেখেই সত্যবানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পার্টি! কোন্ পার্টির কথা বলছ?'

—ওই যে কাকু, সেদিন যার কথা বলেছিলাম। খুব ভাল পার্টি। বায়নাটায়না নয়, রেজিস্ট্রির দিন একেবারে পুরো টাকা দেওয়ার পরে দখল নেবে বাড়ির।

দাঁতে দাঁত চেপে সত্যবান বললেন, 'সাত পুরুষের ভিটে। খেতে না পাই, সেও ভাল; এ বাড়ি আমি বেচব না। তুমি আর কক্ষনো আমাকে এসব কথা বলতে আসবে না। যাও।'

ওই রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটা শাঁ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

শিবনাথ মৃদু হেসে বললেন, 'সেই ভুলটা আবার করলে, সতু। এটা ভিটে নয়, বাড়ি। এবং বাড়িটা সাত পুরুষের নয়, চার পুরুষের। আর, না খেতে পেয়ে মরার প্রশ্নই উঠছে না। আজ থেকে তুমি বাড়তি সাত লাখ টাকার মালিক।'

কী যেন একটা উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন সত্যবান, তারপর নরম গলায় বন্ধুকে বললেন, 'চলো, আর এক কাপ চা খাওয়া যাক।'

।। দশ।।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পরে শিবনাথ বললেন, 'তিন-চার সপ্তাহ বেকার বসিয়ে রেখে ইঞ্জিনিয়ার এত বড় একটা এস্টিমেট ধরিয়ে দিল তোমার হাতে। তুমি তোমার বাজেটের কথা বলোনি?'

—কেন বলব না? পরিষ্কার বলেছি—বাড়ি সারাইয়ের জন্যে এর বেশি টাকা দেওয়ার সঙ্গতি নেই আমার। তা, উনি বললেন, আপনার বাড়ির অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে। ছাতের অবস্থা বিপজ্জনক। যে-কোনও দিন ধসে পড়তে পারে। যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু করতে গেলেও আপনার ওই বাজেটের তিন গুণ বেশি টাকা খরচা হবে।

ঠোঁটে মৃদু একটা বাঁক খেলে গিয়েছিল শিবনাথের। গলার স্বর একটু তুলে বললেন—বাদ দাও তো ইঞ্জিনিয়ারের কথা। তোমার বাড়ির ছাতের অবস্থা কিছুই তেমন বিপজ্জনক নয়। ওদের একটু বাড়িয়ে বলা স্বভাব।

—না-না, এটা বাড়িয়ে বলেনি। তোমাকে বলা হয়নি, গত বছর একদিন কর্পোরেশনের একটা লোক এসে খানিকটা চোটপাট করে গিয়েছিল। বলেছিল, ছাতের অবস্থা খুব খারাপ। চটপট সারান, না হলে কর্পোরেশনের লোক এসে ভেঙে দিয়ে যাবে।

শিউরে উঠলেন শিবনাথ। 'তাই! তোমার তো তাহলে অনেক আগেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। শোনো, এক কাজ করো। ছাতটা ইমিডিয়েটলি সারিয়ে নাও। বাকি মেরামতির কথা পরে ভাবা যাবে।'

শুকনো মুখে দুদিকে মাথা নাড়লেন সত্যবান। 'তার কোনও উপায় নেই।'

—কেন উপায় নেই?

—ছাত সারাবার কথা বলেছিলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারকে। তা উনি বললেন—অসম্ভব। ছাতের যা অবস্থা, আলাদা করে সারানো যাবে না। গোটা ছাতটাকেই ফেলে দিতে হবে। এই দেয়ালে আবার নতুন ঢালাই চলবে না। তার মানে নতুন করে দেয়াল গাঁথা।

হিতৈষী বন্ধু শিবনাথকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল। 'গোটা বাড়ি বানাবার দিকে যাওয়ার দরকার নেই এখন। একটা-দুটো ঘর তুলে নিয়ে ঢুকে পড়ো। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।'

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল সত্যবানের মুখে। 'বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন তিন-চার মাস তো আর বাড়ির কাজে হাত দেওয়া যাবে না। ওদিকে আবার তেমন জোরে যদি বৃষ্টি নামে—। তবে মন্দের ভাল কী জানো? বাড়ির ছাতে, দেয়ালে বটগাছের শেকড়, ঝুরি এমন ভাবে ছড়িয়ে গেছে যে, বাড়ি ধসার বিপদটা তুলনায় কম।'

ধমকানোর গলায় শিবনাথ বললেন, 'ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না তো। তোমরা এক্ষুনি একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে যাও। বাড়ি মেরামতি হওয়ার পরে ফিরে এসো আবার। কালকেই আমি একটা দালালকে ফিট করছি। ভাড়া একটু বেশি হয় হবে, কটা মাসের তো ব্যাপার। যদ্দিন না তোমরা বাড়ি ছাড়ছ তদ্দিন আমি দুশ্চিন্তায় থাকব।'

কাছের মানুষের অকৃত্রিম কথা থেকে এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। সেই উত্তাপ শরীর-মন দিয়ে টেনে নিয়ে সত্যবান বললেন, 'গত কয়েক মাস ধরে এমন এক ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি—। মাঝেমধ্যে বড্ড ক্লান্ত লাগে। কতদিন যে নিশ্চিন্তে ঘুমোইনি! রাত্তিরে আবার হঠাৎ-হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তারপর আর ঘুম আসতে চায় না। হাই ওঠে, চোখ জ্বালা-জ্বালা করে, কিন্তু ঘুমোতে পারি না।'

মৃদু হাসলেন শিবনাথ। 'যা সব চলছে তোমার একটার পর একটা। তবে আমার মন বলছে—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। পুষিদিদি আর ওর প্রোমোটার ভাশুরপো তো অনেক দিন তোমাদের বাড়িমুখো হচ্ছে না—।'

—কেন হবে? জলের দরে ওদের কাছে কাঠ বিক্রি না করার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা খেল। দ্বিতীয় ধাক্কা, প্রমোটারির প্রস্তাব পুরোপুরি খারিজ করে দেওয়ায়।

—খারিজ করেছ, ভাল করেছ; কিন্তু ওই ভাশুরপোকে না ধমকালেই পারতে।

—ইচ্ছে করেই ধমকেছি। না ধমকালে ওটাকে এত তাড়াতাড়ি কাটানো যেত না। লীলা প্রথমদিকে চটে গিয়েছিল আমার ওপর। এখন দিব্যি ঠাণ্ডা। ওদের চালটা মনে হয় পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে।

মেঘলা দিন বলে আজ বোধহয় দুই বন্ধুর মধ্যে একটু বেশিক্ষণ ধরেই গল্প চলেছিল।

শিবনাথের কথা আর কাজের মধ্যে এক বিন্দু ফাঁক ছিল না। পরদিন সকালেই চটপট একটা ভাড়াবাড়ি খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারে এক দালালকে লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের সময় অনেক কিছুই দূরে সরে যায় হঠাৎ। দালালের সংখ্যা একজনের

জায়গায় তিনজন হল, কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেও কোনও বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল বেশ জাঁকিয়ে।

মুষলধারে বৃষ্টি হলেই বুকের মধ্যে একটু বুঝি কাঁপুনি ধরে যায় শিবনাথের। কিন্তু যাদের নিয়ে কাঁপুনি তাদের চোখেমুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ছাপ নেই। সেদিন দুর্ভাবনার কথা জানাতেই অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠে সত্যবান বললেন—'দু-তিন সপ্তাহের বৃষ্টিতে বটগাছের শেকড় ছাত আর সিলিংয়ের আরও অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। জব্বর কামড়, ছাত এখন ধসে পড়া সহজ নয়।'

এ কথার কোনও জবাব হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে শিবনাথ বললেন—'কাল দালালদের আমি খুব ধমকেছি। বলেছি, এত দিন হয়ে গেল অথচ তোমরা একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারলে না! তোমাদের সব শর্তই তো আমি মেনে নিয়েছি, তাহলে অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়? যাওয়ার সময় একজন বলে গেল, কাল একটা ভাল খবর দিতে পারবে। পরদিন অবশ্য ভালমন্দ কোনও খবর দিতে পারল না দালাল।' একটু বেজার মুখেই বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন শিবনাথ, কিন্তু বন্ধুকে দেখে সত্যবান উচ্ছ্বসিত। বললেন—'বোসো, কাল রাতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছি।'

এ বাড়িতে এখন চা খাওয়ার সময়। লীলাবতী রান্নাঘরে। কাপ-চামচের শব্দ মাঝে মধ্যে ভেসে আসছিল। চাপা খুশির গলায় সত্যবান বললেন—'কাল রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল হঠাৎ। জানলায় চোখ পড়তেই দেখি চারদিক আলোয় আলো। চাঁদের আলোয় ভেসে গিয়েছিল সারা আকাশ। পূর্ণিমা বোধহয় দু-চার দিন বাদেই, না?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না শিবনাথ।

সত্যবান গলার স্বর আর একটু নামিয়ে বললেন—'দেয়ালের ওই দিকে হালকা কয়েকটা ফাটল আছে। ওই ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। ওটা যে চাঁদের আলো বুঝতে পারিনি প্রথমে। ধড়াস করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। মনে হয়েছিল, গোটাসাতেক ঘড়া।'

—ঘড়া!

—ঠিক ওইরকমই দেখাচ্ছিল। পরে উঠে গিয়ে দেখি, চাঁদের আলোর টুকরো।

অসম্ভব এক মনোযোগী ছাত্রের মতো হয়ে উঠেছিল শিবনাথের মুখ। 'কোন জায়গায় দেখেছিলে?'

—ঘরের কোণায়।

—কোন কোণায়? দেখাও তো—।

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। 'এর আবার দেখাদেখির কী আছে! তাছাড়া এখন দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না। রাত্তিরে এসো, ঘরের আলো নিভিয়ে দেখাব। ফাটলটা এবড়োখেবড়ো। টুকরো-টুকরো চাঁদের আলোগুলো ঠিক ছোট-ছোট ঘড়ার মতো দেখাচ্ছিল।'

শিবনাথের চোখেমুখে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'সে তো তুমি বললেই। কোন্ জায়গাটা দেখাও না।'

বন্ধুকে ঘরের কোণায় নিয়ে গেলেন সত্যবান। ওখানে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েছিলেন শিবনাথ। তারপর খুঁটিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে কেমন যেন চমকে উঠে বললেন— 'এ কী! এখানে তো একটা চারাগাছ হয়েছে। এটা কি আগে তোমার নজরে পড়েছিল সতু?'

ঝুঁকে পড়েছিলেন সত্যবান। 'মনে পড়ছে না।' তারপর একটু হেসে বললেন— 'ভাঙাচোরা বাড়ি, চারপাশে কত গাছপালা গজাচ্ছে। ঘরের ছাত, দেয়াল বটগাছের শেকড় আর ঝুরিতে ছেয়ে গেছে। আর একটা বটগাছ গজানো তো স্বাভাবিক ব্যাপার।'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জবাব দিলেন শিবনাথ,—'না-না, এটা বটগাছ নয়। বটগাছের পাতা এরকম হয় না।'

দেড় দু-ইঞ্চি মাপের একটা চারাগাছের পাতা পরীক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না সত্যবান।

চারাগাছটা আরও একবার গভীর ভাবে পরীক্ষা করার পরে শিবনাথ বললেন—এ মনে হচ্ছে তোমার ওই উঠোনের দামি গাছগুলোর একটা—সেগুন কিংবা মেহগনি। চলো তো উঠোনটা একবার দেখে আসি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন সত্যবান, 'উঠোন তো এখন ন্যাড়া মাঠ। সব গাছপালা কাটা হয়ে গেছে।'

—তা হোক, দু-একটা চারাগাছ তো গজাতে পারে। চলো না একবার দেখে আসি।

এখন ওই উঠোনে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না সত্যবানের, কিন্তু নাছোড় বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বললেন—'ঠিক আছে, চলো।'

উঠোনে যাওয়ার পথটা সারানো হয়েছে, মজবুত একটা দরজাও বসানো হয়েছে। কিন্তু দরজাটা বোধহয় একটু বেশি মজবুত। ওদিক থেকে আসা বৃষ্টির জলের ঝাপটা খেয়ে পাল্লাদুটো বেশ এঁটে বসেছিল। বেশ কসরত করে খুলতে হল। কিন্তু খোলার পরে ওদিকের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল দুই বন্ধু। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

কয়েক মুহূর্ত বাদে ঢোক গিলে সত্যবান বললেন—'অবাক কাণ্ড! মাসদুয়েকের মধ্যে আবার একটা জঙ্গল হয়ে গিয়েছে উঠোনে।'

অবাক চোখ চারদিকে ঘুরেই যাচ্ছিল শিবনাথের। 'ফ্যান্টাসটিক গ্রোথ! প্রতিটি গাছ দু-তিন হাত লম্বা। এ তোমার ওই সব দামি গাছ।'

—কিন্তু হল কী করে। আগের সব গাছেরই তো শেকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

—প্রকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। দাবানলে বন কে বন সাবাড় হয়ে যায়। আগুনের তাপে মাটি হয়ে যায় পোড়া কয়লার মতো। কিন্তু দু-একটা বছর যেতে না যেতেই ওখানে আবার আগের মতো গাছপালা গজাতে থাকে। দু-হাতে দু-কাপ চা নিয়ে লীলাবতী ওখানে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু সামনের ওই দৃশ্য দেখে ওঁর হাত থেকে চায়ের কাপ আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে লীলাবতী বললেন, 'এ তো দেখছি জঙ্গল!'

তারপর মৃদু ক্ষোভের গলায় বললেন—'তোমরা যে এখানে এত গাছ লাগিয়েছ—

কই, সে কথা একবারও তো বলোনি আমাকে!'

গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন সত্যবান, 'আমরা লাগাইনি।'

—কে লাগিয়েছে তাহলে?

ওপরের দিকে তাকালেন সত্যবান। প্রথমে ওঁর ঠোঁট নড়ল, তারপর কথা শোনা গেল। 'যিনি লীলা করছেন তিনি—মা জগদম্বা।' জগদম্বার লীলার কথা শুনে একটু বুঝি থমকে গিয়েছিলেন লীলাবতী। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন—'আচ্ছা, এগুলো কি ওই সব গাছ?'

শ্রোতাদের কেউ পালটা প্রশ্নের মধ্যে গেলেন না। শিবনাথ একটু থেমে থেমে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

—আচ্ছা, এগুলো কাটার মতো বড় হবে কবে?

এ প্রশ্নের ভেতরের অর্থও খুব পরিষ্কার, কিন্তু তা নিয়ে কথা তুললেন না কেউই। এবারও উত্তর দিলেন শিবনাথ। 'দু-মাসে যখন এতটা বেড়েছে, মনে হয় বড় হতে খুব বেশি সময় নেবে না। বছর তিন-চারের মধ্যেই কাটার মতো হবে।'

এই ধরনের গাছের বড় হওয়ার পক্ষে তিন-চার বছর কিছুই নয়, কিন্তু বক্তা এবং দুই শ্রোতার একই সঙ্গে মনে হয়েছিল—তিন-চার বছর মানে অনেকটা সময়। আসলে প্রত্যেকেই ঘটনার দ্রুত পরিণতি দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে অন্য ধরনের দুটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল পরের সপ্তাহেই। প্রথম ঘটনাটি তুলনায় বেশ সাদামাঠা।

দক্ষিণ কলকাতায় তিন-ঘরের একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে। ভাড়া একটু বেশি, কিন্তু সেলামি নেই, আর অ্যাডভান্সও মাত্র দু মাসের। শিবনাথের জেদাজেদিতেই ফ্ল্যাট নিলেন সত্যবান। একটাই কথা শিবনাথের—আমি তো বরাবরের জন্যে তোমাদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে বলছি না। ছাত যাতে মাথার ওপর ধসে না পড়ে তার জন্যেই সরতে বলা। বর্ষা কাটুক, বাড়িঘর সারাও, তারপর ফিরে এসো। ব্যস।

সত্যবান গাঁইগুঁই করছিলেন, কিন্তু লীলাবতী উলটোদিকে সমর্থন করায় ওদিকের পাল্লা বেশ ভারী হয়ে গিয়েছিল।

বন্ধুর একগুঁয়ে স্বভাবকে একটু ভয়ই পান শিবনাথ। একগুঁয়েমি যে-কোনও মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং সময় নষ্ট করা একেবারেই ঠিক হবে না। 'সতু, নতুন ফ্ল্যাটে কাল থেকেই আমি মালপত্র শিফ্‌ট করতে শুরু করে দিই। অ্যাদ্দিনের ছড়ানো সংসার গুটিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন, কিন্তু উপায় নেই; ইমার্জেন্সি বলে কথা। মালপত্র নিয়ে যাওয়ার পরে তোমরা এসো।'

হ্যাঁ-না'র মধ্যে আটকে ছিলেন সত্যবান। ওদিকে কাজের গতি ভীষণ ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শিবনাথ। পাঁচ দিনের বদলে তিন দিনের মধ্যেই এ-বাড়ির বারো আনা মালপত্র নতুন ফ্ল্যাটে পৌঁছে গিয়েছিল। পরশুদিন রোববার, সেদিন সকালেই নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা সত্যবান আর লীলাবতীর, কিন্তু শনিবার শেষরাতেই ঘটে গিয়েছিল অকল্পনীয় দ্বিতীয় ঘটনাটি।

বৃষ্টি শুরু হয়েছিল শনিবার সকাল থেকেই। কখনও একটু জোরে, কখনও আস্তে, কিন্তু একেবারের জন্যেও ধরেনি। সন্ধের পর থেকে বৃষ্টির রকমসকম পালটে গিয়েছিল। আকাশ কুচকুচে কালো, আর বৃষ্টি পড়ছিল মুষলধারে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিলেন সত্যবান। সিলিংয়ের বেশ কয়েকটা জায়গা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছিল। দুটো দেয়াল তো একেবারেই ভিজে গেছে। মাঝেমধ্যেই বেশ খুঁটিয়ে সিলিংটাকে দেখে নিচ্ছিলেন। কোনও অঘটন ঘটবে না তো! উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থাকার জন্যে লীলাবতীরও ঘুমোতে ঘুমোতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল।

মাঝরাতের পরে আর চোখ খোলা রাখতে পারলেন না সত্যবান। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেননি। অনেক দিন বাদে আবার স্বপ্নের মধ্যে ওঁকে দেখা দিলেন মা জগদম্বা। আলোয় ভরে গিয়েছিল চারদিক। যা বলার মা তা স্পষ্ট করে বলার পরেই মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

ঠিক সেদিনের মতো ঘোর-লাগা চোখ সত্যবানের। ইতিমধ্যে কখন যেন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, কখন যেন আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে চারদিকে। প্রথমে চোখ চলে গিয়েছিল জানলায়, পরে ঘরের কোণায়। কোণের দিকে মেঝেয় চাঁদের আলোয় গোটাসাতেক টুকরো।

স্বপ্নের সব কথা স্পষ্ট মনে ছিল সত্যবানের। খাটের তলা থেকে শাবল বার করলেন। উঠোনের গাছপালা খোঁড়াখুড়ির সময় বাড়ির বাতিলকবা জিনিসপত্রের ভেতর থেকে এই শাবলটা উদ্ধার করা হয়েছিল। কী মনে করে খাটের তলাতেই ওটাকে রেখে দিয়েছিলেন।

চাঁদের আলোয় চোখ সয়ে গেছে চমৎকার। সব কিছু দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। ঘরের কোণায় পড়ে-থাকা আলোর টুকরোগুলোর ওপর শাবল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন সত্যবান।

ওই শব্দেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল লীলাবতীর। ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন বিছানায়। মেঝের ওপর শাবলের দ্বিতীয় ঘা পড়তেই প্রায় ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি! কী করছ তুমি?'

চাঁদের আলো বোধহয় আরও বেড়ে গিয়েছিল। ঘোর-লাগা চোখদুটো লীলাবতীর দিকে তুলে ধরে সত্যবান বললেন—'চুপ! আমি মায়ের কাজ করছি। আমাকে একদম বিরক্ত করবে না।' ওই চেহারা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন লীলাবতী। ওদিকে মেঝের ওপর ক্রমাগত শাবলের ঘা পড়ছিল। আদ্যিকালের মেঝে ওই আঘাত বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। সিমেন্টের টুকরো ছিটকে গিয়েছিল চারদিকে।

হাত দিয়ে নীচের মাটি ওপরে তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন গৃহকর্তা। দেখতে দেখতে পাশের সিমেন্টের ওপর ছোটখাটো একটা ঢিপি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দরদর করে ঘামছিলেন সত্যবান, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও থামছিলেন না। চোখেমুখে এখনও সেই ঘোর-লাগা ভাব। একটু বাদে শক্ত কোনও জিনিসে ধাক্কা লাগতেই ছিটকে উঠল শাবল। শব্দ উঠল—ঠ-অ-ঙ্।

ওই শব্দ কানে যেতেই গর্তের মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। যা করবার উনিই করছিলেন, লীলাবতী বোধহয় পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তবে পাথরের প্রাণ ছিল।

বিস্ফারিত চোখে লীলাবতী দেখলেন ঘামে-কাদায় মাখামাখি সত্যবান একের পর এক ঘড়া তুলে আনছেন গর্ত থেকে। একটা-দুটো নয়, সাত-সাতটা ঘড়া। ঘড়ার মধ্যে কী আছে—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বুঝি জানেন। জানার ব্যাপারে ওরা বোধহয় এতখানিই নিশ্চিত যে, কেউ আর এই মুহূর্তে ঘড়ার মুখ খুলে দেখতে গেলেন না।

সাত নম্বর ঘড়া ওপরে তোলার পরে হাঁপাতে লাগলেন সত্যবান। কিছুক্ষণ বাদে কেমন যেন টেনে টেনে বললেন, 'আর এক মিনিটও এখানে থাকা চলবে না। ঘড়াগুলো নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।'

—কোথায়?

—দক্ষিণে।

—দক্ষিণে কোথায়?

—'দক্ষিণে, মা বলেছেন—।' কথাদুটো কোনওরকমে বলার পরেই জ্ঞান হারিয়ে মাটির ঢিপির ওপরে লুটিয়ে পড়েছিলেন সত্যবান।

।। এগারো ।।

ঝকঝকে-তকতকে তিন-ঘরের নতুন ফ্ল্যাট। ঘরের দেয়ালে প্লাস্টার অব প্যারিস, তার ওপর এক পোচ সাদা রং পড়েছে। পাঁচিলের ওপাশে লাগানো তিনটে দেবদারু মাথা ঝাঁকাচ্ছে জানলার কাছে। খাটের ওপরে আধ-শোওয়া অবস্থায় সত্যবান। হাতে দুধের কাপ। এক চুমুক খেয়েই কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর খাব না।'

উদ্বিগ্ন লীলাবতী এগনো কাপ পিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'না-না, এটা তোমাকে খেতেই হবে। আস্তে আস্তে খাও। ডাক্তার বলেছে।'

খাটের সামনে চেয়ারে বসে আছেন শিবনাথ। লীলাবতীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'তোমার প্রেশার কিন্তু বেশ কিছুটা ফল্ করে গেছে সতু। একটু দুধটুধ, পুষ্টিকর খাবার-দাবার না খেলে চটপট চাঙ্গা হবে কী করে?'

—যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে গিয়েছি, আর শুয়ে থাকার দরকার নেই। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো? কী হয়েছিল আমার—বলছ না কেন কিছুতেই?

ঘরের বাকি দুজনের মধ্যে চোখে চোখে একবার কথা হয়ে যাওয়ার পরে স্নেহের গলায় শিবনাথ বললেন, 'না বলার তো কোনও কারণ নেই, তোমার একটুখানি মাথা ঘুরে গিয়েছিল—এই যা। আরে! দুধটা তো বিছানায় পড়বে, খেয়ে নাও না—।'

স্মৃতির বাইরে চলে-যাওয়া ঘটনার বৃত্তান্ত শোনার জন্যেই একচুমুকে কাপের দুধটুকু খেয়ে নিলেন সত্যবান। লীলাবতী শূন্য কাপ হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর।

খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে শিবনাথ বললেন, 'ভোররাত্তিরে আমার বাড়ির দরজায় দমাদ্দম শব্দ। দরজা খুলে দেখি তোমার গিন্নি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম ওর সঙ্গে। ভাগ্যিস বৃষ্টি ধরে গিয়েছিল তখন। চটপট একটা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছিল। তোমাকে নিয়ে সোজা মডেল নার্সিংহোমে। কপাল ভাল, ডক্টর সিনহাকে পাওয়া গিয়েছিল। উনিই ইনজেকশন দিলেন, ড্রিপ চালু হল। ঘন্টাখানেক বাদে ই সি জি। সেই রিপোর্ট দেখার পরে ডাক্তারবাবু ভরসা দিয়ে বললেন : বিপদ কেটে গেছে। তারপর আর কি, জ্ঞান ফেরার পর থেকেই তুমি বাড়ি যাব, বাড়ি যাব বলে মাথা খারাপ করে দিচ্ছ—। আমাদের ইচ্ছে ছিল আর একটা দিন তোমাকে ওখানে রাখার, কিন্তু তুমি একবার গোঁ ধরলে তোমাকে বোঝানো তো অসম্ভব ব্যাপার।'

একটু বিরক্ত হলেন সত্যবান। 'কিন্তু এটা তো বাড়ি নয়? এখানে নিয়ে এলে কেন?'

আর একবার চোখে চোখে কথা হল লীলাবতী আর শিবনাথের মধ্যে, তারপর ঢোক গিলে শিবনাথ বললেন, 'একেই বলে বোধহয় রাখে হরি, মারে কে! ওই রাত্তিরে তোমার বাড়ি না—। ভাবতে গেলে এখনও গা ছমছম করে ওঠে আমার।'

—কেন? কী হয়েছিল?

—তোমরা বাড়ি ছাড়ার অল্প কিছুক্ষণ বাদেই বাড়ির ছাতের একটা অংশ ধসে পড়ে। ভাগ্যিস বাড়িতে কেউ ছিল না তখন।

—'তাই!' রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। কিছুক্ষণ বাদে কী যেন মনে পড়তেই সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললেন—'বাড়ির জিনিসপত্রগুলো আনা হয়নি?'

—হয়েছে।

—সব?

—হ্যাঁ সব—ওই সাতটা ঘড়াও!

সত্যবান একটু বুঝি শান্ত হলেন।

—এবার তোমার ব্যাপারটা খুলে বলো তো—। কী হয়েছিল সেই রাত্তিরে? মনে পড়ছে?

বন্ধুর প্রশ্নে একটু বুঝি চমকে উঠেছিলেন সত্যবান।

দোনামনা করে শিবনাথ বললেন, 'শরীর যদি ভাল থাকে, তাহলেই বলো। না হলে পরে শোনা যাবে, অত তাড়া নেই—।'

সত্যবান থম্ মেরে বসে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হঠাৎই কেমন যেন সচকিত হয়ে বললেন,—'মা জগদম্বা তো ঠিকই বলেছিলেন—। বলেছিলেন, এই ঘড়াগুলো নিয়ে এক্ষুনি দক্ষিণে চলে যা। এখানে আর কিছুতেই থাকিস না। দক্ষিণ মানে যে দক্ষিণ কলকাতা তখন বুঝতে পারিনি। যা করা হয়েছে সবই তো দেখছি মায়ের নির্দেশে। আঙুলজড়ানো দুটো হাত ওঁর কপালের কাছাকাছি উঠে এসেছিল প্রায়।'

লীলাবতী দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ, এবার বিছানার পাশে বসে পড়লেন আস্তে আস্তে। চেয়ার আর একটু কাছে এগিয়ে এনে শিবনাথ বললেন,—'মায়ের আবার একটা স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলে তুমি, তাই না?'

স্বপ্নের জগতে থাকলে চোখমুখের চেহারা যেমন হয়, সত্যবানের চোখমুখ এখন

বুঝি সেই রকম। দৃষ্টি দেয়ালের দিকে, কিন্তু মনের চোখ বুঝি অন্য জায়গায়। অন্য রকমের গলায় সত্যবান বললেন, 'ঘুমের মধ্যে আবার মাকে দেখছিলাম। চারদিক আলোয় আলো। মা বললেন,—ঘরের কোণায়—যেখানে সাত টুকরো চাঁদের আলো পড়েছে—ওই জায়গাটা খোঁড়। খুঁড়লেই সাত ঘড়া মোহর পাবি। তবে সাবধান, ঘড়া নিয়ে ঘরে থাকিস না, সব নিয়ে দক্ষিণে চলে যা। মায়ের কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার, তবে তারপরে আমি কী করেছিলাম—তা আর খেয়াল নেই।'

মুচকি হেসে লীলাবতী বললেন, 'অজ্ঞান হয়ে গেলে আর খেয়াল থাকবে কী করে! তুমি জ্ঞান হারালে আর আমি পড়িমরি করে ছুটলাম তোমার বন্ধুর বাড়িতে।'

সত্যবানের চোখমুখ এখন স্বাভাবিক, গলার স্বরও আগের মতো। একটু উসখুশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘড়ার মুখগুলো তো খুলেই দেখা হল না!'

লীলাবতীর মুখে একগাল হাসি। 'আমি দেখেছি। মোহরই আছে, তবে কেমন যেন কম-কম!'

—কম-কম!

—হ্যাঁ, সাত ঘড়ার ওই মোহর অনায়াসে গোটা-চারেকের মধ্যেই ধরে যেত! মোহরগুলো অবিশ্যি দেখতে ভারী সুন্দর। তুমি দেখবে?

দু-দিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে উত্তর দিলেন সত্যবান, 'এখন থাক, পরে। মা জগদম্বার মূর্তিটা এনেছ?'

লম্বা করে ঘাড় নাড়লেন লীলাবতী। 'হ্যাঁ, ওই ঘড়াগুলোর সঙ্গেই নিয়ে এসেছি।'

একটু আগে রোদ ছিল আকাশে, এখন মেঘলা। জোর হাওয়া ছেড়েছে। দেবদারু গাছ-তিনটের মাথা নাড়ানো বেড়ে গিয়েছিল ওই হাওয়ায়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আলোছায়া ছিল ঘরের মধ্যে, এখন শুধুই ছায়া।

স্মৃতিচারণের গলায় শিবনাথ বললেন, 'তোমাকে বলেছিলাম না সতু, মায়ের স্বপ্নাদেশ সত্যি হবেই। অঘটন আগেও ঘটত, আজও ঘটে। তবে স্বাভাবিক কারণেই অঘটনের সংখ্যা খুব কম। আর, সব অঘটনের কথা কে-ই বা জানে! তোমাকে সেই সিমুরা রাজবাড়ির কথা বলেছিলাম না—সেই যে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন রাজা—মনে পড়ছে?'

একটুখানি মাথা ঝাঁকালেন সত্যবান।

আগের ভঙ্গিতেই আবার গল্প জুড়লেন শিবনাথ, 'স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখে থাকে, কিন্তু স্বপ্নাদেশ ক'জন পায়! পেলেও—তোমাকে বলেছিলাম না—স্বপ্নের মধ্যে দেবদেবীদের একটু প্যাঁচ-পয়জার থাকে। সব কথা দেবদেবীরা খুলে বলেন না। ওঁরা একটু বোধহয় রহস্য ভালবাসেন। এই তো আমার জানা দুটো স্বপ্নাদেশের মধ্যেই রহস্য। সিমুরার রাজা সোজা পথে দেবীমূর্তি খুঁজে পাননি। মাথা খাটাতে হয়েছিল রাজাকে। মাথা খাটাতে হয়েছে তোমাকেও।'

এই পর্যন্ত শোনার পরে মুখ তুললেন সত্যবান। মুখে কিছু বললেন না, কিন্তু ওঁর চোখের মধ্যে প্রশ্ন ছিল।

চোখের ওই প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ বললেন, 'মাথা খাটাতে হয়নি তোমাকে? বিস্তর

খাটিয়েছ। আমিও একটু-আধটু খাটিয়েছি। মা তোমাকে স্বপ্নে জানিয়েছিলেন— বাড়ির সামনের গাছতলাটা খোঁড়, সাত ঘড়া মোহর পাবি। তা, তোমার বাড়ির সামনে তো কোনও গাছই নেই। অন্য কেউ হলে এইরকম জায়গায় থেমে যেত, কিন্তু তুমি থামোনি। বাড়ির সামনের বদলে পেছনে গেলে। এও তো দেবীর ইচ্ছা। ওখানে না গেলে ওই সব দামি-দামি গাছগুলো পাওয়া যেত না—।'

একজন ভক্ত তাঁর শেষ সংশয় যে ভঙ্গিতে জানায়, ঠিক সেই ভঙ্গিতেই সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির সামনে-পেছনের কথা বাদ দাও, কিন্তু মা তো বলেছিলেন গাছতলা খুঁড়লেই—।'

প্রায় ধমকে উঠে বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে শিবনাথ বললেন, 'গাছতলাই খুঁড়েছ। তোমার ঘরের ওই কোণায় একটা চারাগাছ ছিল না? দেখলাম তো সেদিন। হোক দেড় দু-ইঞ্চি, কিন্তু বড় গাছের চারা—। ওই চারাকে গাছ ভেবে নিলে মায়ের স্বপ্নাদেশে আর কোনও ফাঁক থাকে না।'

চমকে উঠে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন সত্যবান। এই দিকটা ওঁর মাথাতেই আসেনি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'তুমি সত্যি অনেক কিছুরই জব্বর ব্যাখ্যা দিতে পারো। কিন্তু একটা কথা শিবু—আমি পড়ে থাকব দক্ষিণে আর তুমি থাকবে উত্তরে—সেটা কিন্তু হবে না। এখানে তো তিনটে ঘর, তুমি একটায় থাকো।'

কর্তার কথার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন গিন্নি। 'হ্যাঁ, তাই করুন। এখানে কাউকে চিনি না, শুনি না। ও আবার অসুস্থ, আপনি থাকলে ভরসা পাব আমরা।'

—দেখি।

বন্ধুকে প্রায় ধমকে দিয়ে সত্যবান বলে উঠলেন, 'এর আবার দেখাদেখির কী আছে? দু-চার খানা জামাকাপড় নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে চলে এসো এখানে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে যাতায়াতে ঘণ্টাদেড়েকের বেশি সময় লাগবে না। যখন যা দরকার হয় গিয়ে নিয়ে আসবে। বাড়িঘর দেখাও হবে।'

সামান্য বিব্রত হয়ে শিবনাথ বললেন, 'আমার আবার বাড়িঘর দেখাদেখির কী আছে!'

—তাহলে তো সব মিটে গেল, আজ থেকেই থেকে যাও এখানে।

সেদিন নয়, দুদিন পর থেকে নতুন এই ফ্ল্যাটের তিন নম্বর ঘরের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন শিবনাথ।

নতুন বাড়ি, নতুন ফ্ল্যাট, এলাকাটাও বেশ নিরিবিলি আর নির্ঝঞ্ঝাট। চমৎকার দিন কাটছিল নতুন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন সত্যবান। শরীর বোধহয় আগের চাইতেও তাজা। দুই বন্ধুর আর আগের মতো তেকোণা মাঠে বসে গল্প করার প্রয়োজন হয় না। মনের সুখে গল্প করার জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ঘর আছে। ঘরে চা পৌঁছে দেন লীলাবতী। মুখরোচক খাবারদাবারও বানান প্রায়ই। সেদিন চা আর ঘুগনি দিয়ে যাবার একটু বাদেই গলা নামিয়ে সত্যবান বন্ধুকে বললেন, 'লীলার চালচলন, কথাবার্তা এখন কত স্বাভাবিক হয়ে গেছে—লক্ষ করে দেখেছ তুমি?'

মুচকি হেসে সায় দিলেন শিবনাথ।

—কেন বদলেছে বলো তো?

—কেন?

—ওই পুষি বেড়াল আর ওর প্রোমোটার ভাশুরপোর উৎপাত এখানে নেই বলে।

বন্ধুর কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন শিবনাথ। সত্যবানও হাসলেন। ঝকঝকে-তকতকে এই ফ্ল্যাটে উঁচু গলার হাসির শব্দ ওঠে প্রায়ই। লীলাবতীও হাসেন। অকারণেও হাসাহাসি হয়। তিন-ঘরের ফ্ল্যাটে চমৎকার খোলামেলা আবহাওয়া। লীলাবতী প্রায়ই বলেন : 'মনে হয় কোথাও যেন বেড়াতে এসেছি!'

পছন্দসই সঙ্গীসাথির সঙ্গে সুন্দর কোনও জায়গায় বেড়াতে এলে দিনগুলো যেমন নির্ভার হয়ে ওঠে, এখানকার দিনগুলোও ঠিক সেইরকম।

কিন্তু দিনদশেক বাদে পুরনো পাড়া থেকে শিবনাথ একবার ঘুরে আসার পরে পরিবেশ একটু থমথমে হয়ে উঠেছিল।

প্রথমে শিবনাথ ভেঙে বলতে চাননি, কিন্তু বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর চাপে পড়ে আস্তে আস্তে সবই বলতে হল।

সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পরে সত্যবান বললেন, 'অদ্ভুত কথা। তোমরা কাঠের কারবারি, তোমরা যদি কাঠ না চেনো, সে দোষ কি আমার! তাছাড়া, আমি তোমাদের কাছে যাইনি—তোমরাই এসেছ আমার কাছে। একদিন নয়, দিনের পর দিন। কাঠ দেখে, শুঁকে, কাঠের গুঁড়ো জিভে লাগিয়ে তোমরাই বলেছ—ওগুলো এক নম্বরের সেগুন আর মেহগনি। এখন বলছ এলেবেলে কাঠ। কাঠ কিছুদিন গোডাউনে পড়ে থাকলে কি তার চেহারা-চরিত্র বদলে যায়? আমার কী মনে হয় জানো—।'

—কী?

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে সত্যবান বেশ একটু জোর দিয়েই বললেন, 'কোনও জোচ্চোর নির্ঘাত ওই দামি কাঠগুলো হাতিয়ে নিয়ে আজেবাজে কাঠ রেখে গেছে ওখানে।'

ঢোক গিললেন শিবনাথ। 'অসম্ভব নয়। তবে আর একটা ঘটনাও ঘটে গেছে এর মধ্যে। তোমার বাড়ি তো এখন ভাঙাচোরা। ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে কোনও অসুবিধে নেই। কাঠের ওই কারবারি নাকি দু-তিনজন এক্সপার্টকে দিয়ে তোমার উঠোনের চারাগাছ-গুলোও পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছে।'

উত্তেজিত হয়ে সত্যবান বললেন, 'আমার বাড়িতে আমার পারমিশন না নিয়ে ঢোকা! দাঁড়াও, গিয়ে মজা দেখাচ্ছি।'

অতি কষ্টে বন্ধুকে শান্ত করে শিবনাথ বললেন, 'কাঠের এক্সপার্টরা চারাগাছগুলো পরীক্ষা করে নাকি রায় দিয়েছে, ওগুলো ওই আগের জাতেরই গাছ। দেখতে অনেকটা সেগুন, মেহগনির মতো—তবে দামি গাছের কোনও গুণই নেই ওই সব গাছের মধ্যে।

সত্যবানের ঠোঁট একটু বাঁকা হয়ে উঠেছিল। 'অদ্ভুত! ওই গাছগুলোর কী নাম? নাকি কোনও নামই নেই?'

—নেই, মানে এক্সপার্টরা জানে না। বলছে—এই ধরনের গাছ ওরা আগে কখনও

দেখেনি। নতুন কোনও হাইব্রিড হতে পারে। আবার বলেছে, প্রকৃতির কোনও খেয়াল হওয়াও অসম্ভব নয়।

—প্রকৃতির খেয়াল হলে আমার দোষটা কোথায়!

—তোমাকে ওরা দোষ দিতে পারেনি তো। কাঠের কারবারি হাঁউমাউ করে এই কথাগুলো বলতে গেলে পাড়ার লোকরা তোমার হয়েই কথা বলেছে। তুমি এতক্ষণ ধরে যা-যা বললে, ওরা ঠিক তাই-তাই বলেছে। এটাই তো স্বাভাবিক, সবাই তাই বলবে।

লীলাবতী এতক্ষণ ধরে সব শুনেছেন, কিন্তু একটা কথাও বলেননি। শিবনাথের কথা শেষ হতেই উনি উঠে গেলেন ঘর থেকে। ফিরলেন একটু বাদে। চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। খসখসে গলায় সত্যবানকে বললেন, 'তুমি একবার এ ঘরে এসো তো—।'

—কেন?

—এসো না।

—কেন?

লীলাবতীর মুখের রক্ত যেন সরে গিয়েছিল। ঠোঁটের ওপর একবার জিভ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মোহরগুলোর রং আর আগের মতো নেই, কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এসে একবার দ্যাখো না—।'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন সত্যবান, 'না, দেখার কোনও দরকার নেই।'

উত্তর শোনার কয়েক মুহূর্ত বাদে শুকনো মুখে ওখান থেকে চলে গিয়েছিলেন লীলাবতী।

তিন-কামরার নতুন এই ফ্ল্যাটে দিনগুলো ঠিক আবার আগের মতোই কেটে যাচ্ছিল। হাসি, গল্প আর রকমারি খাওয়াদাওয়া। কখনওসখনও এখানেসেখানে বেড়াতেও যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ-হঠাৎ বিশেষ একটা প্রসঙ্গ উঠলে থমকে যাচ্ছিলেন তিনজনেই। কথা ঘোরাবার জন্যে ব্যস্ততাও দেখা যাচ্ছিল। কথা ঘুরে গেলে স্বস্তি বোধ করছিলেন সবাই।

দিন গড়াতে গড়াতে শেষে আরও একটা পূর্ণিমা এসে গেল। সন্ধের পরেই আকাশে মস্ত বড় হলুদ চাঁদ উঠেছিল। তারাগুলোও ঝকঝকে। বাতাসে একটু শুধু ঠাণ্ডার ভাব। সন্ধের মুখে একচোট মাথা নাড়িয়ে নেওয়ার পরে তিনটে দেবদারুই স্থির হয়ে গিয়েছিল।

এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে প্রতি সন্ধ্যাতেই গল্প জমে ওঠে তিনজনের মধ্যে। আজ সন্ধ্যাতেও কথা শুরু হয়েছিল, কিন্তু কোনও গল্প ঠিক জমতে পারেনি। বেশির ভাগ কথাই থেমে যাচ্ছিল আচমকা।

সময়ও বুঝি থমকে যাচ্ছিল হঠাৎ-হঠাৎ। রাতে শোবার পরে তাই অন্তত মনে হচ্ছিল শিবনাথের। গোটা ঘরটাই ভরে গেছে চাঁদের আলোয়। ঘুম না এলে মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তার একটা স্রোত বয়ে যায়। স্রোতে কত ঘটনা, কত কথা। আজ সে-সব ছিল না, মাথার ভেতরটাও বুঝি থেমে গিয়েছিল। রাত এখন কত কে জানে!

হঠাৎই খোলা দরজার সামনে লম্বা একটা ছায়া পড়ল। ছায়ার পেছনে সত্যবান। বন্ধুকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন শিবনাথ।

বিব্রত মানুষের গলায় সত্যবান বললেন, 'তোমার বোধহয় ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, না?'

—না-না, আমার তো ঘুমই আসেনি।

—আমারও আসছিল না। গত মাসের পূর্ণিমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে—পূর্ণিমাই ছিল বোধহয়।

এতটা পরিষ্কার না হলেও সন্ধেবেলায় এই ধরনের প্রসঙ্গ উঠেছিল কয়েকবার। সেগুলো আবার চাপা দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল। এখন সে চেষ্টা দুজনের কারও মধ্যেই নেই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে সত্যবান বললেন, 'একটু আগে চাঁদের আলোয় ওগুলো আর একবার দেখলাম। এখন তো সেই আবার আগের মতো গাঢ় হলুদই দেখাচ্ছে।'

শিবনাথের বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠেছিল। 'কিসের কথা বলছ?'

বিছানার আর একটু কাছে এগিয়ে এসেছিলেন সত্যবান। নিচু গলায় বললেন, 'ঘড়ার ওই মোহরগুলোর কথা বলছি। মেহগনি, সেগুন রাতারাতি নকল হয়ে যাওয়ার খবর শুনে সেদিন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল লীলা। তড়িঘড়ি করে মোহরগুলো পরীক্ষা করে বলেছিল, মোহরের সেই গাঢ় হলুদ রং আর নেই—কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর কথাকে তখন আমি পাত্তা দিইনি। তবে, পরদিন দুপুরে মোহরগুলো দেখে সত্যি কথা বলতে কি আমারও বেশ খটকা লেগেছিল। কিন্তু লীলাকে তা বুঝতে দিইনি। এখন ও ঘুমোচ্ছে। আমার ঘুম আসছিল না। চাঁদের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম—এখন দেখি তো একবার। দেখলাম। ঠিক সেই সেদিনের মতো গাঢ় হলুদ। আচ্ছা, এটা কি চাঁদের আলোর জন্যে?'

সত্যবানের কথা, গলার স্বর, এমনকি চেহারার আদল পর্যন্ত কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে প্রশ্নের জবাব দিলেন শিবনাথ। 'এক কাজ করো। কাল একজন জহুরির কাছে যাও। মোহর পরীক্ষা করাও, পারলে দু-একটা বেচে দাও। পরীক্ষা হবে, আবার দামটাও জানা যাবে।'

দু-হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরেছিলেন সত্যবান। মাথা চাপলে গলার স্বর বিকৃত হওয়ার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ওঁর গলার স্বর কিছুটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল হঠাৎই। একটু থেমে থেমে বললেন, 'মা আমাকে সাত ঘড়া মোহর দিয়েছে, কিন্তু বিক্রি করার কথা তো বলেনি। প্রাণ গেলেও এ মোহর আমি বিক্রি করব না।'

কাঁপতে কাঁপতে বন্ধুর বিছানার ওপর বসে পড়েছিলেন সত্যবান।

পরদিন সকালেই সাত ঘড়া মোহর সিলিংয়ের সঙ্গে লাগানো লফ্‌টে ঢুকে গিয়েছিল। ঘড়াগুলো ঢোকার পরে ঢুকল হাবিজাবি জিনিসপত্র। তারপর তালা পড়ল লফ্‌টের দরজায়। পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা কাঠের সিঁড়ি ফেরত দিয়ে দিলেন শিবনাথ।

বিষণ্ণ মুখে একটু হাসার চেষ্টা করে সত্যবান বললেন, 'আধুনিক ফ্ল্যাটের উঁচু লফ্‌টের পেছনদিক আর মাটির তলার মধ্যে বোধহয় খুব একটা তফাত নেই। একবার ঢুকলে আর সহজে বার হয় না। ভালই হল, যেখানকার জিনিস সেখানেই গেল শেষ পর্যন্ত।'

শিবনাথ খুবই উদ্যোগী পুরুষ, ওঁরই চেষ্টায় সত্যবানের ভাঙা বাড়ির মেরামতি শুরু হয়ে গিয়েছিল চটপট। প্ল্যানের অদলবদলও হয়েছে বেশ কিছুটা। মস্ত উঠোনে ঘর উঠেছে। প্রকৃতির খেয়াল চাপলেও ওই বাড়িতে এখন আর জঙ্গল গজিয়ে তোলার উপায় নেই। উপস্থিত একতলাই হচ্ছে। বেশ কয়েকটা ঘর।

ঘরগুলো নিয়ে মেতে আছেন লীলাবতী। প্রায়ই ছোটখাটো রদবদল করাচ্ছেন। সেদিন এসে সত্যবানকে বললেন, 'তুমি আলাদা কিছু করাতে চাও তো বলো, সব তৈরি-টইরি হয়ে গেলে কিন্তু আর কিছু করার উপায় থাকবে না।'

সত্যবান হেসে জবাব দিলেন, 'আমার তো একটাই ফরমাশ, সে তো বহু আগেই তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। সিলিংয়ের সঙ্গে লাগানো সুড়ঙ্গের মতো একটা লফ্‌ট চাই।'

এক বর্ষার পরে আর এক বর্ষা এসে গেছে। সামনের শীতেয় ফেরা যাবে বাড়িতে। বড় কাজ সব শেষ। এখন যেটুকু যা হচ্ছে সবই ছোটখাটো। তাড়া নেই। লীলাবতী সেদিন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলেন—মা জগদম্বা শিগ্‌গিরই কর্তাকে আর একটা স্বপ্নাদেশ দিয়ে বললেন : সাত ঘড়া মোহর তোমাকে লফ্‌টে ঢুকিয়ে রাখার জন্যে দিইনি। ওগুলো ভাঙিয়ে ইচ্ছেমতো খরচাপত্তর করো। তীর্থধর্ম করো, দানধ্যান করো। আর, সহধর্মিনীকে ভারী-ভারী কিছু গয়নাপত্তর গড়িয়ে দাও।

সত্যবান অবশ্য আর এক দফা স্বপ্নাদেশ পাওয়ার কথা ভাবেননি। তবে মাঝেমধ্যেই মনে হয়, শিগ্‌গিরই রোমাঞ্চকর কিছু-একটা ঘটবে। এই মনে হওয়ার কথাটা সেদিন বন্ধুকে বলতেই শিবনাথ ওঁর হাত চেপে ধরে বললেন : 'কী আশ্চর্য! আমারও তো ঠিক তাই মনে হচ্ছে।'

অভাবনীয়

মধ্য প্রদেশের তিতোরিয়া নামেই আধা-শহর, আসলে এটি একটি গণ্ডগ্রাম। গাড়ি থেকে মাটিতে পা দেবার আগেই অনুপ বুঝতে পারল ওদের কোম্পানির ব্যবসা এখানে চলবে না। হেডঅফিস ভুল খবর পেয়ে ওকে জায়গা দেখতে পাঠিয়েছে। এখানে দুদিন থাকার কথা ছিল, কিন্তু দু-মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল ওর। এমনকী হেডঅফিসে কী রিপোর্ট দেবে, সেই বয়ানটাও ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

গাড়ি থেকে নেমে আড়ামোড়া ভেঙে সিগারেট ধরাল অনুপ। দূরত্বের হিসেবে এ-জায়গাটা হয়তো তত দূরে নয়, কিন্তু এখানে আসতে ধকল গেছে বেশ। ট্রেন জার্নি, তারপর ভাড়া-গাড়িতে বিদ্‌ঘুটে রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে এতটা আসা!

সিগারেটে গোটাকয়েক লম্বা টান মেরে অনুপ গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, 'জারা রোকিয়ে।' গাড়িটা এক্ষুনি-এক্ষুনি ছেড়ে দিতে ও ভরসা পাচ্ছিল না। কোনো কারণে ওদের এজেন্ট মতিরাম যদি এসে পৌঁছতে না পারে, এই গাড়িতেই ও আবার স্টেশনে ফিরে যাবে।

মতিরাম একটা কাগজে ম্যাপ এঁকে এই তিন রাস্তার মোড়ের বর্ণনা দিয়েছিল। কাগজটা পকেট থেকে বার করে অনুপ বর্ণনাটা মিলিয়ে নিল আবার। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, এমনকী খুঁটির মাথায় দোমড়ানো ওই ফলকটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও ফলকটার কাছে। রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা অক্ষরগুলো উদ্ধার করতে বেশ কষ্ট হয়। তবে সূত্র ছিল বলেই ও ধরতে পারল, এক কালে এখানে গোটা-গোটা হরফে 'তিতোরিয়া' লেখা ছিল।

তিতোরিয়ার মানে অনুপ জানে না, কিন্তু ঝাপসা ওই হরফগুলোর মধ্যে কী এক রহস্য যেন লুকিয়ে আছে। চারিদিকের ঠাসা গাছগাছালির মধ্যে বিচিত্র এক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল টিনের ফলকটা।

একটু পরে সাইকেল চেপে হাজির হল এজেন্ট মতিরাম। এসেই দেরি করে আসার জন্য নানা ভাবে ক্ষমা চাইল। অনুপ ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরে দেরি কোথায় হল, আমি তো এইমাত্র এসেছি।'

ভাড়া মিটিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল অনুপ।

মতিরাম হাতজোড় করে বলল, 'চলেন সাব্ আগে আমার কোঠিতে, একটু নাস্তাপানি করে নেবেন, তারপর--।'

অনুপ ওকে থামিয়ে দিল। 'আমার নাস্তাপানি হয়ে গেছে, চলো আগে সাইটটা দেখে আসি।' মনে মনে বলল, সাইট দেখে ঘোড়ার ডিম হবে! এখানে এসে ব্যবসা করতে গেলে লাটে উঠে যাবে কোম্পানি। আমার রিপোর্ট তৈরি, মোদ্দা কথা--নট ফিজিব্‌ল্।

শীতের সকালের রোদ্দুরে গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে কিন্তু বেশ ভালই লাগছিল অনুপের। কাছেই সাইট, খুব খুঁটিয়ে দেখার ভান করে মার্কামারা কয়েকটা প্রশ্ন করল। খুব আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল মতিরাম। উত্তর দেবার পরেও অনেক কথা বলে গেল গড়গড় করে। এবার একটু এজেন্টের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে সাহেবকে। না গেলেই নয়, এটা প্রায় রেওয়াজের মধ্যে পড়ে গেছে। ওর বাড়ির দিকে যাবার পথে গাছপালা আরও সবুজ আরও ঠাসা হয়ে উঠেছিল।

অনুপ কাজের সূত্রে কোথাও গেলে কাছাকাছি দর্শনীয় জায়গাগুলোও দেখে নেয়। সেই অভ্যাস থেকেও বলল, 'মতিরাম, তিতোরিয়া জায়গাটা তো বেশ। তা, তোমাদের এখানে দেখার কিছু নেই?'

মতিরাম আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'এখানে আর কী দেখবেন সাব্। জংলি জায়গা, চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।'

অনুপ হাসতে হাসতে বলল, 'জঙ্গলই দেখব।'

মতিরাম অনুপের কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না প্রথমে, কিন্তু বিশ্বাস করার পরেই ব্যবস্থা করে দিল দ্রুত।

খাবারদাবারের জোগাড় করতে হবে বলে মতিরাম আর অনুপের সঙ্গে জঙ্গলে গেল না। তবে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলল, 'বেশি ভেতরে যাবেন না। ভেতরের জঙ্গলে শের আছে, ভালু আছে।'

গাইড একজন সবল তিতোরিয়াবাসী। তার বিশাল চেহারা আর হাতের চকচকে টাঙ্গি দেখে অনুপের বাঘ-ভাল্লুকের ভয় কমল কিছুটা। সঙ্গীটি বেশ হাসিখুশি, কিন্তু একসঙ্গে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখা গেল কেউ কারও ভাষা একবর্ণও বোঝে না। তার ফলে যে যার মতো কথা বলে যাচ্ছিল, মাঝেমধ্যে একসঙ্গেও কথা বলছিল অনর্গল।

জঙ্গলে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। কিছুক্ষণ জঙ্গল দেখার পরে ক্লান্ত হয়ে গেল অনুপ। ফেরার মুখে দুটো বেজি চোখে পড়ল। বেজিদুটো ওদের দেখে নিয়ে তিন লাফে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। বেজি দেখেই সাপের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অনুপের। চারদিক ভালভাবে দেখেশুনে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে থমকে গিয়েছিল অনুপ। এ তো সেই গল্পে শোনা মসলিন! মসলিন ছড়িয়ে আছে সামনের লিচু গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডাল পর্যন্ত। অলৌকিক কাণ্ড! কী সূক্ষ্ম কাপড়! সোনালি সুতো অসম্ভব সরু অথচ বেশ শক্ত। একটু পরেই অনুপ দেখতে পেল মসলিনের এক ধারে বসে আছে প্রকাণ্ড এক মাকড়শা।

সামান্য মাকড়শার একটা জাল দেখে অনুপকে মুগ্ধ হতে দেখে ওর সঙ্গীটি বোধহয় বেশ মজা পাচ্ছিল। জালটা যে সত্যিই তারিফ করার মতো অনুপ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল নানা ভাবে। কিন্তু লোকটা সম্পূর্ণ উলটো বুঝল।

হাতের টাঙ্গি মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটা বুনো পাতা দিয়ে বিরাট এক ঠোঙা বানাল। তারপর একটা শুকনো ডাল দিয়ে খোঁচা মেরে মাকড়শাটাকে নীচে ফেলে

ঠোঙার মধ্যে পুরে ফেলল চটপট। লোকটার কী মতলব অনুপ বুঝতে পারছিল না। কিন্তু একটু পরে লোকটা চোখেমুখে বাহাদুরির ভাব ফুটিয়ে ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে দিতেই অনুপ ছিটকে সরে গিয়ে বলল, 'যাব্ বাবা! এই বুঝলি শেষে।'

দূরে দাঁড়িয়ে ও হাতমুখ ঘুরিয়ে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, আমার মাকড়শা চাই না, এক্ষুনি ওটা ফেলে দাও।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না লোকটা। হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল অনুপ। লোকটা ঠোঙা হাতে নিয়ে ওর পিছু-পিছু মতিরামের ডেরায় এসে হাজির হল।

এইরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় মতিরাম কী করে এত খাবারদাবার আয়োজন করেছে, ভাবাই যায় না। খেতে বসে অবাক হয়ে অনুপ বলল, 'আলাদিনের প্রদীপট্রদিপ পেয়েছ না কি মতিরাম?'

মতিরাম হাতজোড় করে বলল, 'না-না, এ তো সামান্য আয়োজন, আপনি আরাম করে ভোজন করুন।'

অনুপ মতিরামকেও বসে পড়ার জন্যে জোর করল, কিন্তু মতিরাম পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি মেহমান, আপনি আগে ভোজন না করলে কি আমরা খেতে বসতে পারি।'

অনুপের বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল, তার ওপর মুখের সামনে এত সুখাদ্য, হাত গুটিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। না-না করে খেলেও একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ওর। এত বড় একটা ভোজনের পরে এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

উঠোনের চারপাইতে বসে নিমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল অনুপ। মতিরাম সেই জোড়াহাতটা আর খোলেনি। হাতজোড় করেই ও সাইটের গুণাগুণ বর্ণনা করে যাচ্ছিল একনাগাড়ে।

অনুপ হুঁ-হ্যাঁ করতে করতে শুনছিল। সব কথা কানে নিচ্ছিন না বলে বেজায়গায় সায় ফেলছিল মাঝেমধ্যে। কিন্তু ভুল টের পেলেও গুরুভোজনের কারণে নিজেকে আর সংশোধন করছিল না।

মতিরামের সাইটে কোম্পানি যদি ব্যবসা ফাঁদে, মতিরামের ভাগ্যের চাকা ওপর দিকে উঠবে ঠিকই, কিন্তু কোম্পানি ডুববেই। অন্যান্য ঝামেলা তো আছেই, শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের খরচেই ঘায়েল হয়ে যাবে কোম্পানি।

মাঝেমধ্যে ওর বক্তৃতার সমর্থন চাইছিল মতিরাম। তর্কের মধ্যে না ঢুকে একপাশে মাথা কাত করছিল অনুপ। তারপর রোদ একটু পড়ে এলে বলল, 'এবার ফিরতে হবে মতিরাম, আটটার ট্রেন ধরব।'

মতিরাম অনেকক্ষণ পরে জোড়হাত খুলে দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কোই ফিক্‌র নেহি, আপনি আরাম করুন।'

গাড়ির ব্যবস্থা করাই ছিল আগে থেকে। মতিরাম আর সেই জঙ্গলের গাইড ঠিক সময়ে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল অনুপকে। জানালার ধারে সিট। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মতিরাম শেষবারের মতো অনুপকে বোঝাল, ওই সাইটে কারবার করলে কী বিরাট

ফায়দা উঠবে কোম্পানির। ট্রেন ছাড়লে মতিরাম 'রাম-রাম' বলে আর একবার হাতজোড় করল। উত্তরে হাত নেড়েছিল অনুপ।

দুলকি চালে কয়েক মুহূর্ত যাবার পরে মেল ট্রেন ছুটতে শুরু করল ঠিক মেল-ট্রেনের মতো। একটা সিগারেট ধরাল অনুপ, আর তার পরেই ওর চোখ পড়ল স্যুটকেসের ওপরে। স্যুটকেসের হ্যান্ডেলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই ঠোঙাটা। পরিষ্কার বুঝতে পারল, এটা ওই জংলি লোকটার কীর্তি। লোকটা নির্ঘাত ভেবেছে, মাকড়শাটা খুব মনে ধরে গেছে সাহেবের। তাই এই উপহার।

ঠোঙাটা জানালা গলিয়ে ফেলে দেবে বলে দড়িটা খুলতে গেল অনুপ, কিন্তু পারল না। মহামূল্যবান বস্তু। সুতরাং শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। দড়ির বাঁধন খুলতে না পেরে উজবুক লোকটার ওপর বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল অনুপের।

কামরায় লোকজন বিশেষ নেই। চলন্ত ট্রেনের দুদিকে অচেনা প্রকৃতি। লাল-কালোয় মেশানো মাটি আর দূরে পাহাড় ও জঙ্গল। জঙ্গল দেখেই অনুপের তিতোরিয়ার জঙ্গলের কথা মনে পড়ে গেল। তারপরই মনে পড়ল প্রকাণ্ড ওই মাকড়শাটার কথা। অত বড় মাকড়শা ও আগে কখনো দেখেনি। সেই মাকড়শাটা এখন আবার ওর সামনে, ওই ঠোঙার মধ্যে।

একটা কৌতূহল অনুপের মধ্যে বেড়ে উঠতেই ও শালপাতার ঠোঙাটা ফাঁক করল আস্তে আস্তে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র এক অনুভূতি হল ওর। মাকড়শাটা জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওই দৃষ্টিতে অনুপের সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন জানে না মনে হল, মাকড়শাটা কী যেন বলতে চায় ওকে। এরকম মনে হওয়া অদ্ভুত, কিন্তু অদ্ভুত ধারণাটা ওর মাথায় শিকড় ছড়িয়ে ফেলেছিল আস্তে আস্তে। ঠোঙার মুখটা বন্ধ করে সিটে এসে বসল ও।

ট্রেনে বিশেষ ঘুম হয় না অনুপের। হঠাৎ-হঠাৎ ওর মাথার মধ্যে উদ্ভট সব চিন্তাভাবনা খেলে যাচ্ছিল। পুরনো খবরের কাগজ আর নতুন বই পড়ে সময় কাটাল কোনোরকমে। দু-প্যাকেট সিগারেটের জায়গায় তিন প্যাকেট উড়ে গেল দেখতে দেখতে।

বাড়ি ফিরেই অনুপের প্রথম কাজ হল মাকড়শার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে ফেলা। কোথায় রাখা যায় এটাকে? পাখি হলে খাঁচা, খরগোশ হলে প্যাকিং-বক্স, কুকুর হলে যত্রতত্র, কিন্তু মাকড়শা! কোথায় রাখা যায়? এক-একবার ভাবছিল, ও কি পাগলামো করছে। তবে নিজের পাগলামো ধরতে পারলেও তার হাত থেকে ওর বোধহয় এখন আর উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে একটা হরলিকসের খালি শিশির মধ্যে রেখে দিল অতিথিকে।

কিন্তু কী খাবে অতিথি? এবারও বেশ মাথা খাটাতে হল অনুপকে। তারপর ও বিস্কুটের গুঁড়ো, পাউরুটির টুকরো, চিনি আর কিছুটা দুধ রেখে দিল শিশিতে। এত আয়োজন অথচ কিছুই খেল না মাকড়শা। দিন-তিনেক বাদে অনুপ দেখল, মাকড়শা বেশ নির্জীব হয়ে পড়েছে। আগের মতো আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছেও না।

এ-ভাবে আরও দু-চারদিন থাকলে মরে যেতে পারে মাকড়শাটা। কী দরকার শুধু

শুধু প্রাণিহত্যা করে। পাগলামো ঢের হয়েছে। আবার এটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক। কাছাকাছি জঙ্গল থাকলে ও জঙ্গলেই ছেড়ে দিয়ে আসত মাকড়শাটাকে, কিন্তু জঙ্গল কোথায় এখানে? আচ্ছা, জঙ্গলের বদলে ঘরের দেওয়াল হলে কেমন হয়? ছোটখাটো মাকড়শা তো দিব্যি দেয়াল চষে বেড়ায়।

একটু ইতস্তত করে দেয়ালের কাছে গিয়ে শিশির মুখটা খুলে দিল অনুপ। মাকড়শাটা একটু নড়াচড়া করল, ঠিক সেই আগের মতো জুলজুল করে একবার তাকাল অনুপের দিকে, তারপর একলাফে উঠে গেল দেয়ালে। দেওয়াল থেকে দ্রুত গতিতে সিলিংয়ে। ওখান থেকে অনুপের দিকে চাইল একবার। বেশ খুশি-খুশি চাউনি। খুশি মনে অফিসে গেল অনুপ।

কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে মাকড়শাটাকে কোথাও দেখতে পেল না। না দেয়ালে, না সিলিংয়ে, না আলমারির পেছনে, না খাটের পাশে, না সোফার গদিতে। দেখতে না পেয়ে ওর মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই মন খারাপ নিয়েই কেটে গেল দু'দিন।

।। দুই।।

তৃতীয় রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অনুপের। এখন বোধহয় মাঝরাত, চারদিক থমথম করছে। ছোট একটা নীল আলো জ্বালিয়ে ঘুমনো অভ্যাস ওর। সেই আলোয় বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখতে পেল অনুপ। মশারির মধ্যে আর একটা মশারি। জানলা দিয়ে বিছানার ওপরে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। চাঁদের আলো আর ঘরের নীল আলোর অদ্ভুত একটা মিশেল তৈরি হয়েছে। সেই আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে অনুপ আবার দেখল, মশারির মধ্যে সোনালি সুতোর তৈরি আর একটা ফিনফিনে মশারি! মশারিটা কেমন যেন গোল হয়ে ওর গায়ের ওপর নেমে এসেছে। সরাতে গিয়ে দেখল ছোট মশারিটার ধারগুলো ওর গায়ের সঙ্গে জোড়া। এবার ও একটু ভয় পেয়ে গেল। তারপরেই দেখল প্রকাণ্ড সেই মাকড়শাটা সোনালি মশারিতে বারকয় চক্কর মেরে ওর মাথা থেকে হাত দেড়েক ওপরে সুতোর জালের ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

অ্যাদ্দিন পরে মাকড়শাটাকে ফিরে পেয়ে অনুপের খুব ভাল লাগছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও করছিল একটুআধটু। মাকড়শাটা কি হাসছে!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু সত্যিই ও হাসছে। হাসার জন্য বোধহয় ওর বড়-বড় চোখদুটোর চারদিকের চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল। হাসি দেখেও অনুপ আশ্বস্ত হতে পারছিল না। মৃদু গলায় বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

মাকড়শা দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, একটা বর্ণও বোঝা গেল না। থতমত খেয়ে অনুপ বলল, 'আপনি বাংলা জানেন না? ইংরেজি? হিন্দি?'

উত্তরে মাকড়শা হাসল। তারপর সোনালি মশারিতে দ্রুত কয়েক চক্কর মেরে এসে বলল, 'জানি, সব জানি। তবে তোমাকে আমার ভাষা শিখতে হবে।'

'শিখব, নিশ্চয়ই শিখব। বিদেশি ভাষা শিখতে আমার খুব ভাল লাগে।' কেমন যেন মন জুগিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল অনুপ।

শুনে মাকড়শা আবার সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ।

কয়েক মুহূর্ত পরে মিটিমিটি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। মাকড়শা এবার পরিষ্কার বাংলায় কথা বলল। এতক্ষণ ধরে যা যা ঘটেছে। সব বলল এক এক করে। এক্সপেরিমেন্ট সফল। তার মানে ভবিষ্যতে অকল্পনীয় সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি শুধু দু'পাঁচজনের নয়, সারা দেশের সমৃদ্ধি।

সব শুনে প্রচণ্ড উত্তেজনায় অনুপের সারা শরীরের রক্ত উঠে এল মাথায়। একটু খুতখুঁতি অবশ্য ও কাটাতে পারছিল না কিছুতেই। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এতে মানুষের শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

ওর আশঙ্কা দেখে হেসে উঠে মাকড়শা বলল, 'মোটেই নয়, বরং ভাল হবে। শরীরে একবিন্দু বাড়তি চর্বি জমবে না কখনোই। তাতে শরীর ভাল থাকবে, কর্মক্ষমতা বাড়বে। এই দেখ না তোমার চর্বি থেকে কত সুতো কেটেছি, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে। অসুস্থ বোধ করছ?'

অনুপ হাত দিয়ে নিজের পেট আর কোমর দেখল। ভুল করে দুটো সিঁড়ি টপকালে যেমন হয়—ঠিক সেই ধরনের অভিজ্ঞতা হল ওর। অভ্যাসমতো হাত কিছু দূরে গিয়ে নীচে পড়ল ধপ্ করে। ওর শরীরের কোথাও একটুও বাড়তি চর্বি নেই। গালে হাত দিয়ে আর একবার অবাক হল অনুপ। আরে। কোথায় গেল ওর সেই দু-থাক থুতনি।

শরীরটা অসম্ভব হালকা। সেই ছেলেবেলার মতো কিছুক্ষণ হাত-পা ছুড়ে মনের আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে অনুপ বলল, 'আমি রাজি।'

মাকড়শা বলল, 'তাহলে আমার প্ল্যানটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। বড় আলো জ্বালো, কাগজ কলম দাও।'

অনুপ লাফিয়ে উঠে অলো জ্বেলে কাগজ-কলম এনে দিল মাকড়শাকে। মাকড়শা একটু দূরে বসে বিস্তর অঙ্ক কষে কাগজটা এগিয়ে দিল অনুপের দিকে।

মাকড়শার হাতের লেখাটা অদ্ভুত ধরনের, তারপর পাতাজোড়া কঠিন-কঠিন সব অঙ্ক। অনুপ গম্ভীর মুখে পাতায় চোখ বোলাতে লাগল, কিন্তু কিছুই ওর মাথায় ঢুকল না।

মাকড়শা বলল, 'এই ব্যবসায় শুধু গ্রস ন্যাশনাল প্রডাক্টই নয়, এন এন পি-র হারও হবে অকল্পনীয়। ন্যাশনাল ইনকাম তো বটেই, পার ক্যাপিটা ইনকামও বেড়ে যাবে ভীষণ ভাবে। মানি ইনকাম আর রিয়েল ইনকামে আমাদের ধারেকাছে অন্য কোনও দেশ আসতে পারবে না।'

মাকড়শার কথায় অনুপ শুধু এটুকু বুঝল, এ ব্যবসায় কল্পনাতীত লাভ। হিসেবের কাগজের দিকে চোখ রেখে বলল, 'তাহলে এখন কী করা দরকার?'

মাকড়শা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, 'প্রথম কিছু মোটা লোক জোগাড় করে বাড়িতে নিয়ে এসো।'

'মোটা লোক কেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাকড়শা বলল, 'নিয়েই এসো না, তারপর জানতে পারবে।'

অনুপ বুঝতে পারল, মাকড়শা অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করে না। আর কোনও প্রশ্ন না করে চুপ করে গেল ও। বাইরে মাঝরাত। ঘরের মধ্যে ঝকঝকে নিয়নের আলো। সাদা পাশবালিশের ওপর মাকড়শা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। ওর মেটে রঙের আটটা রোমশ পা নড়ছিল আস্তে আস্তে। গায়ে খয়েরি আর ব্রাউন রঙের ছিটে।

অনুপ হঠাৎ বলে বসল, 'আপনার বোধহয় তিতোরিয়ার ওই জঙ্গলের জন্যে মন কেমন করছে, না?'

মাকড়শা হেসে বলল, 'আমাদের তো তোমাদের মতো মার্কামারা একটা-দুটো বাড়ি-ঘর থাকে না। আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াই ক্রমাগত। তিতোরিয়ায় আসার কিছুদিন আগেই আমি অন্য একটা জঙ্গলে ছিলাম। সুতরাং আস্তানা পালটাবার জন্যে আমাদের মন কেমন করে না।'

এত গোছানো উত্তর পেয়ে অনুপ প্রথম দমে গেল, তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'কিন্তু গাছের ডালে থাকা আর বাড়ির দেয়ালে থাকার মধ্যে তফাত আছে তো—আপনার এই ঘরের মধ্যে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না?'

'ঘরের মধ্যে সব সময় থাকি না তো।'

'তাহলে কোথায় থাকেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

মাকড়শা ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, 'আমরা ছোটখাটো প্রাণী। না বলে দিলে আমাদের আস্তানা তোমাদের চোখে পড়ার কথা নয়।'

'না-না, এ কী বলছেন।' অনুপ বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল।

মাকড়শা একটু থেমে বলল, 'তোমাদের বাড়ির লাগোয়া জামগাছটা নিশ্চয়ই দেখেছ, ওই গাছের ডালেই আমি জাল পেতেছি।'

'জাল! কেন?'

'খেতে হবে না? আমরা তো আর বিস্কুট, চিনি আর দুধ খাই না।'

অনুপের মনে পড়ে গেল, এই সব খাবারই ও মাকড়শাকে খেতে দিয়েছিল প্রথম দিন, কিন্তু মাকড়শা কিছুই ছুঁয়ে দেখেনি। মনে পড়তেই ও বলল, 'ও, আপনারা তো পোকামাকড় খান।' কিন্তু কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তেই খারাপ লাগল অনুপের। পোকামাকড় খাওয়ার কথাটা এ ভাবে না বললেই বোধহয় ভাল হত!

মাকড়শা অসন্তুষ্ট হল কি না বোঝা গেল না, তবে একটু ঘোরানো উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যার যা খাবার।'

বাচ্চাদের মতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল অনুপ। 'আপনারা কি দূরে বসে লক্ষ্য রাখেন জালে কখন শিকার পড়বে?'

মাকড়শা এবার হেসে ওঠে। 'আমাদের দেখার দরকার হয় না, জালে কাঁপুনি উঠলেই বুঝতে পারি। তাছাড়া খাবার জোগাড় করার ব্যাপারে আমার খাটনি কমে গেছে, জামগাছে আমি একজন বান্ধবী পেয়ে গেছি।'

শুনেই আঁতকে উঠে অনুপ বলল, 'না-না, বান্ধবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। আপনি জামগাছ ছেড়ে দিন।'

গোল-গোল চোখদুটো উঁচুর দিকে ঠেলে দিয়ে মাকড়শা জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'কেন? আপনি এত জানেন আর এটা জানেন না?'

'কী?'

'অনুপ আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'সত্যি জানেন না। সবাই জানে যে...।'

'কী জানে?'

'মেয়ে-মাকড়শা মিলনের পরে পুরুষ-মাকড়শাকে মেরে ফেলে।'

শুনে মাকড়শা রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি, আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, তুমি এই কথাটাই বলবে। আশ্চর্য! এই ভুল ধারণাটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কিছুদিন আগে একজন ব্রিটিশ মাকড়শা-বিশেষজ্ঞ এই ধারণাটা ভুল প্রমাণ করেছেন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে উলটো কথা জানা গেছে। আসলে আবহাওয়া খুব খারাপ হলে কিছু-কিছু পুরুষ মাকড়শা জাল বোনা ছেড়ে দিয়ে সঙ্গিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এই সব সঙ্গিনীর সঙ্গে যখন তাদের প্রেম চলে তখন তারা বেকার। ফলে প্রায়ই তারা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত আর অবসন্ন থাকে। কোনও কোনও পুরুষ-মাকড়শা সেই সময় ধকল সামলাতে না পেরে মারা যায়। তাই দেখে মানুষরা ওই উদ্ভট সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।'

অনুপ লজ্জা পেয়ে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি নেহাতই একটা শোনা কথা উগ্‌রে দিয়েছি। আসলে আপনার ভালমন্দের ব্যাপারে আমি এত ভাবি যে...।'

মাকড়শার রাগ এখনও পড়েনি। একটু থেমে খসখসে গলায় বলল, 'তোমার ওই কথাটা কিন্তু তোমাদের মানুষের সমাজ সম্পর্কে দিব্যি খেটে যায়। কোনও মেয়ে কোনও ছেলেকে দেহ দিলে সুদে-আসলে শোধ তুলে নেয়। ওই মেয়েটার হাতে ওই ছেলেটার শারীরিক কিংবা মানসিক মৃত্যু অবধারিত।'

প্রসঙ্গটা হঠাৎই এমন একটা বেয়াড়া বাঁক নিয়ে বসল যে, অনুপ আর কথা খুঁজে পেল না।

মাকড়শা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পরে মশারির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর ভাবে বলল, 'আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে।'

বাধ্য ছেলের মতো মাকড়শার কথা শুনল অনুপ।

।। তিন।।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অনুপের মনে হল, রাত্তিরে উদ্ভট একটা স্বপ্ন দেখেছে ও। কিন্তু স্বপ্ন কি এত সত্যির মতো হতে পারে? সব কিছু কী স্পষ্ট মনে পড়ছে, প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত। আরও কিছুক্ষণ গড়াবার পরে বিছানা ছাড়তে গিয়ে চমকে উঠল অনুপ। এ্যাঁ! শরীরটা এত হালকা পালকের মতো হয়ে গেল কী করে! তাহলে রাত্তিরের ওই ঘটনাগুলো তো স্বপ্ন নয়। ওর শরীরের চর্বি থেকে বানানো মসলিনের মতো কাপড়ের টুকরোটা পড়ে ছিল বিছনায়। সেটা হাতে নিতেই রোমাঞ্চ হল অনুপের।

একলাফে খাট থেকে নেমে পড়ল অনুপ। দেয়াল, সিলিং আর আলমারির ফাঁকে

মাকড়শাকে খুঁজল, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় গেল? একদৌড়ে ছাতে উঠল ও।

কার্নিশের ধারে গিয়ে ঝুঁকতেই দেখতে পেল, জামগাছের ডালে অসামান্য সোনালি সুতোর জাল। শিশিরের বিন্দুগুলো মুক্তোর মতো ঝলমল করছে ওই জালে। কিন্তু মাকড়শা কোথায় গেল? শিকারের আশায় কি কোনও পাতার আড়ালে বসে আছে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও মাকড়শাকে দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে এল অনুপ। তারপর অফিসে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিল। অফিস ওর বাড়ি থেকে অনেক দূরে, একটু তাড়াতাড়ি বার না হলে ঠিক সময়ে পৌঁছনো যায় না।

চটপট তৈরি হয়ে নিল অনুপ, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়াতেই ওর গা-হাত শিরশির করে উঠল। মনে হল, বহু বছরের পুরনো কোনও অ্যালবামে ও নিজের ছবি দেখছে। মেদহীন, টানটান শরীর।

অফিসের পথে বেশ কিছুটা যাবার পরে বিচিত্র এক ভাবনা খেলে গেল অনুপের মাথায়। সহকর্মীরা ওকে দেখলে নির্ঘাত চমকে উঠবে। একদিনের মধ্যে কারও চেহারা এতখানি পালটে যেতে পারে না। কোনও কৈফিয়তই ওরা স্বাভাবিক ভাবে নেবে না, নেওয়া সম্ভবও নয়। কৌতূহল থেকে আসল রহস্য ফাঁস হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি। অনুপ এই প্রথম টের পেল, রাতারাতি বিশাল ধনী হবার আকাঙ্ক্ষাটা কী তীব্র হয়ে উঠছে ওর মধ্যে!

মাঝপথে মিনিবাস থেকে নেমে পড়ল ও। শুধু আজ বলেই নয়, আরও দিন-সাতেক অসুখের অজুহাতে ডুব মারতে হবে অফিস থেকে।

আগেই ঠিক করে রেখেছিল, অফিস থেকে বেরিয়ে তিন পুরনো বন্ধুর বাড়িতে হানা দেবে। তিনজনেই অসম্ভব মোটা আর পেটুক। খাবার নেমন্তন্ন করলে ঠিক চলে আসবে বাড়িতে। কিন্তু এখন তো ওদের পাওয়া যাবে না, যে যার কাজকর্মে বেরিয়ে গেছে। অফিসে গিয়ে অবশ্য ধরা যেতে পারে। দুজনের অফিস ডালহৌসি পাড়ায়, একজনের ক্যামাক স্ট্রিটে।

অনুপের কপাল ভাল, তিনজনকেই পাওয়া গেল অফিসে। আর সামান্য সাধাসাধি করতেই সামনের শনিবার রাত্তিরে ওর বাড়িতে খেতে রাজি হয়ে গেল। তিনজনেরই এক প্রশ্ন--হঠাৎ খাওয়াচ্ছিস কেন, কোনো সুখবর আছে নাকি?

তিন জায়গাতেই একই উত্তর দিল অনুপ। উপলক্ষ ছাড়া কি খাওয়াদাওয়া হতে পারে না? আসলে কতদিন একসঙ্গে আড্ডা মারা হয়নি বল্। আড্ডা তেমন জমে গেলে রাত্তিরটা না হয় থেকেই যাবি আমার ওখানে। ব্যাচেলারের বাড়ি, শোবার জায়গার অভাব নেই। তাছাড়া পরদিন তো রোববার।

তিন অফিসেই আর একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল, অনুপকে। সেটা হল— কী রে, এত রোগা হয়ে গেলি কী করে?

তিন জাগাতেই অনুপ রহস্যময় হাসি হেসে একই উত্তর দিয়েছে। তা হল—কালকেও আমি বেশ মোটা ছিলাম।

রসিকতা ভেবে তিন বন্ধুই ওর কথায় খুব হেসেছিল।

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে এসে মাকড়শাকে সব জানাল অনুপ। মাকড়শা সব শুনে ভারিক্কি চালে 'আচ্ছা' বলেই উধাও হয়ে গেল।

মাঝখানে একটা মোটে দিন, তারপরেই শনিবার। এই দুটো দিনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তেই অসম্ভব উত্তেজিত ছিল অনুপ। সেই সঙ্গে ছাড়া ছিল ওর কল্পনার লাগাম, যা নয় তাই ভেবেছে।

শনিবার সন্ধেয় এক-এক করে তিন বন্ধুই এসে হাজির হল ওর বাড়িতে। কলেজ আমলের প্রাণের বন্ধু, এক জায়গায় এলে আড্ডা জ্বলে ওঠে দপ্ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। পুরনো দিনের অসংখ্য মজার ঘটনা বর্ণগন্ধসমেত উঠে আসছিল চোখের সামনে। কিন্তু তিন বন্ধুর মতো আড্ডায় ষোলো আনা মন দিতে পারছিল না অনুপ। ভয়ংকর উত্তেজনা মাঝেমধ্যেই ওকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

রাত্তির নটা বাজতেই খেতে বসার জন্যে তাড়া লাগাল অনুপ। বন্ধুরা এত তাড়াতাড়ি খেতে বসতে চাইছিল না, কিন্তু অনুপ জোর করল। গরম-গরম খাবারের স্বাদ আলাদা, তাছাড়া খেতে খেতে এবং খাবার পরেও তো আড্ডা চলবে অনেকক্ষণ।

নামকরা কেটারারের রাঁধুনি বাড়িতে এসে বিস্তর সুস্বাদু খাবারদাবার বানিয়েছে। টেবিলে খাবার সাজানো হল। ঝকঝকে পোর্সিলিনের পাত্রে রাখা খাবারগুলো দেখে অতিথিদের খিদে বেড়ে গেল এক লাফে। খাবার থেকে ফিনফিনে ধোঁয়া উঠছিল, সেই ধোঁয়ায় সুগন্ধ।

খেতে খেতে আর সব ছেড়ে খাওয়ার গল্পই চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। অতিথিরা বেশ ভোজনরসিক, তার ওপর ক্রমাগত আর একটু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি। তার ফল যা হবার তাই হল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে তিনজনেই সামান্য আগেপিছে বলে বসল— ওহ্ যা খাওয়ালি না, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে!

অনুপের সারা শরীরে উত্তেজনা, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, চল্ না একটু গড়িয়ে নিবি। ঘুম পেলে ঘুমোস, কাল সকালে না হয় একেবারে চা-টা খেয়ে বাড়ি যাবি।

তিন বন্ধু জোড়া-খাটে সামান্য কাত হয়ে শুয়ে গল্প জুড়ল আবার। কিন্তু গল্প সামান্য কিছু দূর গড়াবার পরেই চোখ বুজে এল তিনজনের। ঘুম আসবে নাই বা কেন, একে এই খাওয়া, তার ওপর খাবারে মেশানো ছিল ঘুমের ওষুধ। একটু পরে তিনজনেরই নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

আলমারির পাশেই ছিল মাকড়শা। অতিথিদের নাক ডাকার শব্দে বেরিয়ে এল চটপট। তারপর চোখের সামনে মোটাসোটা বন্ধুদের চর্বি থেকে খুব সূক্ষ্ম সোনালি সুতো বার করে রকমারি ডিজাইনের কাপড় বুনে ফেলল। অলৌকিক এই দৃশ্য দেখে অনুপের গা কেঁপে উঠছিল বারবার।

তিন বন্ধু জোড়া-খাটে শুয়েছিল কোনওরকমে, কিন্তু রোগা হতে হতে এত রোগা হয়ে গেল যে, এক খাটেই ধরে গেল ওদের তিনজনকে। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল ওদের। অনুপকে আর কিছু বলতে হল না, ওরা নিজেদের চেহারা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে মাকড়শার সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে বসে পড়ল অনুপ। মাকড়শা বলল, 'এবার তোমাকে কিন্তু খাটতে হবে।'

অনুপ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছিল। একনিশ্বাসে বলল, 'খাটতে আমি মোটেই ভয় পাই না, বলুন কী করতে হবে?'

'কাগজকলম নিয়ে এসো, কিছু চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে অর্ডার ধরার জন্যে কাপড়ের নমুনাসমেত চিঠি পাঠাও।'

গড়গড় করে ডিকটেশন দিচ্ছিল মাকড়শা, আর ফরফর করে লিখে নিচ্ছিল অনুপ। চমৎকার চিঠিগুলো টাইপ করিয়ে কাপড়ের নমুনাসমেত পাঠিয়ে দেওয়া হল কয়েকটি দেশে।

দিন-সাতেকের মধ্যে উত্তর এল আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি আর জাপান থেকে। কাপড়ের নমুনা দেখে সব দেশই মুগ্ধ। উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করেছে অতি সূক্ষ্ম এই কাপড়ের। কেউ লিখেছে,—উয়িভিং টেকনোলজিতে আপনারা পৃথিবীর আর সব দেশকে ছাপিয়ে গেছেন। কেউ লিখেছে, —আপনাদের কাপড়ের ডিজাইন আর আর্ট ফর্ম অতুলনীয়। কেউ লিখেছে,—ইসলামিক ল্যান্ডের সেই মসলিনও আপনাদের কাপড়ের কাছে কিছুই নয়।

প্রশংসার শেষে সবাই লিখেছে : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই, টার্ম্‌স জানান।

আমেরিকা বিরাট টাকার অর্ডার দিয়ে পার্টনারশিপে ব্যবসা করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। জার্মানির চিঠিতে একটি আবেদন : নো-হাউ শেখার জন্যে কয়েকজন অ্যাপ্রেন্টিস পাঠাতে চাই।

আবার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে বসল অনুপ। মাকড়শা গম্ভীর ভাবে চিঠির উত্তরগুলো মুখে মুখে বলে গেল। বলল, আমেরিকাকে লিখে দাও— আমরা পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে রাজি নই। জার্মানিকে লেখো, নো-হাউ আমরা শেখাব না। তবে সব দেশের সঙ্গেই ব্যবসা করতে চাই, ব্যবসার টার্মস হল...।

প্রায় রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল ব্যবসা। হেড অফিস আর ফ্যাক্টরি বসল কলকাতার বিশাল এলাকা জুড়ে। দেশের এবং বিদেশের সব রাজধানীতে একাধিক ব্রাঞ্চ-অফিস খোলা হল। ভাল মাকড়শা-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হল অনেকগুলো। কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্যে চাকরি দেওয়া হল বহু লোককে। ব্যবসার এবং দেশের উন্নতি হতে লাগল অসম্ভব দ্রুতগতিতে। অনুপ সেই যে ডুব মেরেছিল অফিস থেকে, তারপর আর যায়নি, একদিন একটু সময় বার করে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কাজ, কাজ আর কাজ। খাওয়া-দাওয়া করার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিল না অনুপ। মাকড়শা একদিন ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'এ ভাবে চললে বেশিদিন ব্যবসা করতে পারবে না। কিছু নিয়ম মানতেই হবে। রাত্তির আটটার পরে কোনও কাজ নয়। আর ছুটির দিন ছুটিই নেবে, পুরোপুরি বিশ্রাম।'

মাকড়শার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে অনুপ, কিন্তু সে দিন রাত্তির আটটার পরে নাছোড়বান্দা এক অতিথিকে কিছুতেই তাড়াতে পারল না ও।

এদিকে রাত বেড়ে যেতে লাগল একটু-একটু করে। শেষে নিরুপায় হয়ে বসার ঘরে আসতে হল অনুপকে। ভদ্রমহিলার বয়েস বেশি নয়, কিন্তু অসম্ভব মোটা। বোধ হয় খুব উত্তেজনায় ভুগছেন, মাথায় টপ্ স্পিডে পাখা ঘুরছে, অথচ চোখেমুখে, গলায় বিনবিনে ঘাম।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু সত্যি আমার আর কোনও উপায় ছিল না।' ভদ্রমহিলার কথার শেষের দিকটা হঠাৎ কান্না-কান্না হয়ে গেল।

বিব্রত হয়ে অনুপ বলল, 'আপনি বসুন। আমার কাছে ঠিক কী জন্যে...।'

ভদ্রমহিলা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি আপনার বন্ধু পরিমল হালদারের পিসতুতো বোন, আমার নাম শ্রাবন্তী।'

'পরিমল মানে শিবপুরের...।'

'হ্যাঁ, আপনাদের কলেজের বন্ধু। এই তো মাস-তিনেক আগে একদিন আপনাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন..।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ।' সব মনে পড়ে গেল অনুপের, সেই মোটা তিন বন্ধুর এক বন্ধু পরিমল। তারপরেই ওর আশঙ্কা হল, চর্বি থেকে ও ভাবে কাপড় বোনার জন্যে ওর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো। একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে পরিমল?'

শ্রাবন্তী হেসে বলল, 'খুউব ভাল।' তারপরেই ওর মুখ কালো হয়ে গেল আবার।

অনুপ ঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন বললেন না তো?'

শ্রাবন্তীর চোখ ফেটে জল পড়ল দু ফোঁটা। তারপর মুখ নিচু করে কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'আমি আত্মহত্যা করব।'

আঁতকে উঠে অনুপ আর একটু হলেই বলে ফেলছিল ভাল কথা, তবে এখানে কেন? কিন্তু মুখের কথাটা কোনওরকমে গিলে ফেলে বলল। 'মানে!'

শ্রাবন্তী কেঁদে, ঠোঁট ফুলিয়ে, কেঁপে, টুকরো-টুকরো কথায় অনেকক্ষণ ধরে যে কথাটা বলল, তার মানে হল : ওর প্রেমিক ওকে ছেড়ে অন্য একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তার একমাত্র কারণ, শ্রাবন্তী গত কয়েক মাসের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের মোটা হয়ে গেছে। কিন্তু মোটা হয়ে যাওয়াটা কি অপরাধ? মনের দুঃখে ও তাই আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। করেও ফেলত এর মধ্যে যদি না দাদার কাছ থেকে ও এখানকার কথা শুনত।

দাদা যাচ্ছেতাই মোটা ছিল, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে একটা রাত্তির কাটিয়ে একেবারে ছিপছিপে হয়ে গেছে, তাই...।

শ্রাবন্তী রাগ, দুঃখ, অভিমান আর জেদ একসঙ্গে মিশিয়ে বলল, 'আমি আপনার এখানে আজকের রাতটা কাটাব।'

আর একবার আঁতকে উঠল অনুপ। 'সে কী কথা! আপনি ভদ্রঘরের—। তাছাড়া আমার ওসব দোষটোষ...।'

শ্রাবন্তী একবার ফিক করে হেসে বলল, 'যাহ্ অসভ্য! আমি কি তাই বলেছি? আমি আমার দাদার মতো রোগা হবার জন্যে আপনার বাড়িতে আজকের রাত্তিরটা থাকতে চাই।'

অনুপ ওকে নিরস্ত করার জন্যে হাজারকয়েক কথা বলল, কিন্তু কোনও কাজ হল না তাতে। শেষে রাত দশটার সময় শুকনো মুখে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি কোনও উপায় বার করতে পারি কি না, যদি না পারি আপনাকে কিন্তু এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

মাকড়শা ছাতের ঘরের দেয়ালে আছে, অনুপ ছুটল সেই ঘরে। সব শুনে মাকড়শা একটু চটে গিয়ে বলল, 'খুব অন্যায় করেছ, অনেক আগেই মেয়েটাকে বিদেয় করা উচিত ছিল তোমার। তুমি তো জানো আমাদের ব্যবসার সিক্রেট জানার জন্যে বিদেশি এজেন্টরা আমাদের পিছু নিয়েছে।'

মাকড়শার কথার মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই, ওদের ব্যবসার গোপন কথা জানার জন্যে সত্যিই কিছু দিন হল বিদেশি গুপ্তচররা খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। অনুপ এমনিতে বেশ রাশভারী, জবরদস্ত; কিন্তু মেয়েদের কান্নার সামনে চট করে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এখন গিয়ে শ্রাবন্তীকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করা অসম্ভব। মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকল অনুপ। ওর অবস্থাটা আন্দাজ করে মাকড়শা বলল, 'ঠিক আছে চলো, তবে এবারই প্রথম আর শেষ। এরকম অনুরোধ আর কখনও আমাকে করবে না। শরবতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেল আগে।'

অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে হাঁপ ছাড়ল অনুপ। তারপর বেয়ারাকে শরবত বানানোর নির্দেশ দিয়ে শ্রাবন্তীর কাছে গিয়ে বলল,'আসুন, এ ঘরে আসুন।'

ঝলমলে মুখে শ্রাবন্তী উঠে এল। কিন্তু অনুপের শোবার ঘরে পা দেবার পরেই ওর চোখে কেমন যেন একটা সন্দেহর ছাপ ধরেছিল। থমথমে গলায় বলল, 'এখানে, এখানে কেন?'

ঘুমের ওষুধ মেশানো শরবত নিয়ে এসেছে বেয়ারা। অনুপ আদেশের গলায় বলল, 'এটা খেয়ে নিন।'

শ্রাবন্তীর চোখে সন্দেহর ছাপটা এখন আরও গাঢ় হয়ে গেছে। ও খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল,'এটা কী?'

অনুপ গলার স্বর ভারী করে বলল, 'শরবত, খেয়ে নিন চটপট।'

দোনামনা করে শরবতটা খেয়ে নিল শ্রাবন্তী। অনুপ বিছানার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওখানে বসুন।'

এবার শ্রাবন্তী রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

ওকে ভয় পেতে দেখে হাসি পেল অনুপের। বলল, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, রোগা

হওয়ার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি অপনাকে। যদি শরীর খারাপ লাগে শুয়ে পড়বেন বিছানায়।

রক্ত সরে গিয়ে মুখটা অস্বাভাবিক রকমের ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল শ্রাবন্তীর। ও কেমন যেন অন্যের পায়ে হেঁটে গিয়ে বিছানায় বসল। একটু পরে আস্তে আস্তে কাত হল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল অকাতরে।

ঘুমোতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাকড়শা। তারপর মেয়েটির চর্বির থাক থেকে নানা ডিজাইনের কাপড় বুনতে শুরু করে দিল। এই ক'মাসে এসব অনেক দেখেছে অনুপ, কিন্তু ওর বিস্ময় এখনও গেল না। চোখের সামনে চর্বির পাহাড় ছোট হতে শুরু করে দিয়েছিল।

আটটা পায়ে মাকড়শা দ্রুতগতিতে ছুটছে মেয়েটির সারা গায়ে, তারপর শূন্যে লাফিয়ে উঠে চর্বি থেকে সুতো কেটে নকশার কাপড় বুনে চলেছে একটার পর একটা। উজ্জ্বল আলোয় কাপড়গুলোর চেকনাই ফেটে পড়ছিল।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে মেয়েটির শরীরের সমস্ত বাড়তি চর্বি উধাও হয়ে গেল। মাকড়শার কর্মক্ষমতা অসীম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্যে ওর গায়ে ঘাম জমে গিয়েছিল বিন্দু-বিন্দু। অনুপ মাকড়শাকে কী যেন বলতে গিয়ে সব ভুলে গেল বেমালুম।

শ্রাবন্তীর শরীরে ওর চোখ আটকে গিয়েছিল। চর্বির পাহাড় এই মেয়েটির মধ্যে এত রূপ লুকিয়ে ছিল কী ভাবে! এখন ঠিক অঙ্কের মাপে বানানো ওর শরীরের প্রতিটি উঁচু-নিচু রেখা আর ভাঁজগুলো নিখুঁত ও লাবণ্যময়। প্রায় মাঝরাত এখন, জামগাছের পাতার খসখস শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসছিল ঘরের মধ্যে। ওই শব্দ, হাওয়া আর শ্রাবন্তীর অসামান্য রূপ একসঙ্গে মিশে গিয়ে বিচিত্র এক শিরশিরানি সৃষ্টি করেছিল অনুপের সর্বাঙ্গে।

এমন সময় গুম-গুম শব্দ। চমকে গিয়ে অনুপ তাকাল মাকড়শার দিকে। মাকড়শার কাশির আওয়াজটা অদ্ভুত, একই ভঙ্গিতে আর একবার কেশে মাকড়শা গম্ভীর গলায় অনুপকে বলল, 'তুমি আজ ও ঘরে শোবে। অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। যাও।'

অনুপের এই প্রথম মনে হল, মাকড়শা বড্ড বেশি অভিভাবকগিরি ফলায়। কিন্তু ওই আদেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা নেই ওর। অনুপ ঘরের আলো নিবিয়ে, দরজা বন্ধ করে, পাশের ঘরে চলে গেল।

।। চার ।।

অনুপ যত রাতেই ঘুমোক না কেন, সকালে একটা নির্দিষ্ট সময় ওর ঘুম ভেঙে যাবেই। সময়টা জানা আছে বেয়ারাদের, ঠিক তখনই বেডসাইড টেবিলে চা চলে আসে। কেতাদুরস্ত বেয়ারা প্রথমেই মৃদু গলায় একটা 'গুড মর্নিং' জানায়, তারপর একটুও শব্দ না করে টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে নামিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আজ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হল। চায়ের ট্রে নামাবার পরে বেয়ারা বলল, 'সাব্, মেমসাব্ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন।'

'মেমসাব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্তিরের সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অনুপের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, একটু বসতে বলো, আমি আসছি।'

মিনিট-পাঁচেক বাদে শোবার ঘরে ঢুকতেই আর একবার ভীষণ ভাবে চমকে উঠল অনুপ। বিছানার এক প্রান্তে লাজুক হয়ে বসে আছে অসামান্য রূপসী শ্রাবন্তী। ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও পারল না। শ্রাবন্তী লঘু পায়ে প্রায় ছুটে এসে অনুপের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি... আপনি... আপনি।'

তিনটে তিন ধরনের 'আপনি' বলার পরে টসটস করে জল পড়তে লাগল ওর চোখ থেকে।

অনুপ এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে, কয়েক মুহূর্ত ওর মুখ থেকে কোনও কথাই বার হল না। তারপর কোনওমতে বলল, 'আরে কী হল! আপনি বসুন।'

শ্রাবন্তী এবার কিছুটা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'না আর বসব না। বাড়িতে, বাড়িতে কী হচ্ছে জানি না, কাল সন্ধেয় কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই ...আমি এখন যাই।' কথাটা বলার পরে গভীর চোখ তুলে শ্রাবন্তী অনুপের দিকে তাকাল, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শ্রাবন্তী চলে যাবার পরে অনুপ ঠিক একই ভঙ্গিতে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ফিরে এল আবার। সব কিছু এখন আগের মতো ঠিকঠাক, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, কোথায় যেন একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে।

সকালের চমৎকার রোদ জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। হাওয়ায় সকালের রোদ্দুরের মনোরম তাপ। এই সকালগুলো অনুপের খুব ভাল লাগছিল, কিন্তু কোত্থেকে অদ্ভুত এক শূন্যতা এসে ওকে বিষণ্ণ করে তুলছিল মাঝেমধ্যে। এরকম তো হয় না, হওয়ার তেমন কোনও কারণও নেই।

জোর করে যুক্তিবুদ্ধির সামনে নিজেকে দাঁড় করাল অনুপ। বিশাল এক আন্তর্জাতিক ব্যবসার মালিক হওয়ার পর থেকে অনুপের প্রায় প্রতিটি মিনিট নানা কাজের জন্য ভাগ করা থাকে। গাদা-গাদা সময় হাতে নিয়ে আলসেমি করার দিনগুলো যেন গত জন্মের। মাঝেমাঝে কাজের চাপ থেকে একটা ক্লান্তি তৈরি হয়, জরুরি কোনও কাজ পণ্ড করার ইচ্ছে তখন তীব্র হয়ে ওঠে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ব্যবসার অকল্পনীয় সমৃদ্ধি দেখে ও আবার কাজের নেশায় মেতে ওঠে। সারা পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘোরাবার খেয়াল কখনও-কখনও ওকে ভয়ংকর উত্তেজিত করে তোলে। দুনিয়াটা টাকার বশ— কথাটা যে কত সত্যি, এ পৃথিবীতে অনুপের মতো আর কেউ বোধহয় বোঝে না।

সারা পৃথিবীতে অলৌকিক ওই কাপড়ের ব্যবসা দাপটের সঙ্গে চলছে। গোটা পৃথিবী এখন জানে, প্রতিটি বৈদেশিক মুদ্রা এখন যে দেশে গিয়ে পাহাড় তৈরি করছে তার নাম ভারতবর্ষ। পৃথিবীর ধনী দেশের ছোট তালিকায় ভারতবর্ষের নাম জ্বলজ্বল করছে এখন। কিন্তু যার জন্যে করছে সেই মানুষটির মন আজ এক অজ্ঞাত কারণে উদাস হয়ে উঠেছিল।

তবে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকের দিকে তাকাতেই উদাস হওয়া ভাবটা উধাও হয়ে গিয়েছিল অনুপের। ইশ্। এর মধ্যেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক সাড়ে-আটটার সময় হোটেলে বেলজিয়ান এক সাহেবের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার নেমন্তন্ন। আধুনিক ব্যবসার রীতিটা অদ্ভুত, খাবার টেবিলে বিজনেস ডিল্ হয়। তার আগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাকড়শার কাছে মাকড়শার ভাষা শেখার ক্লাস। মাকড়শার ভাষা শেখার ইচ্ছে অনুপের বরাবরই ছিল, কিন্তু সেটা আগে ছিল নেহাতই শখ, এখন শিখছে প্রয়োজনে।

ওদের ব্যবসার গোপন রহস্য জানার জন্যে বিদেশি এজেন্টরা পিছু নিয়েছে। গুপ্তচররা তৎপর, অনুপকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তাই মাকড়শার পরামর্শে ওই ভাষা শিখছে ও। ব্যবসার গোপন কথাগুলো এখন মাকড়শার ভাষাতেই হয়। সে সব কথা কেউ শুনে ফেললেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। ওই ভাষার একটা বর্ণও উদ্ধার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মাকড়শার ভাষাটা অদ্ভুত। বর্ণমালার চেহারা অন্যরকম, আর ব্যাকরণের কোনও মা-বাপ নেই, উচ্চারণ খটমটে। প্রথমদিকে কান্না পেয়ে যেত অনুপের। মনে হত-এর চাইতে পৃথিবীর দশটা অজানা ভাষা একসঙ্গে শেখাও বোধ হয় অনেক সহজ। কিন্তু মাকড়শা অসম্ভব ভাল মাস্টারমশাই, আর তার ধৈর্যও তুলনাহীন। মাকড়শার চেষ্টাতেই অনুপ এখন ওই ভাষায় ভাঙা-ভাঙা কথা বলতে পারে। ভাষা শিখতে পেরে অনুপের খুব আনন্দ। ব্যবসার গোপন কথাবার্তা বলার সময় ছাড়াও মাঝেমধ্যে মাকড়শার সঙ্গে মাকড়শার ভাষাতেই কথা বলে। বিদেশি ভাষা যত বেশি চর্চা করা যায় ততই রপ্ত হয়। সেদিনও ছাতের রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জামগাছের পাতার ওপর বসে-থাকা মাকড়শার বান্ধবীর সঙ্গেও ওই ভাষায় কথা বলেছিল। অনুপের মুখে নিজেদের ভাষা শুনে মাকড়শার বান্ধবী তো অবাক, তারপর লজ্জায় পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

ওর লজ্জা পাওয়ার কারণটা ধরতে পেরেছিল অনুপ। মাকড়শা ওর বান্ধবীকে অনুপের সেই উদ্ভট আশঙ্কার কথাটা বলেছিল। শুনে ওর বান্ধবীর সে কী হাসি! এসব কথা মাকড়শা অনুপকে বলেছিল। তারপর এ কথাও বলেছে : কই, বহুদিন তো বান্ধবীর সঙ্গে কাটালাম, কিন্তু এখনও তো মরিনি। তোমাদের ভাষায় যাকে মিলনটিলন বলে, সে সব তো বান্ধবীর সঙ্গে আমার বহুবার হয়েছে, কিন্তু সে তো আমাকে মেরে ফেলেনি এখনও। আসলে তোমরা, মানে মানুষেরা কুসংস্কারের ডিপো। তোমরা কুসংস্কার যেমন মানো তেমনি ছড়াও। সত্যিকারের সভ্য হওয়ার জন্যে তোমাদের এখনও হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের সমাজে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পালটানো দোষের বা বাহাদুরির ব্যাপার নয়। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং নারী-পুরুষঘটিত কোনও রকমের কেলেঙ্কারি আমাদের সমাজে নেই।

মাকড়শার ভাষা শেখার ক্লাসে যাবার আগে তৈরি হতে হতে এইসব নানান কথা অনুপের মনে পড়ছিল। আর সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল রূপসী শ্রাবন্তীর মুখ। চলে যাবার আগে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে শ্রাবন্তী ওর হাত জড়িয়ে

ধরেছিল, সেই স্পর্শসুখটাও কী এক অলৌকিক উপায়ে বার বার ফিরে আসছিল ওর শরীরে।

ঠাসা সূচি ধরে অনুপের কাজ চলল সারাদিন। রাত্তির আটটায় একটা হটবাথ নেবার পরে ও প্রথম বিশ্রামের নিশ্বাস ফেলল। এই সময় মাকড়শার সঙ্গে ওর একটু গল্পগুজব হয়।

মাকড়শা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'আজকের বি বি সি নিউজটা শুনেছ?'

'না তো।'

মাকড়শার হাসিটা ছড়িয়ে গেল অনেকখানি। 'দারুণ খবর!'

'কী রকম?'

'আমাদের কাপড়ের নকল বেরিয়ে গেছে বিদেশের বাজারে।'

'তাই নাকি?' এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল অনুপ।

এবার মাকড়শা একটু গম্ভীর হল। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কনজারভেটিভরা আমাদের কাপড় নিয়ে খুব চেঁচামেচি করে বলেছে, ওদের বাজারে আমাদের কাপড় নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। এই কাপড়ের ক্রেজ ব্রিটিশদের মধ্যে এত বেড়ে গেছে যে, দেশটা ডুবতে বসেছে প্রায়। ওদের কাপড়ের কলগুলো অকেজো হয়ে এসেছে। তার ফলে লক-আউট, লে-অফ। ওদের দেশে বেকারি আর দারিদ্র যে হারে বাড়ছে ঠিক সেই হারে কমছে নৈতিক মান।'

'নৈতিক মান?'

মাকড়শা এবার ঠাট্টার গলায় বলল, 'নীতির দিক থেকে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের শুধু ডিগ্রির তফাত। আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তো নীতিবাগীশ।

অনুপ মাকড়শার কথার ভেতরের অর্থটা ধরতে পারল না। একটু হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমাদের কাপড়ের সঙ্গে নৈতিক মান বাড়া-কমার কী সম্পর্ক?'

মাকড়শা এবার ছোট্ট একটা ধমক লাগিয়ে বলল, 'বড়লোক হবার পর থেকে দেখছি তোমার বুদ্ধিটা একটু খাটো হয়ে গেছে।'

এ কথার কোনও জবাব হয় না। অনুপের মুখটা একটু করুণ হয়ে উঠেছিল।

ভাষা শেখানোর ক্লাসে মাকড়শা যেমন মাস্টারমশাইয়ের ঢঙে কথা বলে, ঠিক সেই ভঙ্গিতেই বলল, 'আমাদের কাপড় গল্পের সেই মসলিনের চাইতে স্বচ্ছ, জানো তো?'

'হ্যাঁ।' বিনীত ছাত্রের মতো উত্তর দিল অনুপ।

'এত স্বচ্ছ যে, ওই কাপড় কেউ পরলে তার শরীরের সব অংশ বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই না?'

'হ্যাঁ।' অনুপ এবারও ঠিক আগের ভঙ্গিতে উত্তর দিল।

মাকড়শা হেসে বলল, 'তাই যদি হয়, ওই কাপড় পরা ছেলেমেয়েদের দেখে নীতিবাগীশরা বলবে না—এদের নৈতিক মান একেবারে রসাতলে গেছে!'

কিন্ডারগার্ডেনের ছাত্র হতে অনুপের আর ভাল লাগছিল না। গলায় মৃদু অভিমান আর অসন্তোষ এনে বলল, 'কিন্তু এই সব অভিযোগ আমাদের কাপড় বাজারে ছাড়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছে, এর মধ্যে নতুন কী আছে?'

মাকড়শা একটু হেসে বলল, 'আছে, আছে বলেই তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন করে ঝড় উঠেছে। বলছিলাম না, আমাদের কাপড়ের নকল বেরিয়ে গেছে। বি বি সি নিউজে শুনলাম আজ লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে এক ডজন যুবক-যুবতীকে ধরা হয়েছে আমাদের কাপড় পরার অভিযোগে।'

'আমাদের কাপড় পরার অভিযোগে?'

'আমাদের কাপড় নয়, আমাদের মতো কাপড় পরার অভিযোগে।'

'আমাদের মতো কাপড়!' মাকড়শার হেঁয়ালির মানে বার করতে পারল না অনুপ। রহস্যের ছাপটা সারা মুখে ছড়িয়ে রেখে মাকড়শা বলল, 'হ্যাঁ' আমাদের কাপড়ের মতো। সবাই প্রথমে ভেবেছিল—ওরা আমাদের কাপড় পরেছে। পরে দেখা গেল, ওরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে।'

অনুপ এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল প্রায়। এক ফাঁকে কোনওমতে বলল, 'দারুণ নকল কাপড় তো!'

এই সব নিয়ে কথাবার্তা আরও কিছুক্ষণ গড়াবার পরে অনুপ বলল, 'বিদেশের বাজারে আমাদের ব্যবসা তো একচেটিয়া, কিন্তু দেশের কাপড়কলের মালিকরা আড়ালে আমাদের নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করে।'

'কী রকম?'

'ঈর্ষা থেকে বলে, আমাদের ব্যবসাটা নাকি ধোঁকাবাজির ব্যবসা। তার কারণ আমরা দেশের বাজারে ঢুকতে পারছি না। দেশের লোক আমাদের কাপড় পরে না।

মাকড়শা হেসে বলল, 'দেশের বাজারে ঢুকতে পারছি না—কথাটা ভুল, আমরা তো ঢোকার চেষ্টাই করিনি। এত স্বচ্ছ কাপড় এদেশের মানুষ পরতে লজ্জা পায়। আমরা যদি একটু মোটা কাপড় তৈরি করি এখানকার কাপড়কল মালিকদের ব্যবসা লাটে উঠে যাবে।'

অনুপ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু মোটা কাপড় কি আপনি তৈরি করতে পারবেন?'

মাকড়শার মুখে রহস্যময় হাসিটা ফুটল। 'কী মনে হয় তোমার?'

আমতা-আমতা করে অনুপ বলল, 'না, মানে, মাকড়শা তো শুধুই পাতলা ফিনফিনে জাল বুনতে পারে।'

'ওর অজ্ঞতায় করুণার হাসি হাসল মাকড়শা, তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রাণিজগৎ সম্পর্কে তোমরা যা জানো সেটা না জানার সামিল। মাঝেমধ্যে একটু জানার চেষ্টা করলে কোনও দোষ হয় না।'

মৃদু ভর্ৎসনায় বিব্রত হল অনুপ। মাকড়শা বলল, 'আমাদের মধ্যে নানা জাত আছে। এক-এক জাতের এক-এক রকম চেহারা, এক-এক রকম স্বভাব। থাকার জায়গাও আলাদা। কেউ গাছে থাকে, কেউ পাথরের ফাঁকে, কেউ বা জলে।'

তথ্যগুলো জেনে পুলকিত হবার কিছু নেই, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্যে অনুপ অত্যন্ত মনোযো ী হয়ে উঠল।

মাকড়শা ওর দিকে তাকিয়ে আগেব কথার জের টানল। 'আমাদের কিছু আত্মীয়-

স্বজন সাউথ-ইস্ট এশিয়ার জঙ্গলে থাকে। তাদের চেহারা আমাদের চেয়েও বড়। তাদের বোনা জালগুলোও বড়-বড়। এক-একটার মাপ প্রায় আট ফুট। সোনালি সুতোগুলো বেশ মোটা। আর এত শক্ত যে, ওখানকার জেলেরা ওই সুতো দিয়ে মাছ ধরার জাল বোনে। আমাদের দেশের লোকদের কাপড় তৈরি করার ব্যাপারে আমি যদি ওদের সাহায্য নিই?'

শুনে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল অনুপ।

মাকড়শার কথা আর কাজের মধ্যে এক চুলও তফাত নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা রূপায়ণের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল অসম্ভব দ্রুত গতিতে।

।। পাঁচ ।।

সাউথ-ইস্ট এশিয়ার জঙ্গল থেকে মাকড়শার কয়েকজন আত্মীয়কে আনা হয়েছে। তাদের চেহারা ভয়ংকর, আটটা রোমশ পা নাড়িয়ে যখন তীব্র চোখে তাকায় তখন অনুপের বুক কেঁপে ওঠে। প্রথমদিকে তারা কিছুতেই নিজেদের শরীরের লালা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে জাল বুনতে চাইছিল না। তাদের নাকি ধর্মীয় বাধা আছে। এই সংস্কার কাটিয়ে বশে আনতে সময় লাগল। তারপর তারা মানুষের শরীরের চর্বি থেকে কাপড় বুনতে শুরু করে দিল।

প্রথম দিকে সেই কাপড় মাকড়শার 'স্পেসিফিকেশন' অনুযায়ী হচ্ছিল না। একটু বেশি রকমের মোটা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই ত্রুটি সংশোধন করতে বেশি দেরি হল না। অসামান্য সব কাপড় বেরিয়ে আসতে লাগল পরের পর। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার মাকড়শাদের নিজস্ব ঘরানার ছাপ সেই সব কাপড়ে। কী চমৎকার কাপড়, একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

টেক্সটাইল ইনডাস্ট্রির ভাষায় ওই সব কাপড়ের ফ্লেক্সিবিলিটি, স্ট্রেংথ, থিকনেস আর ওয়েট পার ইউনিট এরিয়া তুলনাহীন!

মাকড়শা বেশ খুঁতখুঁতে স্বভাবের। কথায় কথায় বলে, পারফেকশনিস্ট হওয়ার বিপদ অনেক, কাজ মনোমত না হলে কাজে মন বসে না। এই কাপড় দেখে মাকড়শা সন্তুষ্ট হল। তারপর অনুপকে বলল, 'এবার আমরা আমাদের দেশের বাজার ধরব, তবে অর্থনীতির নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রথমেই লাভ করতে চাইব না। বাজার ধরতে হবে নো লস, নো প্রফিট বেসিসে। দরকার হলে আমরা লোকসান খেয়ে কম্পিটিটারদের হটাব।'

দেশের বাজারে এই কোম্পানির নাম হল 'পমা'। নামটি অনুপের দেওয়া। অনুপের প আর মাকড়শার মা নিয়ে 'পমা'। এই নাম দেওয়ার পেছনে অনুপের যুক্তি হল, নামটা বেশ বিদেশি-বিদেশি। অল্প একটু চন্দ্রবিন্দু মিশিয়ে উচ্চারণ করলে ফরাসি-ফরাসি শোনাবে। ওদিকে আবার নামের শেষে মা থাকার ফলে ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ভারতীয়রা খুশি হবে।

'পমা'র কাপড় দেশের বাজারে বেরুতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল রীতিমত। লাইন লাগিয়ে সবাই কিনতে লাগল এই কাপড়। দেশের বাকি সব কাপড়-মালিকরা গালে হাত দিয়ে বসল। তাদের ব্যবসা ডুবতে বসেছে প্রায়। পমার কাপড় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ আর অন্য কাপড়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। নিরুপায় হয়ে বিরাট লোকসান মেনে নিয়ে অন্য কাপড়কলের মালিকরা ফিফটি পার সেন্ট ডিসকাউন্টে কাপড় ছাড়ল বাজারে, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হল না।

ভারতবর্ষে এখন আর আগের সেই 'সেল'-এর চাহিদা নেই, কারণ অনুপদের কাপড়ের দৌলতে দেশের মানুষের পকেটে এখন অঢেল পয়সা। শস্তায় কিছু কেনার ঝোঁক এখন আর আগের মতো নেই।

আগে ছিল শুধুই বিদেশের বাজার, এখন দেশের বাজারেও বিরাট ব্যবসা। আন্তর্জাতিক এই কোম্পানিতে অসংখ্য যোগ্য লোক কাজ করে, কিন্তু নতুন কোনও ভেন্‌চার হাতে নিলেই অনুপের কাজ বেড়ে যায় কিছুটা, আর সেই সঙ্গে উত্তেজনা। অবশ্য উত্তেজনার তেমন কোনও কারণ নেই, কেননা এই ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া, সব জায়গাতেই সোনা ফলায়।

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের কাপড়ের বাজার, পুরোপুরি কব্জায় এসে গেল। মাকড়শা আর অনুপ এখন খুব খুশি। খুশি হওয়ার একটা বড় কারণ হল দেশের কাপড়কল মালিকদের বেশ জব্দ করা গেছে। দুদিন আগে পর্যন্ত এই মালিকগুলো অনুপের নামে কুৎসা গেয়ে বেড়াত। বলত, আন্তর্জাতিক বাজারে ওই মসলিনের ব্যবসা নিছক ধোঁকাবাজির ব্যবসা। হিম্মত বুঝব যদি তোমরা দেশের বাজার ধরতে পারো। এখন ঠ্যালা বোঝো।

শনিবারের দুপুরে হেডঅফিসে নিজের চেম্বারে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিল অনুপ। কিন্তু রেশটা কেটে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে, আর তখনই কেমন এক শূন্যতা চেপে ধরছিল ওকে। মনে হচ্ছিল, এবার কী? এর পরে কী? অর্থ এবং সাফল্যের চূড়ায় উঠলে কি এই ধরনের অবসাদ দেখা দেয়!

দার্শনিক একটা চিন্তার মধ্যে ঢোকার মুখে পি বি এক্স থেকে অপারেটর জানাল, 'শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, লাইনটা দেব?'

কপালে ভাঁজ পড়ল অনুপের। কে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়?

তারপরেই এয়ারকন্ডিশন্ড চেম্বারের মধ্যে অলৌকিক উপায়ে বাইরের এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া উড়ে এল। এই শ্রাবন্তীই কি সেই শ্রাবন্তী?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পি বি এক্স-কে বলল, 'দিন।'

একটু পরেই টেলিফোনে দারুণ সুরেলা গলা—'আমি মিস্টার অনুপ রে-র সঙ্গে কথা...।'

'বলুন।'

'নমস্কার। আমি শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, চিনতে পারছেন?'

সেই গলা, অনুপের বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল, কিন্তু ও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বলল, 'একটু রেফারেন্স যদি...।'

টেলিফোনের ওদিকে কয়েক মুহূর্তের বিরতি, তারপর সেই সুরেলা গলাটা ভেসে এল আবার। 'মানে, আমি সেই এক রাত্তিরে আপনার বাড়িতে...মানে রোগা হবার জন্যে...।'

ঝলমল করে অনুপ উত্তর দিল, 'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আবার কী প্রবলেম? আবার মোটা হয়েছেন নাকি?'

আহত গলায় শ্রাবন্তী বলল, 'কেন প্রয়োজন ছাড়া কি আপনাকে ফোন করতে পারি না?'

'ন্‌না, কেন পারবেন না, অবশ্যই পারেন। তবে আপনার ওই প্রবলেমটা তো আবার দেখা দিতেও পারে, এরকম হয় তো। হয় না?'

'কেন হবে না, তবে আমার ক্ষেত্রে উলটোটা হয়েছে।'

'কী রকম?'

'জানেন আমি আরও রোগা হয়ে গিয়েছি।'

'সে কী। কেন?'

'যে জন্যে রোগা হয়।'

'কী জন্যে?'

'মনের দুঃখে।'

অনুপ হেসে উঠে বলল, 'কিন্তু মনে দুঃখ থাকার আর তো কোনও কারণ নেই। পুরনো প্রেমিক নিশ্চয়ই আবার ফিরে এসেছে।'

শ্রাবন্তী এবার চটে গিয়ে বলল, 'ফিরে এলেই আমাকে নাচতে হবে নাকি? আমি ওর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না, কখনোই না।'

'কেন?'

'জানি না।'

দু-প্রান্তের কেউই আর কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। টেলিফোনে কথা না গড়ালে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়, সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল দুজনের মধ্যেই। তারপর শ্রাবন্তী বলল, 'আজ বিকেলের দিকে খুব ব্যস্ত আছেন?'

অনুপের বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি তোমার জন্যে সব কাজ পণ্ড করতে রাজি আছি, কিন্তু মুখে বলল, 'কেন?'

'না, এমনি বলছি, মানে কাজ না থাকলে একটু গল্প করা যেত।'

'বেশ। কোথায়? কখন?'

'আপনি বলুন।'

'না-না, আপনিই বলুন।'

'পাঁচটার সময়, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে।'

'ঠিক আছে।'

'ছাড়ছি তাহলে।'

'আচ্ছা।'

অন্যান্য দিন ঝড়ের গতিতে সময় দৌড়য়, কিন্তু আজ অনুপের মনে হচ্ছিল সময়

আর এগোচ্ছেই না। অনেক দরকারি কাজেও হাত দিল না, থাক পড়ে থাক। শরীর খারাপের অজুহাতে দরকারি কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও বাতিল করে দিল। দুপুর আড়াইটে থেকে পাঁচটা বাজল প্রায় তিন যুগ বাদে।

পাঁচটার কিছু আগেই প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল অনুপ।

পাঁচটা পাঁচের সময় ময়দান আর আশেপাশের রাস্তাঘাট আলো করে শ্রাবন্তী এল। সেই সেদিনের চাইতেও আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। অবাক কাণ্ড, এই শ্রাবন্তীকেই ঢেকে রেখেছিল বিদ্‌ঘুটে এক চর্বির পাহাড়। সেই পাহাড়ের ছবিটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না অনুপ।

শ্রাবন্তী কাছে এসে লাজুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ?'

অনুপ বলল, 'এই তো, একটু আগে।'

রাস্তার পাশের চওড়া ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে। কারও মুখে কোনো কথা নেই, অথচ টেলিফোনে সেই কথা না বলে চুপ করে থাকার অস্বস্তিও নেই। অনুপ এই প্রথম অনুভব করল, কথা না বলার আনন্দও কত গভীর হতে পারে। রোদ্দুর নরম আর আবছা হয়ে এসেছিল। বাতাস সুগন্ধী করে হাঁটছিল শ্রাবন্তী।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল শ্রাবন্তী। 'আপনি কাজের মানুষ এ ভাবে ডেকে এনে কাজের ক্ষতি করলাম না?'

'না-না, কী আশ্চর্য! আরে—।'

বোকার মতো উত্তর দেবার জন্যে মনে মনে নিজেকে ধমকালো অনুপ। ও তো বলতে পারত, বলতে পারত—কাজের ক্ষতি করা যে কত আনন্দের, এই প্রথম জানতে পারলাম। কিন্তু অনুপ বরাবরই লক্ষ্য করেছে, ভাল-ভাল জবাবগুলো ওর বরাবরই দেরিতে মনে আসে। এত দেরিতে যে তখন বলা আর না-বলা দুই সমান।

দুপুর আড়াইটে থেকে পাঁচটা বাজতে প্রায় তিন যুগ লেগে গিয়েছিল, অথচ এখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল—একটি ঘণ্টা কেটে গেল এক নিমেষে।

ঘাসভর্তি ময়দানে ওরা পাশাপাশি বসে আছে। আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে চমৎকার অন্ধকার নেমে এসে চারদিকটা ঢেকে দিয়েছে প্রায়। এই এক ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে গেছে শ্রাবন্তী, অনুপও কম বলেনি। সম্পূর্ণ অকাজের কথা বলা এবং শোনায় যে এত আনন্দ, এর আগে অনুপ আর কখনও এমন ভাবে জানতে পারেনি। ভীষণ ইচ্ছে করছিল, সারা রাতটা ঠিক এই ভাবে কাটিয়ে দিতে—। মনে হতেই অনুপ একটু হেসে বলল, 'একটা রাত্তির তো আমার বাড়িতে কাটিয়েছিলেন, আজকের রাতটা মাঠে কাটাবেন?'

'আপনার বাড়িতে একা-একা রাত কাটিয়েছিলাম, এখানেও কি একা থাকব?'

'একা থাকলে আমার কী লাভ? আমিও থাকব।'

মৃদু একটা হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল শ্রাবন্তীর ঠোঁটে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি আছি।'

কথাটা কানে যেতেই বিচিত্র এক সুখের অনুভূতি দৌড়ে গেল অনুপের সারা শরীরে, কিন্তু একটা খোঁচা দেবার লোভ ও সামলাতে পারল না। বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে

থাকলে আপনার প্রেমিকটি কিন্তু অসম্ভব চটে যাবে।'

ওই ছেলেটির কথা অনুপ ঠাট্টা করে এর আগেও দু-চারবার তুলেছিল, শ্রাবন্তী অস্বস্তি পেয়েছিল ঠিকই, তবে হালকা কথার উত্তর দিয়েছিল হালকা ভাবেই।

ও এবার বেশ রেগে গিয়ে বলল, 'ওই বাজে ছেলেটার কথা বারবার আমাকে শোনাবেন না তো, ওর সঙ্গে সত্যি বলছি আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

খোঁচা দেবার স্বভাবটা অনুপকে কেমন যেন পেয়ে বসেছিল। ও বলল, 'কিন্তু ও তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। রোজ-রোজ ওকে এ ভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয়?'

'হয়।'

'কেন হয়?'

'সে অনেক কথা।'

'সে সব কথা বাইরের লোককে বলা যায় না?'

'আপনি বাইরের লোক নন।' গলায় আচমকা একগাদা আবেগ ঢেলে কথাটা বলে ফেলে অন্যদিকে মুখ ফেরাল শ্রাবন্তী। শুধু এই মুহূর্তেই নয়, পরে বেশ কিছুক্ষণ বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না অনুপ।

অনেকক্ষণ পরে শ্রাবন্তীর হাত হাতের মধ্যে তুলে নিল ও। নরম হাত। হাতের আঙুলে, তালুতে বিদ্যুতের মৃদু প্রবাহ। ওই প্রবাহ দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছিল অনুপের শরীরে। মনে হচ্ছিল, পৃথিবী যদি এই মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়, ওর বিন্দুমাত্র আফসোস হবে না।

টুকরো-টুকরো কথা, হাসি আর গল্পের ভেতর দিয়ে ঝড়ের গতিতে আরও দু-ঘণ্টা কেটে যাবার পরে শ্রাবন্তী বলল, 'বেশ রাত হয়ে গেছে, এবার উঠতে হবে যে।'

উঠি উঠি করে আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর উঠে পড়ল ওরা।

শ্রাবন্তীর বাড়ির কাছাকাছি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার সময় অনুপ বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

শ্রাবন্তী চাপা গলায় বলল, 'ফোনে জানাব।'

লেটেস্ট মডেলের বিদেশি গাড়ির অ্যাকসিলারেটরে সামান্য চাপ দিলেই গাড়ি প্রায় উড়ে যায়, কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে সত্যি সত্যিই উড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল অনুপের। চোখের সামনে যা পড়ছিল তাই ভাল লাগছিল ওর। তারাভর্তি আকাশ, পাতাভর্তি গাছের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা সারাইয়ের জন্যে ডাঁই করা পাথরকুচির পাহাড়ও ওর ভাল লাগছিল।

গ্যেটের একটা কথা আছে, আঠারো বছর এমনই একটা বয়স যে, সেই বয়েসে সবাইকেই আঠারো বছরের বলে মনে হয়। কথাটার ভেতরের মানে অনুপ বোধহয় এই প্রথম বুঝতে পারল। আঠারো বছর বয়েসটা ও অবশ্য অনেক দিন অগে পেছনে ফেলে এসেছে, তবে বুঝতে পারল ওই বয়েসের মতো আর একটা বয়েস প্রত্যেকের জীবনে পরেও একবার অন্তত আসে। যখন আসে তখন বোধহয় সবাইকে, সবকিছুকে ঠিক এইরকম করে ভাল লাগে।

গাড়ি গ্যারেজ করে অনুপ শিস দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকল। বসার ঘরের বাইরের

দেয়ালে ছিল মাকড়শা। বেশ খুঁটিয়ে অনুপকে দেখে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ তোমাকে কেমন যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে!'

অনুপ হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ অন্যরকম, একেবারে অন্যরকম। আমি আগাগোড়া পালটে গেছি।'

হেঁয়ালি-মার্কা কথায় মাকড়শা একেবারেই কৌতূহলী হল না। ঠাণ্ডা গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

বসার ঘরের বাইরের করিডরে দুটো ফ্যান্সি বেতের চেয়ার আছে. তার একটায় গা ছড়িয়ে বসে অনুপ বলল, 'আমি বোধহয় প্রেমে পড়ে গিয়েছি।'

এত বড় তথ্য জানার পরেও মাকড়শার ঠাণ্ডা গলা গরম হল না। একই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে?'

'শ্রাবন্তী।'

'শ্রাবন্তী কে?'

'আপনার মনে আছে কি, সেই একটা মেয়ে একবার রোগা হওয়ার জন্যে এখানে রাত্তিরে ছিল।'

'মনে পড়েছে। আমি তখনই জানতাম এই রকম কিছু একটা হবে।'

অনুপ অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! কী করে জানলেন? আজকের আগে পর্যন্ত আমিই তো জানতাম না।'

কোনও কথা না বলে মাকড়শা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। অনুপ জানে মানুষের প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে মাকড়শার ধারণা ভাল নয়। ওসব নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে মাঝে-মধ্যে। বলে, প্রেমের অমরত্ব ব্যাপারটা হাস্যকর। সবকিছুই মরে, সব চাইতে আগে মরে প্রেম। মাকড়শাদের সমাজে নাকি কয়েক হাজার বছর আগে প্রেম নিয়ে কবিতা-টবিতা লেখা হত। এখন ওদের কেউ কেউ হাসি-ঠাট্টা করার সময় ওই সব কবিতার দু-একটা লাইন বলে।

মাকড়শা দ্রুত কয়েক পা দৌড়ে গেল দেওয়ালে, এবার ও নিজের ঘরে চলে যাবে। যাবার আগে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যাই করো না কেন, কাজকর্মের ক্ষতি কোরো না। প্রেমে পড়াটা পাগলামো, আর ডুবে যাওয়াটা বোকামি।'

শ্রাবন্তীসমেত আস্ত ময়দানটা অনুপের চোখের সামনে ভাসছিল, বুকের মধ্যে এখনও সেই বিচিত্র শিরশিরানি। ও থমথমে গলায় উত্তর দিল, 'আপনি কিন্তু এক নম্বরের সিনিক।'

মাকড়শা মৃদু হেসে বলল, 'তোমাদের কাছে যা সিনিসিজম আমাদের কাছে তাই কাণ্ডজ্ঞান।'

অনুপ বেশ তাল ঠুকে তর্কের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে সে সুযোগ না দিয়ে মাকড়শা বলল, 'ও ভাল কথা, তোমার সেক্রেটারি অনেকক্ষণ বসেছিল। একটা নোট রেখে গেছে। কাল দুপুর দুটোর সময় দেশের কাপড়কলের মালিকরা মেমোরেন্ডাম নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে অফিসে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

'কেন আবার, তোমরা ওদের পথে বসিয়েছ অথচ ওরা একটু কান্নাকাটি করে রিলিফ চাইবে না। অনুপ এবার চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এলে কী বলব বলুন তো?'

মাকড়শা হেসে বলল, 'এ সব সামান্য ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? যা ভাল বোঝ তাই করবে।'

'এটা কি সামান্য ব্যাপার হল?'

'তা নয়ত কি? সারা পৃথিবীর কাপড়ের একচেটিয়া বাজার তোমার হাতে। দেশের বাজারের সমস্যা তো সেই হিসেবে কোনও সমস্যাই নয়।'

এ কথার কোনও জবাব দিতে পারল না অনুপ। মাকড়শা চলে গেল নিজের ঘরে।

অন্যান্য দিন এই ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনুপ সমাধানের পথ নিয়ে ভাবত, কিন্তু আজ আর এ-সব নিয়ে কিছুই ভাবতে ইচ্ছে করল না ওর।

রাত্রে বাড়ি ফেরার পরে কিছু রুটিন কাজ থাকে অনুপের, সেগুলো সেরে যখন ও বিছানায় এসে শোয় তখন ঘুমে ওর চোখ ভেঙে আসে। কিন্তু আজ ঘুম কোথায়? চোখ বোজার পরেও চোখের মধ্যে ভাসতে লাগল শ্রাবন্তীর অসামান্য মুখ।

।। ছয়।।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে সারাদিনের প্রোগ্রাম ব্রিফ করে সেক্রেটারি। ঠাসা সূচি। আজকের শেষ প্রোগ্রাম সন্ধে সাতটায়, লিবারেটেড উইমেন্'স গ্রুপ-এর ফ্লাওয়ার শো দেখা এবং ওই গ্রুপের সঙ্গে ডিনার খাওয়া।

অনুপ বিরক্ত হয়ে বলল, 'শেষ প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করে দিন।'

সেক্রেটারি পেনসিল দিয়ে মাথার পেছনের চুল চুলকে বলল, 'এর আগে এই গ্রুপের পাঁচটা প্রোগ্রামে আপনি যাননি, এবার কিন্তু কথা দিয়েছেন যাবেনই।'

অনুপ একটু বিব্রত হয়ে উঠল। 'ঠিক আছে, দেখা যাক।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল কর্মব্যস্ত দিন আর ঘড়ির সঙ্গে দৌড়নো। এক-এক সময় অনুপের মনে হচ্ছিল নিশ্বাস ফেলাটাও বোধহয় ঘড়ি ধরে সারছে।

কাপড়কলের মালিকরা দুটোর কিছু আগেই কনফারেন্স রুমে এসে জড় হয়েছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ গুজরাটি, সিন্ধি, মারোয়াড়ি আর পাঞ্জাবি মালিকরা হাতে স্মারকপত্র নিয়ে বসেছিল মুখ চুন করে। ঠিক দুটোর সময় কনফারেন্স রুমে অনুপ ঢুকতেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রতিনিধি দলটা। অনুপ বসার পরে ওরাও বসল।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। অনুপ আবার ঘড়ির দিকে তাকাতেই কাপড়কলের গুজরাটি মালিকটি খুব বিনীতভাবে স্মারকপত্র এগিয়ে দিল অনুপের দিকে। স্মারকপত্রে কী লেখা আছে অনুপের জানা, ও পড়ার ভান করে মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছিল কয়েক মাস ধরে এই লোকগুলো দাঁত নখ বার করে ওর নামে নিন্দেমন্দ করে বেড়িয়েছে ওর ব্যবসা নাকি ধোঁকাবাজির ব্যবসা। দেশের বাজার ধরার ক্ষমতা নেই ওর। কিন্তু

চাকা ঘুরে গেছে ইতিমধ্যে। সেই লোকগুলোর ঝকমকে মুখ এখন কালো। ঈর্ষাকাতর মালিকরা আজ ওর কৃপাপ্রার্থী।

স্মারকপত্রে চোখ রেখেই অনুপ বলল, 'আপনাদের জন্য কী করতে পারি বলুন?'

বলবার জন্যে উশখুশ করে উঠল গোটা প্রতিনিধিদলটা, তারপর মুখ খুলল এক মারোয়াড়ি মালিক। 'আপনি আমাদের একটু দেখেন, আমাদের কারবার তো বিলকুল বন্ধ হয়ে গেছে।'

অনুপ হেসে বলল, 'তার জন্যে আমি কি করতে পারি? দেশের লোক ভাল কোয়ালিটির কাপড় শস্তায় কিনতে চায়, আপনারা সেই ধরনের কাপড় বানান।'

এবার উত্তর দিল পাঞ্জাবি লোকটি। 'ইম্‌পসিব্‌ল্‌। আপনার সঙ্গে কম্‌পিট করার হিম্মত দুনিয়ার কারও নেই।'

অনুপের বলতে ইচ্ছে করছিল, তাহলে এতকাল কাদা ছেটাচ্ছিলে কেন? কিন্তু মুখে বেশ ভদ্র ভাব এনে বলল, 'ঠিক আছে, এখন বলুন আপনাদের জন্যে আমি কী করতে পারি?'

সিন্ধি মালিকটি এই প্রথম কথা বলল, 'সে আপনি জানেন। তবে একটা কিছু উপায় বাতলে দিন যাতে আমরা কারবার করে খেতে পারি।'

'তাহলে তো আমাকে কারবার তুলে দিতে হয়। আপনারা কি তাই চান?' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি দলটি 'ছি-ছি, রাম-রাম, উই ডিডন্‌ট্‌ মীন দ্যাট রিয়েলি' ইত্যাদি বলে উঠল একসঙ্গে।

কাপড়কল মালিকরা মনের ওপর আরো কিছুক্ষণ চাপ সৃষ্টি করার পরে অনুপ বলল, 'আপনারা দেশের লোক, আপনাদের ভাল আমি চাই। ঠিক আছে, ওয়েস্টার্ন জোনে আমি ব্যবসা করব না, আপনারা ওই জোনটা নিয়ে থাকুন।'

সম্পূর্ণ অভাবিত এই প্রস্তাবে মালিকরা ধন্য-ধন্য করে উঠল, তারপর ঠাণ্ডা পানি খেয়ে হাসি মুখে বিদায় নিল এক-এক করে।

আধ ঘণ্টা বাদে নিজের চেম্বারে ফিরে এল অনুপ। টেবিলে ওর জন্যে একটা ফোন-কল অপেক্ষা করছিল। শ্রাবন্তীর ফোন। সেই সুরেলা গলা কানে যেতেই অনুপের এতক্ষণের সব ক্লান্তি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শ্রাবন্তী বলল, 'কাল রাতে আমি একদম ঘুমোতে পারিনি।

'কেন?'

'জানি না।'

না জানা কোনো ব্যাপার যে এত মধুর হতে পারে অনুপ এই প্রথম জানল। একটু থেমে ও বলল, 'কাল রাত্তিরে আমারও ঘুম আসছিল না কিছুতেই।'

'কেন?'

এবার শ্রাবন্তী ওই উত্তরটাই দিল অনুপ, 'জানি না।'

শ্রাবন্তী পালটা কোনও উত্তর দিতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে। সেই ফাঁকে অনুপের টেবিলের আর একটা ফোন বেজে উঠল। পি বি এক্স জানাল, জরুরি ওভারসিজ কল্‌। অনুপ বলল, 'সেক্রেটারিকে কথা বলতে বলুন, আমি ব্যস্ত আছি।'

শ্রাবন্তীর সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত থাকল আরও পনেরো মিনিট। এই পনেরো মিনিটে কোম্পানির গোটা কয়েক জরুরি কাজের ক্ষতি হল, কিন্তু তার জন্যে একটুও খারাপ লাগল না ওর। বরং নানা দরকারি কাজের মধ্যে ওর বারবার মনে হচ্ছিল আগামীকালের বিকেল পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি আছে। কাল ওই সময় শ্রাবন্তীর সঙ্গে দেখা হবে আবার।

সন্ধে সাড়ে-ছটায় সেক্রেটারি বলল, 'স্যার, সাতটার সময় ফ্লাওয়ার শো, তারপর ডিনার, যাবেন তো?'

অনুপ একটু দোনামনা করে বলল, 'ঠিক আছে, যাব।'

কাছেই প্রদর্শনী। ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বাগান ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। ফুলের যেমন আকার তেমনি রূপ। তার পাশে রূপসী মেয়েদের ঝাঁক। প্রত্যেকেই লিবারেটেড উইমেন'স গ্রুপের সদস্য। গ্রুপের নেত্রী মিসেস সাকসেনা সদলে অভ্যর্থনা জানালেন অনুপকে। অনেকেই বলল, মিস্টার রে-কে তাদের মধ্যে পেয়ে তারা যে কী খুশি হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

প্রদর্শনী দেখার পরে ফুলের মতো মেয়েরা অনুপকে ফুলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে ছোট একটি সভা করল। মিসেস সাকসেনা আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রুপের ব্রোশিওর উপহার দিলেন অনুপকে। ব্রোশিওরের প্রথম পৃষ্ঠাতেই অনুপের পাতাজোড়া ছবি আর বাণী।

মিসেস সাকসেনা সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতায় বললেন : মিস্টার রে-র কাছ থেকে আমাদের গ্রুপ সব সময় সবরকম সাহায্য পেয়েছে। তিনি না থাকলে আমাদের গ্রুপ আজ এত বড় হতে পারত না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি মিস্টার রে-কে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য।

ক্ল্যাপ্-ক্ল্যাপ্-ক্ল্যাপ্। ছন্দের তালে হাততালি দিল ধনী ঘরের সুন্দরীরা। বক্তৃতার উত্তরে ধন্যবাদ জানাল অনুপ।

তারপরেই বুফে ডিনার। গ্রুপের এক ঝাঁক মেয়ে অনুপের সঙ্গে ভাব জমাবার তাল করছিল, কিন্তু মিসেস সাকসেনা খুব কায়দা করে ওদের কাটিয়ে দিয়ে অনুপকে প্রায় টেনে নিয়ে গেলেন বাগানের ধারের দিকে একটা টেবিলে।

মিসেস সাকসেনা ওদের গ্রুপের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন অনর্গল। ওদের গ্রুপ রিটার্ডেড বাচ্চাদের জন্যে কত ভাল-ভাল কাজ করেছে, ক্রিয়েটিভ আর্টস আর ডগ্ শোয়ের জন্য ওদের স্কিমগুলো কত এফেক্‌টিভ, সোসায়েটির সোশিও-ইকনোমিক প্যাটার্নে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে সার্ভে করছে ওদের গ্রুপ, এছাড়া প্রতি মাসেই আছে নানান বিষয়ের ওপর সেমিনার আর প্যানেল্‌ ডিসকাশান।

একটানা এইসব বকবকানি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অনুপ। মনে মনে বলছিল, এত ধানাই-পানাই না করে বল্ না বাবা আর কত টাকা ডোনেশন দিতে হবে? তাড়াতাড়ি বললে তোরও কাজ মিটত আমাকেও ক্লান্ত হতে হত না।

মিসেস সাকসেনা বোধহয় অনুপের অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ্য করেছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে বললেন, 'একি! আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না!'

ফিশ রোলটা খুব সুস্বাদু, কিন্তু বক্তৃতার তোড়ে এক কামড়ের বেশি অনুপের আর খাওয়াই হয়নি। মিসেস সাকসেনার কথায় অনুপ আর একটা ছোট কামড় দিল রোলে।

একটু পরেই ড্রিংক্‌স্ সার্ভ করা হল টেবিলে। এটা অনুপের ভাল লাগে না, কিন্তু ব্যবসার সুবাদে খেতে হয় মাঝেমধ্যে। এখন ও গ্লাস টেনে নিল মিসেস সাকসেনার বক্তৃতার ঝাঁজ এড়াবার জন্যে। তবে একটু পরেই বুঝতে পারল গ্লাস হাতে নিয়ে ভুল করেছে। মিসেস সাকসেনা একজন হার্ড ড্রিংকার। দুটো পাত্তর দ্রুত গলায় ঢেলে দিয়ে গদগদ হয়ে কথা শুরু করে দিলেন। আর প্রতি তিনটে কথার শেষে একটা করে 'আপনাকে আমি বোর করছি না তো?'

অনুপ যান্ত্রিক নিয়মে 'না-না', 'কী আশ্চর্য!' 'খুব ভাল লাগছে শুনতে'—এই সব বলে যাচ্ছিল। কথাগুলোয় আর মদের প্রভাবে মিসেস সাকসেনার উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল লাফিয়ে-লাফিয়ে।

খুব লম্বা একটি বিলিতি সিগারেট ধরিয়ে মিসেস সাকসেনা বললেন, 'আমরা লিবারেটেড উইমেন্‌স গ্রুপ, আমরা সবদিক থেকে লিবারেশন চাই। কোনরকম বাধাই আমরা মানব না। কোনো ইনহিবিশন বা ট্যাবু আমাদের নেই। আমরা মুক্ত, মানে মুক্ত, মানে ইন অল সেন্সেস।'

বেশ ভাল রকম নেশা ধরে গেছে মিসেস সাকসেনার। ফ্যাসাদে পড়ার জন্যে নিজের বোকামিকে দায়ী করল অনুপ। কী কুক্ষণেই যে এই মহিলার সঙ্গে ড্রিংক্‌সের টেবিলে বসেছে! মহিলার বয়েস চল্লিশের আশেপাশে। দেখে বোঝা যায় এককালে পরমাসুন্দরী ছিলেন। এখনও অবশ্য নিজের সৌন্দর্যকে ধরে রাখার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। বেশ লম্বা, শরীরে সামান্য বাড়তি মেদ, গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মিসেস সাকসেনা বললেন, 'আপনি আমার একটা বিরাট ক্ষতি করেছেন মিস্টার রে।'

'ক্ষতি! অনুপ প্রায় চমকে উঠল। মিসেস সাকসেনা নিজেকে শুধরে নিয়ে সামান্য টেনে টেনে বললেন, 'আমি বলছি না যে, আপনিই আমার ক্ষতি করেছেন, তবে আপনার জন্যে আমার বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেছে, ইট্‌স্ ট্রু'।

অনুপের বিস্ময়ের ভাবটা একবিন্দু কমল না। 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু পরিষ্কার করে বলবেন?'

বিলিতি সিগারেটের ছাই চট করে ভেঙে পড়ে না, মিসেস সাকসেনা সিগারেটের মাথায় জমে ওঠা ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্বামী ভীষণ সেকেলে, আর আমি অত্যন্ত মড্; আমাদের মধ্যে কোনওরকম আন্ডারস্টান্ডিং নেই, ইন ফ্যাক্ট কখনোই ছিল না।'

একেবারেই ঘরোয় কথা, এর কী উত্তর হওয়া উচিত, বুঝতে পারল না অনুপ। মিসেস সাকসেনার লম্বা ছাই এবার লনের সবুজ ঘসের ওপর ভেঙে পড়ল গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে আবার মুখ খুললেন উনি। 'কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম ছিল না এতদিন। মাই হাজব্যান্ড ওয়াজ আ বিগ লাম্প্ অব ফ্লেশ। এত মোটা যে, স্বাভাবিক

ভাবে হাঁটাচলা করা পর্যন্ত ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার চলাফেরা কিংবা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায় তাই ওর বাধা দেবার কোনও সাহস ছিল না এতদিন। বাট দ্য সিন ইজ চেঞ্জড্ নাও। ও এখন দারুণ ডিমান্ডিং হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারে একটা গোঁড়া লোকের কথা শুনে চলা কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো? আর এর জন্যে আপনি দায়ী, ইট ইজ ফর ইউ।'

'আমি! আমি এর মধ্যে কোত্থেকে আসছি?' আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল অনুপ।

মিসেস সাকসেনার বড় বড় দুটো চোখের মধ্যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আভা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনিই তো দায়ী, আপনার একটা কারখানায় আমার স্বামী ফ্যাট শেড করে এসেছে। নাও হি হ্যাজ বিকাম আ স্লিম চ্যাপ।'

বহুক্ষণ বাদে মন খুলে হাসল অনুপ। ওহ্! এই ব্যাপার! গোটা দেশটা ধনী হয়ে ওঠার আগে বিদ্যুৎ সংকট ছিল সর্বত্র। তখন যেমন 'লোডশেডিং' কথাটা লোকের মুখে মুখে ঘুরত, এখন তেমনি, 'ফ্যাটশেডিং'। চর্বি বেড়ে উঠলেই কারখানায় যাও। চর্বি কমিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক হও, ওই সঙ্গে আবার পয়সাকড়িও আসবে। এক ঢিলে দুই পাখি।

হাসিটা অনুপের থামতেই চাইছিল না, কোনওমতে থামিয়ে বলল, 'এ তো খুব ভাল খবর মিসেস সাকসেনা, এর জন্যে আপনার তো খুশি হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

অনুপের কথা আর হাসিতে ভদ্রমহিলা বেশ আহত হয়েছিলেন। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর অনুপের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমি লিবারেটেড উইমেন্'স গ্রুপের প্রেসিডেন্ট। বিশ্বাস করুন মিস্টার রে, দিস ইজ নো ফ্যাশান। আমরা ফ্রিডম চাই, সব দিক থেকে ফ্রিডম। আমরা ওয়ান ম্যান ওয়ান ওম্যান থিয়োরিতে বিশ্বাস করি না। উই বিলিভ ইন ফ্রি সেক্স। সেকেলে মানুষদের সেকেলে ধ্যান-ধারণা ভেঙে ফেলার সময় এসে গেছে এখন। ধরুন, ইফ ইউ স্লিপ উইথ মি টুনাইট, হোয়াটস্ রং ইন ইট?'

কোনও প্রসঙ্গ বেশি দূর গড়াতে না দিতে চাইলে ক্রমাগত সায় দিয়ে যেতে হয়। সেই হিসেবে সায় দিতে গিয়ে কোনওরকম নিজেকে সামলে নিল অনুপ। বলে কী? মিসেস সাকসেনার বয়েস একটু বেশি হলেও যৌবনের অনেকখানি এখনও ধরে রেখেছেন সযত্নে। স্কচ হুইস্কি ওর শরীরে কিছুটা বাড়তি লাস্য এনে দিয়েছে। মহিলার প্রচ্ছন্ন প্রস্তাবের সুতো ধরে অনুপ কল্পনা করল, কোনও এক হোটেলের বিছানায় ও শুয়ে আছে এই লাস্যময়ীটির সঙ্গে। হুইস্কির সামান্য প্রভাব অনুপের ওপরেও পড়েছিল। ও কল্পনাকে আরও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল, লাস্যময়ীর জায়গায় ফুলের মতো শ্রাবন্তী।

মিসেস সাকসেনা বোধহয় পছন্দসই উত্তর পাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কী জবাব দিত অনুপ নিজেও জানে না, কিন্তু মাঝখানে শ্রাবন্তী এসে সব গোলমাল করে দিল। গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে অনুপ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন?'

পরিষ্কার বোঝা গেল এই মুহূর্তে ওই প্রশ্নটা খুব অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে মিসেস সাকসেনার। কিন্তু হার মানবার পাত্রী নন লিবারেটেড উইমেন'স গ্রুপের নেত্রী। ওয়েটারকে হাত নেড়ে টেবিলে আরও ড্রিংক্‌স্‌ দেবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'কেন ভালবাসব না, নিশ্চয়ই ভালবাসি।'

অনুপ যেন হাতে পিন নিয়ে বসে ছিল, সেটা ফুটিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'তাই যদি হয়, তবে আর একজনের সঙ্গে শুতে আপনার খারাপ লাগবে না?'

'কেন লাগবে? খারাপ লাগাটা তো গোঁড়ামি, কুসংস্কার, এজওল্ড বিলিফ। এর প্রতিবাদেই তো এখন সারা পৃথিবীতে গ্রুপ সেকস, ওয়াইফ সোয়াপিং, লিভ্‌ টুগেদার ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ স্বাধীনতা চায়, সব রকমের স্বাধীনতা।'

মিসেস সাকসেনার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে অনুপ বলল, 'এসব কতটা সত্যি আমি জানি না, জানি না বলেই তর্কের মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো—স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্কটা কি বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া? এর মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে তারা এর থেকে মুক্তি চাইবে।'

মিসেস সাকসেনা লাইটার জ্বেলে অনুপের সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'ফেথফুলনেস, অ্যালিজিয়েন্‌স্‌ গোঁড়া লোকদের বানানো কথা। কনজারভেটিভ স্যোশিওলজিস্টরা আজ এ ব্যাপারে একমত যে, এভরি ম্যারেড ম্যান ওয়ান্ট্‌স্‌ টু স্লিপ উইথ নন-ওয়াইভ্‌স, অ্যান্ড এভরি ওয়াইফ ওয়ান্ট্‌স টু বি রেপ্‌ড্‌ বাই নন-হাজ্‌ব্যান্ড্‌স্‌।'

'সো হোয়াট?' অনুপ সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর আস্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'স্যোশিওলজিস্টরা এ কথাও বলে, প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষ জীবনে একবার না একবার গভীর ভাবে আত্মহত্যা করার কথা ভাবে। সেটাও তো মনের ইচ্ছে। মনের ইচ্ছে সবাই যদি কাজে লাগাত, ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াত বলুন তো?'

এ কথার উত্তরে মিসেস সাকসেনার হয়তো কিছু বলার ছিল, কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মিস্টার রে-কে হঠাৎ সামান্য উত্তেজিত হতে দেখে চেপে গেলেন একদম। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবেগ সংগ্রহ করে অনুপের হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ভরাট গলায় বললেন, 'মিস্টার রে, ইউ আর আনলাইক আদার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস। টু হিয়ার ইউ টক, আই মাস্ট সে, ইজ ইরুডিশ্‌ন্‌। চলুন কাছেই আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, ইউ উইল গেট প্লেনটি অব সলিচিউড ওভার দেয়ার, আমরা দুজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্প করব, দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।'

অনুপ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা বেজে গেছে। কখন যে এত রাত্তির হয়ে গেছে টেরই পায়নি। সামান্য উঁচু গলায় বলল, যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম মিসেস সাকসেনা, কিন্তু দুঃখিত, কাল ভোরে আমার এক বিদেশি বন্ধুকে সি অফ করার জন্যে এয়ারপোর্ট যেতে হবে। আচ্ছা, গুড নাইট।'

যে কোনও পার্টিতেই অনুপ সৌজন্য, সামাজিকতা মোটামুটি মেনে চলে, কিন্তু আজ একটু তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে পড়ল এখান থেকে।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটে চলেছিল দ্রুতগতিতে। খোলা জানলায় ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু এই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও অনুপের অস্বস্তি কাটতে চাইছিল না একটুও। অস্বস্তির কারণটা হল, এরকম অবস্থার মধ্যে অনুপ আগে কখনো পড়েনি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ওর অনেক হয়েছে, কিন্তু সে-সবের সঙ্গে আজকের এই ঘটনার কোনও মিল নেই। দীর্ঘকাল ধরে সযত্নলালিত কোনও বিশ্বাসবোধে ধাক্কা লাগলে কি এই রকম হয়? ভালবেসে একজনের প্রতি বিশ্বাসী থাকাটা কি হাস্যকর? কুসংস্কার? গোঁড়ামি?

বিপরীত স্রোত অনুপের মাথার মধ্যে আছড়ে পড়ছিল ক্রমাগত। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না ও, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেল তাড়াতাড়ি।

দেয়ালের লুকনো আলোর পাশে বসেছিল মাকড়শা। অনুপের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া কেমন হল?'

'ভাল।'

'বক্তৃতা-টক্তৃতা দিলে?'

'না, শুধু থ্যাংক্স গিভিং......।'

অনুপ মাকড়শার দিকে না তাকিয়ে বুঝতে পারল, মাকড়শা ওকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছে। একটু পরে মাকড়শা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন?'

অনুপ হাত দিয়ে নিজের কপালটা চেপে ধরল, 'না, খুব মাথা ধরেছে।'

মাকড়শা সস্নেহে বলল, 'চোখেমুখে একটু ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে শুয়ে পড়ো চটপট। আজ রাতে কাজ নিয়ে বোসো না।'

মাকড়শা নিজের ঘরে চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ অনুপ একই ভঙ্গিতে সোফায় বসে থাকল। মাথার মধ্যে সেই বিপরীত স্রোতগুলো এখনও আছড়ে পড়ছে সমানে। মাথা ওর আদপেই ধরেনি, এখন গল্প করতে ইচ্ছে করছিল না, তাই মিথ্যে কথা বলেছে। মাকড়শা হয়তো ধরেও ফেলেছে মিথ্যেটা। কারণ, মাকড়শাই ওকে ডিপ্লোমেসি শিখিয়েছে। কিছু পরিমাণ কূটনীতি বিজনেস্-ম্যাগ্‌নেট্‌দের শিখতেই হয়। কোন পরিস্থিতিতে নন্‌কমিটাল থাকতে হয়, কোন্ অবস্থায় ডিপ্লোমেটিক ইল্‌নেসের আশ্রয় নিতে হয়—এই সব। যেমন, কাউকে তাড়াতে চাইলে অনায়াসে বলতে পারো, খুব মাথা ধরেছে।

ককটেল পার্টি থেকে ফিরলে বিছানায় শোওয়ামাত্তর ঘুমিয়ে পড়ে অনুপ, কিন্তু আজ কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। চোখের সামনে কেমন পালা করে ভেসে উঠছিল মিসেস সাকসেনা আর শ্রাবন্তীর মুখ। কানের ওপর ঝমঝম করে বাজছিল একবার শ্রাবন্তী আর একবার ওই মহিলার কথাগুলো।

।। সাত।।

অসম্ভব খাটুনির মধ্যে কেটে গেল একটা মাস। এই মাসের মধ্যে সতেরো দিন অনুপ বিদেশে ছিল। লন্ডন, প্যারিস, জুরিখ, ফ্রাংকফুর্ট, রোম, টোকিও আর নিউ ইয়র্কে ওদের কোম্পানির শো-রুম উদ্বোধন করতে হয়েছে। ব্রাসেল্‌সে একটা টেকসটাইল

সেমিনারে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া ছিল লাঞ্চ, ডিনারের একগাদা নেমন্তন্ন। এই ক'মাসে সারা পৃথিবী অনুপ এতবার ঘুরেছে যে, প্রথম বিদেশ সফরের সেই রোমাঞ্চের ছিটেফোঁটাও এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে টিউব কিংবা মেট্রো রেলের এসকালেটার আর এয়ারপোর্টের লম্বা কনভেয়ার বেল্টে চেপে যাবার সময় এবার ওর বিচিত্র এক অনুভূতি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ যাত্রার বুঝি আর শেষ নেই। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতা আর অবসাদ প্রচণ্ড ভাবে চেপে ধরেছিল ওকে।

অল্প সময়ের জন্য হলেও এই এক মাসে অনুপের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে শ্রাবন্তীর। প্রথম দর্শনেই ওরা বোধহয় প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সেই প্রেমের কথা পরস্পরকে জানিয়েছে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দর্শনে। তারপরের কয়েকটি দর্শন, শ্রবণ আর স্পর্শ প্রেমকে অত্যন্ত গাঢ় করে তুলেছে। অনুপ এখন আর আগের মতো দিনরাত্তির কাজে ডুবে থাকতে পারে না, বিদেশে গেলে বিরহযন্ত্রণায় কষ্ট পায়। ওর প্রেমে গভীর প্রেমের সব লক্ষণ স্পষ্ট, কিন্তু একটা কাঁটা মাঝেমধ্যে খচখচ করে ফোটে। সেই কাঁটাটা ওর মনে বিঁধিয়ে দিয়েছে মিসেস সাকসেনা। অনুপ প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাঁটাটা তুলে ফেলতে পারেনি। ওর কথাবার্তা তাই মাঝেমধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে শ্রাবন্তীর কাছে।

অনুপ আর শ্রাবন্তী সেদিন রেড রোডের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দিনের আলো ওদের চোখের সামনে ডুবে গেল একটু-একটু করে। গাছের ঝাঁকড়া মাথায় পাখির কিচিরমিচির। হুশহাশ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। গাড়ির হেডলাইটের আলো সবুজ ঘাস আর গাছের খয়েরি গুঁড়ির ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছিল বারবার। অন্ধকার আর আলোর ক্রমাগত এই ধাক্কায় একটা আচ্ছন্ন ভাব তৈরি হয়েছিল অনুপের ভেতর। শ্রাবন্তীর হাতটা ও হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আলতো করে চুমু খেল একটা। শ্রাবন্তী বলল, 'কী?'

অনুপের বেশ মজা লেগে গেল, কিসের কী? চুমু খাওয়ার কি কোনও কারণ আছে? নাকি ওর আস্ত প্রশ্নটা হল—চুমু খাওয়ার পরে আর কী? প্রশ্নটা ভেবে নিয়ে অনুপ বলল, 'সব।'

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী সব?'

অনুপ ওর কাঁধে চাপ দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আবার বলল, 'সব মানে সব।'

ঠিক এই সময় দ্রুতগামী একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। শ্রাবন্তী কিন্তু একটুও সরল না। না সরে বলল, 'আর কত হাঁটবে? এবার একটু বসি।'

অনুপ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দিনরাত্তির তো বসেই থাকি, হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে। চলো না। আর একটু হাঁটি, পরে বসব।'

শ্রাবন্তী একটু নকল রাগ দেখাল—'ধ্যাত্‌ তোমার শুধু হাঁটা আর হাঁটা, সেদিনের মতো হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে বসলে কত ভাল হত বলো তো।'

'এক কাজ করবে, আমাদের কোম্পানি পার্ক স্ট্রিটে নতুন একটা গেস্টহাউস বানিয়েছে, চলো ওখানে বসে গল্প করা যাক।'

শ্রাবন্তী প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'চলো চলো, দারুণ হবে।'

অনুপ বাঁকা করে হাসল। 'কী দারুণ হবে?'

শ্রাবন্তী ওর কথার ভেতরের অর্থ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে ওকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেল সামান্য দূরে পার্ক করা গাড়ির দিকে।

নির্জন রাস্তায় অনুপের গাড়ির চাকা গড়াতে লাগল, গাড়ি চালাচ্ছিল অনুপ, পাশে ঘন হয়ে বসেছিল শ্রাবন্তী। সামান্য পথ। গোটা-তিনেক কথা শেষ হবার আগেই চলে এল গেস্টহাউসে। অনুপ বলল, 'আমাদের এই গেস্টহাউসে তুমিই কিন্তু প্রথম গেস্ট।'

শ্রাবন্তী যখনতখন চোখে বিস্ময় ফোটাতে পারে। বড়-বড় চোখদুটো আরও বড় করে বলল, 'তাই!'

গেস্টহাউসের সামনে ছোট একটা সবুজ লন, দুধারে ফুলগাছের সারি। গেট খুলে দিয়ে দারোয়ান লম্বা একটা সেলাম ঠুকল। নুড়ি-বেছানো রাস্তায় মুচমুচে আওয়াজ তুলে গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার পাশে। ছোট্ট একটা হর্ন দিতেই কেয়ারটেকার ছুটে এল। দুধের মতো সাদা, বাহারি গেস্টহাউসটা দেখে দুচোখে আর একবার বিস্ময় জড় করল শ্রাবন্তী। 'আহ্! কী সুন্দর!'

দোতলা গেস্টহাউসের সিঁড়ি লাল টুকটুকে কার্পেট-মোড়া। দোতলার গোটা ফ্লোরেই ম্যাচিং কার্পেট। সিঁড়ির দিকে দুটো স্যুইট। বাঁদিকের স্যুইটের দরজা খুলে গাঢ় গলায় অনুপ শ্রাবন্তীকে ডাকল, 'এসো।'

একটা সিটিং, একটা রিডিং আর একটা বেডরুম নিয়ে স্যুইট। দারুণ সাজানো ঘর-গুলোয় প্রায় ছেলেমানুষের মতো ছুটে ছুটে শ্রাবন্তী যে কতবার বিস্মিত হল, তার আর ঠিক নেই।

অনুপ বলল, 'ভারতবর্ষের সবকটা স্টেট ক্যাপিটালেই আমরা তিনটে করে এই রকম গেস্টহাউস বানিয়েছি। তবে গেস্টহাউসে আমরা সব গেস্টকে রাখি না। বেশির ভাগ গেস্টকেই রাখা হয় হোটেলে।'

শ্রাবন্তী হঠাৎ বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে মজার গলায় বলল, 'সব গেস্টহাউসে তুমি কি শুধু আমার মতো গেস্টদেরই আনো?'

একই রকমের মজার গলায় উত্তর দিল, অনুপ, 'আনলে কি কোনও দোষ হয়?'

'কক্ষনো না, এতে দোষের কী আছে?'

হঠাৎ অনুপের মনের মধ্যে আটকে-থাকা সেই কাঁটাটা খচখচ করে উঠল। কানের পাশেই যেন লাউডস্পিকারে বেজে উঠল মিসেস সাকসেনার কথাগুলো : চলুন না কাছেই আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, দুজনে বেশ গল্প করা যাবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্লিপ উইথ মি, ইউ ক্যান। সেকেলে গোঁড়ামি, ট্যাবু আমার নেই। আমি ফ্রি-সেক্সে বিশ্বাস করি। কথাগুলো কেমন যেন ভাঙা রেকর্ডে আটকে যাওয়া কথার মতো বারবার আছড়ে পড়ছিল অনুপের কানের ওপর।

অনুপ মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে সামান্য নিচু গলায় বলল, 'সত্যি এর মধ্যে দোষের কিছু নেই?'

শ্রাবন্তীর মজা করার ঝোঁকটা এখনও কাটেনি, ঝলমলে গলায় বলল, 'দোষের কী আছে, পুরোটাই গুণের, আর তুমি তো খুব গুণী ছেলে।'

শ্রাবন্তীর কথা আচমকা একটা ধাক্কা মারল অনুপকে। একটা ধাক্কায় আর একটা ধাক্কার জন্ম হয়। অনুপ হিসহিস করে বলল, 'গুণী মেয়ে হতে তোমারও নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। আমার গেস্টহাউসে আর কারও সঙ্গে রাত কাটাতে পারলে তুমি খুবই খুশি হবে, না?'

শুনে শ্রাবন্তীর ঝলমলে মুখটা কালো হয়ে গেল নিমেষে, চোখ ছলছলে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো? তুমি আজকাল এই ধরনের কথা আমাকে প্রায়ই বলো। কেন? তোমার ধারণা কিংশুকের সঙ্গে আমার এখনও সম্পর্ক আছে?'

চোখের সামনে পুরো ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে যেতে দেখে অনুপ রীতিমত আহত হয়ে বলল, 'ছি-ছি, কী বলছ তুমি! বিশ্বাস করো, আমি এসব ভেবে কিছু বলিনি।'

'আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।'

সম্পূর্ণ অসহায় মানুষের মতো গলা করে অনুপ বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করেই থাকতে চাই।'

এই মুহূর্তে আরও অনেক-কিছু বলতে চাইছিল অনুপ, কিন্তু সঠিক শব্দগুলো কিছুতেই খুঁজে পেল না। বুঝতে পারছিল, ও খুব আবেগপ্রবণ আর যুক্তিহীন হয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলাবার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল।

মিসেস সাকসেনা ওর বিশ্বাসবোধকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ওই মহিলাও এক ধরনের বিশ্বাসবোধ থেকে কথা বলেছে। কিন্তু কোন্ বিশ্বাসটা ঠিক? ভালবাসা মানে তো আনুগত্য। আনুগত্য মানে কি শুধু একটিমাত্র শরীরের আনুগত্য নয়? নাকি...।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে উঠেছে অনুপ। বাধাবন্ধনহীন জীবনযাত্রা কাকে বলে ও চোখ খুলে দেখেছে বিদেশে। কিন্তু ওর রক্তের অনেক গভীরে মেরু অঞ্চলের বরফের মতো যে সংস্কার জমে আছে তার থেকে মুক্তি পায়নি কখনও, কিংবা পেতে চায়নি...।

সেরা ইনটিরিয়র ডেকরেটরের হাতে সাজানো স্যুইটের চমৎকার আবহাওয়া কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে উঠেছিল।

শ্রাবন্তী নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার শরীর খারাপ লাগছে, বাড়ি যাব।'

অনুপ শুনতে পেল ওর নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, 'চলো।'

পথে তেমন কোনও কথা হল না, অনুপ শ্রাবন্তীকে ওদের ফ্ল্যাটের কাছে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল সোজা।

লাউঞ্জের দেয়ালে ছিল মাকড়শা, অনুপের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল। মাকড়শা আজকাল অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেছে। গল্পগুজবে আগের মতো আর আগ্রহ নেই। প্রশ্নের ছোট-ছোট উত্তর দেয়, মাঝেমধ্যে উত্তরও দেয় না। মাকড়শার এই পরিবর্তনটা বেশ কিছুদিন হল অনুপের চোখে পড়েছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ও প্রশ্ন করেছে হাজারবার। শরীর খারাপ? ডাক্তার ডাকব? আমার কোনো ব্যবহারে কি আহত হয়েছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব প্রশ্নের উত্তরেই মাকড়শা শুকনো হাসি হেসে ওকে থামিয়ে দিয়েছে। কখনও বলেছে, 'আরে, বয়স হয়েছে। আর কি আমার পক্ষে আগের মতো ছটফটে থাকা সম্ভব?' কখনও মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে তুলে বলেছে, 'তুমি তো এখন পৃথিবীর দশজন ধনীর একজন। তোমার দেশ তো এখন পৃথিবীর পাঁচটা ধনী দেশের একটা। আর কী, এবার আমাকে ছুটি দাও।'

লাউঞ্জের একটা সোফায় চুপ করে বসে আছে অনুপ। মাথার মধ্যে টুকরো-টুকরো প্রশ্ন, আর সারা শরীরে যাচ্ছেতাই রকমের অবসাদ। অন্যদিন ও বাড়িতে ফিরেই মাকড়শার কুশল-সংবাদ নেয়, আজ আর একটাও কথা বলতে পারল না।

বেশ কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যাওয়ার পরে মাকড়শাই কথা বলল, 'শরীর খারাপ?'

প্রশ্নের মধ্যে পুরনো সেই স্নেহের সুর। স্নেহের গলা কানে যেতেই অনুপ আবার আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। 'আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।'

মাকড়শা হেসে বলল, 'সে কী কথা! ভাল লাগছে না বললে কি চলবে? তোমার এখন পৃথিবীজোড়া ব্যবসা।'

'আমি আর ব্যবসা করব না।'

মাকড়শা দেয়াল বেয়ে দ্রুত ওর কাছে এসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

অনুপ শুকনো মুখে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'কিছু না।'

আবার আগের মতো চুপ করে গেল দুজনে। একটু পরে মাকড়শা বলল, 'সিটিংরুমে তোমার জন্যে দুজন বিদেশি অপেক্ষা করছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছে, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ সে কথা।'

অনুপ সত্যিই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু মনে পড়ার পরেও ও বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করল না। যেমন ভাবে বসেছিল ঠিক তেমন ভাবেই বসে থাকল। একটু পরে মাকড়শা বলল, 'সাবধানে কথা বোলো, লোকদুটোকে আমার গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে।'

এবার সজাগ হয়ে উঠল অনুপ। 'গুপ্তচর! কেন ওদের গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে?'

'লোকদুটোর চলাফেরা, তাকানো, এদিক-সেদিক উঁকি মারা রীতিমত সন্দেহজনক। তাছাড়া ওরা প্রায়ই গলা নামিয়ে কোড ল্যাঙ্গোয়েজে কথা বলছিল। আমি ঘরের সিলিংয়ে বসে অনেকক্ষণ ওদের লক্ষ্য করেছি।'

অনুপ পিঠ টান করে বসল। তারপর সামান্য উত্তেজিত গলায় বলল, 'ঠিক বলেছেন, লোকদুটোকে আমারও খুব একটা সুবিধের ঠেকেনি। ওরা আফ্রিকায় আমাদের কাপড়ের এজেন্সি নিতে চায়। আমি বলেছি, সোল এজেন্সি দিতে পারব না, তবে আপনারা আমাদের হয়ে কাজ করতে পারেন। তার এই-এই শর্ত। পরিষ্কার কথাবার্তা, কিন্তু তারপরেই লোকদুটো নানা অছিলায় আমার সঙ্গে দেখা করে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। সেদিন কথায় কথায় বলল, বাঙালি রান্নার ওরা খুব সুখ্যাতি শুনেছে। বাঙালি ডেলিকেসি ওরা একটু চেখে দেখতে চায়। আমি ওদের মতলব বুঝতে পেরে আজ রাত্তিরে খাওয়ার জন্যে নেমন্তন্ন করেছি। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। লোকদুটো খুব মোটা না? বলেই খুব ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে মাকড়শার দিকে তাকিয়ে অনুপ হাসল।

ইঙ্গিত চট করে ধরে ফেলে মাকড়শাও হাসল। অনেকদিন পরে মাকড়শার হাসি দেখে অনুপের বুকের ভার হালকা হয়ে গেল কিছুটা।

জরুরি কাজে আটকে গিয়ে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ ক্ষমা চাইল অতিথি দুজনের কাছে। সজ্জন অতিথিরা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, 'নেভার মাইন্ড ইট্'স অলরাইট।'

তারপর যথাসময়ে বাঙালি খানা। বিরাট আয়োজন। খাবারের মধ্যে ছিল উচ্ছে, কচুশাক, ওলের ডালনা, আলুপোস্ত, মোচার ঘণ্ট ইত্যাদি। খাবারগুলো সাহেবদুটোর মুখে উঠছিল না, কিন্তু জোর করে খাচ্ছিল আর বিশেষণের তুবড়ি ছোটাচ্ছিল সমানে— একসেলেন্ট, বিউটিফুল, ডেলিশাস ইত্যাদি ইত্যাদি। খাওয়ার শেষে বাংলাদেশী শরবতে যথারীতি ঘুমের ওষুধ মেশানো। তারপর বিছানায় পড়ামাত্তর ওদের নাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল।

ঘুমোবার পরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাকড়শা। তারপর সাহেবদুটোর চর্বি থেকে মনের সুখে রকমারি ডিজাইনের একগাদা কাপড় বুনে ফেলল। মোটাসোটা অতিথি দুজন দেখতে দেখতে রোগা টিঙটিঙে হয়ে গিয়েছিল।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পরে ওদের সে কী অবস্থা! নাইটস্যুট পরা অবস্থাতেই পাগলের মতো ছুট লাগিয়েছিল রাস্তায়।

সাহেবদের চর্বি থেকে বোনা কাপড়গুলো অসম্ভব উজ্জ্বল। এটা কেমন করে হল? জিজ্ঞেস করতেই মাকড়শা বলল, ''হবেই তো, ভাল চর্বি হল ভাল র'মেটিরিয়াল।'

দুপুরে সাহেবদের হোটেলে ফোন করল অনুপ। কিন্তু ওদের পাওয়া গেল না। ওরা নাকি সকালের ফ্লাইটেই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। নিজের মনেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাসল অনুপ। কিন্তু উত্তেজনা থিতিয়ে যাওয়ার পরে পুরনো সেই অবসাদ আবার ওর শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

।। আট ।।

মাকড়শার সব কথা ফলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। পরিকল্পনা রূপায়নের যে সময়সীমা ছিল তার অনেক আগেই সম্পূর্ণ হল সব। ভারতবর্ষ এখন অর্থসম্পদে পৃথিবীর মাথায়। জাতীয় আয় অকল্পনীয়, মাথাপিছু আয় অকল্পনীয়। প্রতিটি খাতে অভাবনীয় বিনিয়োগ। উপযুক্ত খাদ্যপুষ্টি পেয়ে ভারতের সব ছেলেমেয়েই এখন বেশ লম্বা-চওড়া, কারও গায়েই বাড়তি চর্বি নেই। প্রত্যেকেরই মাথা খুব সাফ। দেশে বিজ্ঞানী এবং শিল্পীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে হু-হু করে। বিশ্বশান্তি, বিশ্ব-অশান্তির ব্যাপারে ভারতবর্ষের কথাই এখন শেষ কথা।

ভারতের এই অভাবনীয় সমৃদ্ধি দেখে অর্থনীতিবিদরা তাদের অনেকগুলো প্রচলিত থিয়োরিকে বাতিল করে দিয়েছে। অনুপ রায়ের 'কম্প্রিহেন্‌সিভ মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম' এখন একটি নতুন তত্ত্ব। এই আওতায় আছে কৃষি, শিল্প, জাতীয় সম্পদ, নতুন ট্যাক্স-

স্ট্রাকচার, এক্সপোর্ট প্রোমোশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, আনম্যাচিং গ্রোথ পারফর্মান্স্, বিনিয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তত্ত্বের সফল রূপায়নের ফলে ভারতবর্ষের প্রতিটি পরিবারের এখন নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, টি ভি সেট, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রিক ক্লিনার ইত্যাদি আছে। ভারী শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে ভারত। ব্রিটিশ ইয়ার্ডে একটা জাহাজ তৈরি হতে সময় লাগে ১৯ মাস। ওই মাপের জাহাজ বানায় জার্মানি ১৩ মাসে, সুইডেন ৯ মাসে, জাপান ৮ মাসে। সে ক্ষেত্রে ভারতের সময় লাগে মাত্র ৩ মাস। শুধু সময় সংক্ষেপই নয়, ভারতের মতো এত নিখুঁত কাজও আর কোনো দেশ করতে পারে না। ইলেকট্রনিক শিল্পে ভারতের অগ্রগতি বিস্ময়কর। অনুপের অনুরোধে ভারত সরকার এই শিল্পে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

সরকারি প্রশাসন এখন পরিস্রুত জলের মতো, কোথাও এক কুচি নোংরা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমলাদের কর্মতৎপরতা বিস্ময়কর। যে কাজ হেঁটে করলে চলে, সে কাজ তারা দৌড়ে সারে। 'লাল ফিতে' কথাটা এখন অপ্রচলিত শব্দ ভাণ্ডারে পাকাপাকি ভাবে ঢুকে গেছে। দেশের উন্নতির দিকে চোখ ফেরালে নতুন ভারতের প্রাণপুরুষ অনুপ আগে এক ধরনের তৃপ্তি পেত, কিন্তু এখন আর পায় না। পুরনো সেই অবসাদ, ক্লান্তি আর বিচিত্র এক শূন্যতা ওকে মারাত্মক ভাবে চেপে ধরে।

মাকড়শারও একই অবস্থা। ওর চেহারায় বয়েসের ছাপ ধরে গেছে রীতিমত। দুজনের মধ্যে গল্পগুজবের পাটও চুকে গেছে বহুকাল। বহুক্ষণ একটানা চুপচাপ বসে থাকার পরে কেউ হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললে চমকে ওঠে অন্যজন। মাঝেমধ্যে মাকড়শা বলে, 'আমার আর ভাল্ লাগছে না!'

অনুপ সায় দেয়, 'আমারও।'

অনুপ ইদানীং শ্রাবন্তীর সঙ্গে খুব একটা দেখা করে না। শ্রাবন্তীর ফোন এলে 'কাজ আছে' বলে কাটিয়ে দেয় অধিকাংশ সময়। দেখা হলেও বলার মতো কথা বিশেষ খুঁজে পায় না। তবে শ্রাবন্তী বকবক করে যায় একতরফা।

ওর বেশির ভাগ গল্পই ফ্যাশান আর সিনেমা নিয়ে। সেদিন ও হৈ-হৈ করে এসে বলল, 'জানো আমি লিবারেটেড উইমেন্'স গ্রুপের মেম্বারশিপ পেয়েছি। ওরা কিন্তু যাকে তাকে মেম্বার করে না। গ্রুপের প্রেসিডেন্ট মিসেস সাকসেনা নিজে আমার ইন্টারভিউ নিয়েছেন। ইন্টারভিউ দেবার সময় আমার যা বুক কাঁপছিল না... তবে ভদ্রমহিলা অসম্ভব ভাল, আর যা মড় না...।'

শুনে অনুপ কেমন যেন চমকে উঠে বলেছিল, 'অ!'

সেদিনের পর থেকে শ্রাবন্তীর সঙ্গে অনুপ আর দেখা করেনি। ফোন এলেই বলে, 'ভীষণ ব্যস্ত আছি।'

মিথ্যে কথাটা বলার দু-চারদিন পরে অনুপ সত্যি-সত্যিই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল সম্পূর্ণ উটকো এক ঝামেলায়। উটকো ঝামেলা অল্প সময়ের মধ্যে ওকে কম সামলাতে হয়নি। সব ঝামেলাই তৈরি করেছে ধান্ধাবাজ, অকৃতজ্ঞ লোকগুলো। অকৃতজ্ঞতা দেখলে

অনুপ খুব কষ্ট পায়। মাকড়শা আগে ওকে সাহস দিয়ে বলত, 'ভাল কাজ করছ অথচ বিরোধিতা আসবে না—এ কেমন কথা। নিঃস্বার্থভাবে দেশের-দশের উন্নতি করলে কিছু লোক তো গায়ে কাদা ছেটাবেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, ভাল কাজ করার অপরাধে কত লোককে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। আমাদের দেশ তো সেই গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে সরে যেতে পারে না!'

মাঝেমধ্যে অল্পবিস্তর খোঁচা দিয়ে কথা বললেও মাকড়শা ঝামেলা থেকে উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বাতলে দেয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এবারের গণ্ডগোলে মাকড়শা খুব একটা মাথা ঘামাতে চাইল না। আর অবাক কাণ্ড, অনুপ নিজেও কেমন যেন উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে গোলমাল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে, এক শহর থেকে আর এক শহরে।

মতলববাজ, অকৃতজ্ঞ লোকগুলো বেশ কায়দা করে গোলমালটা পাকিয়েছে এবার। টাকা খাইয়ে নাম-করা কয়েকজন ডাক্তারকে দলে টেনেছে। ডাক্তারদের রিপোর্ট ফলাও করে ছাপছে কয়েকটা খবরের কাগজ। কয়েকজন সেয়ানা রাজনৈতিক নেতা তদন্ত কমিটি বসাবার ধুয়ো তুলে নিজেদের দলের প্রচারে নেমে পড়েছে এই সুযোগে। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা আওতার মধ্যে ছিল, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মে হাত পড়েছে—আওয়াজ উঠতেই গোলমাল দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। অনুপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মতলববাজ লোকগুলো ভেবেচিন্তে কয়েকটা পর্যায়ে গোলমালটা ছড়িয়েছে। কিন্তু এত বুদ্ধি ওরা পেল কোত্থেকে? অনুপ আন্দাজ করল, এর পেছনে নিশ্চয়ই বিদেশি হাত আছে।

বিদেশি হাতের কথা জানতে পারলে আগে প্রশাসনে যেমন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত এখন আর তেমন হয় না। বিদেশির চক্রান্ত গুঁড়িয়ে দেবার, ওদের কুবুদ্ধি ভোঁতা করার অনেক লোক আছে এখন এদেশে। অনুপ নিজে চেষ্টা করলে তো কথাই নেই, কিন্তু ও এবার একটুও উৎসাহ পাচ্ছিল না।

চর্বির কাপড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার জন্যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে সারা দেশে। সেই প্রচারপত্রের একটা এখন অনুপের টেবিলে। অনুপ প্রচার পত্রের ওপর চোখ রাখল উদাসীন ভঙ্গিতে।

হলুদ কাগজের মাথার দিকে লাল কালিতে বড়-বড় করে লেখা : ক্ষতিকারক চর্বির কাপড় বয়কট করুন।

বয়কট করার কারণগুলো এক, দুই করে লেখা। মোদ্দা কথা হল : মানুষের শরীরের পক্ষে চর্বি অত্যন্ত দরকারি। চর্বি শরীরের উত্তাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে। মানুষের পায়ের তলায় চর্বি আছে বলেই মানুষ হাঁটতে পারে, নইলে পারত না। নিতম্বে চর্বি না থাকলে শক্ত জায়গায় কেউ বসতে পারত না। এখানে ব্রাকেটের মধ্যে আছে, মেয়েদের 'গুরু নিতম্ব' না থাকলে কবিকল্পনার বিস্তারও বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেহের মাংসপেশীতে, হাড়ের জয়েন্টে চর্বি না থাকলে শরীরযন্ত্র ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। খাদ্যের অনটন হলে কিংবা কেউ যদি ইচ্ছে করে উপোস করে, দেহের সঞ্চিত চর্বি দগ্ধ হয়ে

শরীরকে বাঁচায়। নারীদেহে প্রাকৃতিক নিয়মে বেশি চর্বি আছে। ওই চর্বি গর্ভের সন্তানের দেহগঠনে অত্যাবশ্যক। প্রসূতির শরীরে প্রয়োজনীয় চর্বি না থাকলে সন্তানের শরীর ভালভাবে গড়ে ওঠে না, বাচ্চার রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় এবং তার চিররুগ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব মানুষের চর্বি থেকে কাপড় বোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

এই প্রচারকে থামিয়ে দেবার জন্যে পালটা প্রচার অভিযানে নামে অনুপের কোম্পানি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারদের সইসমেত পুস্তিকা বিলি করা হল হেলিকপ্টার থেকে।

পুস্তিকার ওপর বড় বড় হরফে লেখা : অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। দেহের অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় সম্পদের সার্থক ব্যবহার করে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখুন।

পুস্তিকায় ষোলোটি ভাষায় চর্বির কাপড়ের যে গুণগান করা হয়েছে তার সারমর্ম হল এই : দেহে বাড়তি চর্বি থাকলে শরীরে নানা ত্রুটি দেখা দেয়। অতিরিক্ত চর্বি হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে সঠিক ভাবে কাজ করতে দেয় না। মেদবহুল শরীর হৃদ্‌রোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধিরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় সহজেই। বেশি মোটা মানুষরা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না, দেহের রক্তধারা সহজ ভাবে প্রবাহিত হওয়ার পথে বাধা পায়। মোটা লোক কাজের অযোগ্য, তাদের শরীর ভেঙে পড়ে তাড়াতাড়ি, ফলে তারা স্বল্পায়ু হয়। বাড়তি চর্বির চাপে পিটুইটারি থাইরয়েড ইত্যাদি গ্ল্যান্ড দুর্বল হয়ে শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি করে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে একটি কথা আছে—এভরি পাউন্ড অব একসেস ফ্যাট মে মীন এ মান্থ লেস অব লাইফ। অত্যন্ত খাঁটি কথা। এক পাউন্ড ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মাস আয়ু কমে যায়। ওজন বাড়ার অর্থই চর্বি বাড়া। ওই চর্বি কাপড় তৈরি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে অর্থোপার্জন করুন এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান।

এখন আর ওজন কমাবার জন্যে উপবাস করার প্রয়োজন নেই। যা ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খেয়েও রোগা থাকা সম্ভব। এই পুস্তিকাতেও ব্রাকেটের মধ্যে একটি কথা আছে। তা হল, 'গুরু নিতম্ব' দেখতে না পেলেও কবিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হবে না, কারণ এখন চতুর্দিকেই সুন্দরীদের ক্ষীণ কটি। ওই ক্ষীণকটিতে স্তনচূড়ার ছায়া দেখে কবিকল্পনা আদিগন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রচারের জবাবে পালটা জবাব, আর জবাবটিও মোক্ষম। এই জবাব দেখে দেশবাসী যখন চর্বির কাপড়ের পক্ষে চলে আসছিল তখন বিরোধী পক্ষ সনাতন হিন্দুধর্ম গোল্লায় যাওয়ার ধুয়ো তুলল। ব্যস, হাওয়া ঘুরে গেল আবার।

মানুষের শরীরে চর্বি থেকে কাপড় বোনা শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার। ওই কাপড় পরে ঈশ্বরের আরাধনা করা অনুচিত। কোন্ এক সাধু স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন, মানুষের শরীরের চর্বি থেকে কাপড় বোনা অশাস্ত্রীয় কাজ। এই প্রথা বিলোপ করার জন্য পুণ্যাত্মাদের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। স্বপ্নাদেশের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পরে কয়েকজন পুণ্যাত্মা অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন।

অনুপের কোম্পানি এবং সরকারি প্রশাসন-যন্ত্র শক্ত হাতে অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতির

মোকাবিলায় নেমেছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে দেশের কোথাও কোথাও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। একটি শহর তো কারফিউয়ের আওতায়।

এত বড় একটা কাণ্ড, অথচ সেই অবসাদ আর ক্লান্তির হাত থেকে অনুপ এখনও মুক্তি পায়নি। কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়াই ওর মধ্যে ফুটে উঠছে না। মাকড়শাও আজকাল কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা, ঘটনাগুলো জানার ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

সেদিন অনুপ হঠাৎ লক্ষ্য করল, মাকড়শার গায়ের রঙ বেশ কালো হয়ে গেছে। আটটা পা বোধহয় আর আগের মতো কর্মক্ষম নয়। সোফার হাতলে বসে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ বন্ধ করল মাকড়শা। বন্ধ করেছে তো করেই আছে।

আজকাল কারও সঙ্গে কথা বলতে অনুপের আর ভাল লাগে না। কোলের মধ্যে হাতদুটো জড় করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে ও কোনো রকমে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে?'

কয়েক মুহূর্ত পরে উত্তর দিল মাকড়শা, 'না।'

'তাহলে চোখ বুজে বসে আছেন কেন?'

'মাকড়শা ম্লান হেসে বলল, 'চোখ খোলা রেখেই বা কী করব?'

বহুদিন পরে সামান্য চমকে উঠল অনুপ। 'কেন, কী হয়েছে আপনার?'

ঠিক আগের মতো গলায় মাকড়শা উত্তর দিল, 'আজকাল চোখে আর ভাল দেখতে পাই না।'

'সে কি! আপনি কখনও বলেননি তো! এক্ষুনি আপনার চোখ দেখানো দরকার। ডাক্তারকে একটা কল্ দিই।'

'ন্‌না, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই।' সামান্য নড়েচড়ে বসে স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল মাকড়শা।

অনুপ ভাল করে জানে মাকড়শার 'না' মানে না-ই। একবার 'না' করলে ওকে 'হ্যাঁ' বলাবার সাধ্য নেই কারও।

কিন্তু মাকড়শার জন্যে কিছু একটা করা দরকার যাতে ও কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভাল বোধ করে। অনুপ বিনীত ভাবে বলল, 'চলুন না, দু-চারদিনের জন্যে কোনও জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায়?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মাকড়শা।

'কোনও পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে।'

শুনে মাকড়শা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। অনুপ ওর গম্ভীর হওয়ার কারণটা আন্দাজ করে বলল, 'তার চেয়ে চলুন কোনও জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি।'

কথাটা কানে যেতেই মাকড়শা কেমন যেন কেঁপে উঠল। তারপর চোখ বড়-বড় করে অনুপের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে বলল, 'জঙ্গল কি তোমার আর ভাল লাগবে?'

বহুদিন পরে অনুপের শরীরেও বিচিত্র এক উত্তেজনা খেলে গেল। ও বেশ জোর দিয়ে বলল, 'খুব ভাল লাগবে। তাহলে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।'

মাকড়শার আটটা পা নড়ে উঠল। 'কাউকে জানাবার দরকার নেই, চলো আমরা পালিয়ে যাই।'

তাই ঠিক হল।

পরদিন ভোরে কাক ডাকার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মাকড়শা আর অনুপ। একটা ট্যাক্সিতে চেপে সোজা স্টেশনে। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে দুজনে বেশ আয়েশ করে বসল। অনেক দিন পরে দুজনেই বেশ উত্তেজিত বোধ করছিল। ট্রেন ছাড়ার পরে সেই আগের মতো মন খুলে গল্প জুড়ে দিল মাকড়শা আর অনুপ।

লম্বা কয়েক দফা গল্পের শেষে সন্ধে এসে গেল। সন্ধের পরে রাত্তির। ঘুমে-গল্পে কেটে গেল রাত্তিরটাও।

পরদিন বিকেলে ওরা পৌঁছে গেল সেই তিতোরিয়ায়। মধ্যিখানে সুদীর্ঘ সময় কেটে গেছে। ভারতবর্ষের চেহারা পালটে গেছে আকাশ-পাতাল, অথচ তিতোরিয়ার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। সেদিনের কথা সব মনে পড়ে গেল অনুপের। তখন ও চাকরি করত, কোম্পানির কারখানার জন্যে সাইট দেখতে এসেছিল এখানে। ওই তো ওখানে ঝাপসা হরফে লেখা তিতোরিয়া নামের সেই ফলকটা।

ছবির মতো সেই জীবনের সবকিছু ভেসে উঠেছিল ওর চোখের সামনে। আর ভেসে উঠতেই এক ধরনের বেদনাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। বারবার মনে হচ্ছিল, সেই জীবনটা কত ভাল ছিল!

ওর কাঁধের ওপর ছটফট করছিল মাকড়শা। তাড়া লাগাল, 'কই, জঙ্গলে চলো।'

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরেছিল অনুপ। জঙ্গলটাও ঠিক সেই রকম আছে। চারদিকে ঠাসা গাছপালা, পায়ের নিচে লম্বা-লম্বা ঘাস। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত ঘন যে মাথার ওপরের টুকরো আকাশটাও হারিয়ে যাচ্ছিল।

গাছের ডালে কাঠবেড়ালি, গাছের নিচে বেজি দেখে ঠিক সেদিনের মতো সাপের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অনুপের, কিন্তু সেদিনের সেই ভয়টা এখন কয়েক হাজার মাইল দূরে। কাঁধের ওপরে উদাস হয়ে বসে আছে মাকড়শা। কখনো চোখ বড়-বড় করে চারদিকে তাকাচ্ছে, কখনো চোখ বুজে বসে আছে চুপ করে।

এমন সময় জঙ্গলের মধ্যে সন্ধের অন্ধকার নেমে এল ঝুপ্ করে। আকাশের একটা দিক টুকটুকে লাল। ওই আলোয় মেঘের টুকরোগুলো বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতায় খসখস, গাছের ওপরে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

অনুপ টের পাচ্ছিল মাকড়শার পাগুলো অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী, কী হয়েছে আপনার? গা এত গরম কেন?'

মাকড়শা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কান্নাজড়ানো গলায় নিজেদের ভাষায় বিড়বিড় করে কী সব যেন বলে গিয়েছিল।

কথাগুলো এত জড়ানো যে কিছুই বুঝতে পারল না অনুপ, কিন্তু ও একটা প্রশ্নও করল না।

আকাশের গাঢ় লাল রং ঝাপসা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। টুকরো মেঘের সেই

বাহার আর নেই। চাপ-চাপ অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। জঙ্গলের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, সেই গন্ধ এখন সর্বত্র।

হঠাৎ অনুপের কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের গাছের ডালে লাফিয়ে পড়েছিল মাকড়শা। তারপর খুব দ্রুত কয়েকটা চক্কর মেরে সেই সেদিনের মতো একটা জাল বুনে ফেলেছিল। জালের মধ্যিখানে আটটা পা ছড়িয়ে বসেছিল। সন্ধের ঝাপসা আলোয় মাকড়শাকে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, ঠিক সেই সেদিনের মতো!

মাকড়শাকে খুশি হতে দেখে অনুপের বুকের মস্ত একটা ভার নেমে গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেল, ওর শরীরে কোথাও আর সেই অবসাদ, ক্লান্তি নেই। শরীর, মন বেশ ঝরঝরে আর তাজা লাগছিল অনুপের।

মাকড়শা কোনও কথা না বললেও ওর দিকে তাকিয়ে অনুপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, মাকড়শা কখনোই আর তিতোরিয়ার এই জঙ্গল ছেড়ে শহরে ফিরবে না। কিন্তু অনুপ কী করবে এখন?

অনুপের কেমন যেন এক বিভ্রম তৈরি হয়েছিল। কোন্‌টা সত্যি? এই জঙ্গল, না জঙ্গলের বাইরের ধনী দেশ?

কিছু-কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো খুব সহজেই উঠে আসে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে-সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। অনুপ ওর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল নিঃশব্দে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক অনুপের মতনই কয়েকটা গাছ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাকড়শা ভরাট গলায় বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। এই জঙ্গলে এত রাত তোমার পক্ষে...।'

অনুপ বুঝতে পারল, মাকড়শা কী বলতে চাইছে! আর বোঝার পরেই ছেলেমানুষী এক অভিমান ওর বুকে আর গলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নিজেকে সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওর গলা কেঁপে গিয়েছিল। কোনওমতে বলল, 'চলে যেতে বলছেন তো, কিন্তু আমি যদি না যাই!'

শুধু শব্দে নয় কণ্ঠস্বরেও কিছু কথা থাকে। আড়ালের সেই কথাগুলো ধরে ফেলে মাকড়শাও বুঝি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে স্নেহের গলায় বলল, 'আমরা তো জঙ্গলেরই বাসিন্দা, কিন্তু তুমি কোন্‌ দুঃখে জঙ্গলে থাকবে?'

'দুঃখে থাকব! কোন্‌ দুঃখে? বিশ্বাস করুন, এই জঙ্গলে এসে আমার সব দুঃখ চলে গেছে। অনেকদিন পরে মনটা বেশ হালকা লাগছে।'

অনুপের কথায় বেশ খুশি হয়ে মাকড়শা ওর জালে গোটাকয়েক চক্কর মেরে বলল, 'তুমি এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন, দুনিয়াজোড়া তোমার ব্যবসা। সবকিছু ছেড়েছুড়ে এই জঙ্গলে থাকা কি তোমাকে মানায়?'

একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল অনুপ। 'আপনি বোধহয় চান না আমি এখানে থাকি।'

মাকড়শা আহত হয়ে বলল, 'ন্‌না, সে কথা আমি বলছি না। তবে সারা দেশে এখন প্রচণ্ড গোলমাল চলছে, এই অবস্থায় তোমার এখানে থাকা কি ঠিক হবে?'

'গোলমাল থামাবার লোকও আছে দেশে।'

'তারা কি পারবে?'

প্রশ্নের উত্তরে গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল অনুপ। এমন হাসি ও বহুদিন হাসেনি। হাসি থামলে ও বলল, 'গোলমাল না থামলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ভালই তো, আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসব। যেখানে ছিলাম সেখানে থেকে যা হোক কিছু শুরু করা যাবে আবার।'

নিজের জালে গোটাকয়েক চক্কর মেরে মাকড়শা হাসতে হাসতে বলল, 'মন্দ বলোনি!'

একটু পরে সমস্ত অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মস্ত চাঁদ উঠেছিল আকাশে। চাঁদের আলোর মধ্যে বইছিল ফুরফুরে বাতাস। আর সেই বাতাসে বুনো ফুল আর চারদিকের গাছগাছালির গন্ধ হঠাৎই ভীষণ তীব্র ও আচ্ছন্নকর হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বাসের জগৎ

টাকা ধার চাইবার জন্যেই রূপকের বাড়িতে এসেছে ময়ূখ, কিন্তু কথাটা কিছুতেই ওর মুখ থেকে বার হচ্ছিল না। বন্ধু হিসাবে রূপক খুবই কাছের, যে কোনও কথাই তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বলা যায়; কিন্তু সঙ্কোচ কাটাতে পারছিল না ময়ূখ।

রূপক খুব মজাদার স্বভাবের, বকতেও পারে অনর্গল। ছুটির দিন সকালে বন্ধুকে পেয়ে রাজ্যের গল্প ফেঁদে বসেছিল। বেশির ভাগ গল্পই মজার, কিন্তু মজার গল্প উপভোগ করার মতো মানসিকতা এই মুহূর্তে ময়ূখের ছিল না। বন্ধুর কথায় হুঁ-হ্যাঁ বলে সায় দিচ্ছিল, বন্ধু হাসলে হাসছিল; তবে কষ্ট করে। দুজনের আড্ডায় একজন প্রাণহীন হলে সে আড্ডা জমে না। রূপক হঠাৎ কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর কী হয়েছে বল্ তো! তখন থেকে অন্যমনস্ক হয়ে আছিস। কোনও ঝামেলা পাকিয়েছিস নাকি?'

আরও একবার ম্লান মুখে হাসল ময়ূখ। তারপর বলল, 'ঝামেলা আমি পাকাইনি, ঝামেলায় পড়েছি।'

'কী রকম?'

উত্তরে কেমন যেন ধাক্কা-মারা গলায় ময়ূখ বলল, 'তুই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিতে পারবি? এক তারিখেই টাকাটা শোধ দিয়ে দেব।'

জবাবে অট্টহাস্য করে উঠল রূপক! হাসির বেগ কমে আসার পর বলল, 'তুই অ্যাদ্দিনেও আমাকে চিনলি না! রোজগারপত্তর খুব একটা খারাপ করি না, কিন্তু স্বভাব তো সেই উড়নচণ্ডী-মার্কা। মাসের প্রথমেই সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে বসে থাকি।'

মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল ময়ূখের। ঢোক গিলে বলল, 'টাকাটা ধার করার জন্যই এসেছিলাম তোর কাছে। ঠিক আছে, উঠছি। দেখি, অন্য কোথাও পাই কি না।'

উঠেই পড়েছিল ময়ূখ, কিন্তু ওর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে রূপক বলল, 'হঠাৎ এতগুলো টাকা ধার করতে বেরিয়েছিস, ব্যাপারটা কী?

রীতিমত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল ময়ূখকে। 'মাকে কাল আবার নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে।'

'সে কী রে। গত মাসেই তো মাসিমা সুস্থ হয়ে নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরলেন।'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরেই বাড়িতে এনেছিলাম। দিব্যি ছিলেন। তবে ভাল থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। ডাক্তার কিছুদিন টানা বিশ্রাম নিতে বলেছিল, কিন্তু মাকে তো জানিস, চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। ভাল হয়ে গিয়েছি বলে সংসারের কাজকর্ম আবার আগের মতো শুরু করে দিয়েছিল। বারণ করলে শোনে না। তার ওপর আমি বাড়িতে কতক্ষণই বা থাকি। পরশুদিন বাড়ি ফিরে দেখি আবার বিছানা নিয়েছে।

পাড়ার ডাক্তারকে ডাকলাম। উনি দেখে বললেন, হার্টের পেশেন্টকে এ ভাবে বাড়িতে রাখা ঠিক নয়, হাসপাতালে নিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেলাম আগের সেই নার্সিং হোমে। ওখানকার ডাক্তারবাবু একটা দিন নার্সিং হোমে রাখার পরে আজ সকালে বললেন, এগুলো আজকেই করিয়ে নিন। নার্সিং হোমের পাশেই একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে। আগের টেস্টগুলো ওখান থেকেই করিয়েছিলাম। কত টাকা লাগবে জানার জন্য প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে ছুটলাম ওই সেন্টারে। প্যাথোলজিস্ট বলল, হাজার-পাঁচেক লাগবে। হাত খালি, গত মাসেই তো একটা বড় ধাক্কা গেছে। তা, তোর বাড়ি তো কাছেই, ভাবলাম তোর কাছে যদি পাওয়া যায়—।'

কথাগুলো বলার পরেই উঠে পড়েছিল ময়ূখ। রূপক পথ আটকে বলল, 'তা, তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস?'

'আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ঢুঁ মারব। মুশকিল হচ্ছে, বাড়তি নগদ টাকা তো সবার বাড়িতে থাকে না। আজ আবার ছুটির দিন, ব্যাঙ্ক বন্ধ।'

রূপক সহানুভূতিশীল বন্ধুর গলায় বলল, 'টাকাটা তো জোগাড় করতেই হবে, নগদ না পেলে চেকে পেমেন্ট কর।'

আরও একবার ম্লান মুখে হাসল ময়ূখ। 'ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার চেক অ্যাকসেপ্ট করে না। গতবার একটা পেমেন্ট আমি চেকে করতে গিয়েছিলাম, নেয়নি।'

'কেন নেয় না? ওদের ধারণা কি পেশেন্ট-পার্টি হলেই চেক বাউন্স করবে!'

তর্কের মধ্যে ঢোকার সময় বা ইচ্ছে ছিল না ময়ূখের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, 'আমি চলি এখন।'

হঠাৎই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রূপক। 'কিরণবাবুর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। নো প্রবলেম, টাকাটা এখুনি তোকে আমি ধার পাইয়ে দিচ্ছি। এক মিনিট, এক্ষুনি আসছি।'

লম্বা পা ফেলে ভেতরের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টে এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল রূপক। 'চল।'

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুবার পরে একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রূপক বলল, 'উঠে পড়।'

'কোথায়?'

'ওঠ না, বলছি।'

ওঠার পরে ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল রূপক, 'ভবানীপুর চলুন, একটু তাড়াতাড়ি যাবেন।'

ছুটির দিনের রাস্তাঘাট অন্যান্য দিনের তুলনায় ফাঁকা ফাঁকা, তার ওপর সকালবেলা। ট্যাক্সি বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বললাম তো ভবানীপুর।'

'না-না, কার কাছে?'

'কিরণবাবুর কাছে, কিরণ বসুচৌধুরী, গ্রেট ম্যান।'

'কে উনি? তোর কোনও আত্মীয়?'

রগুড়ে স্বভাব আবার ফিরে এসেছিল রূপকের মধ্যে। 'না-না, কোনও আত্মীয়-টাত্মিয় নয়, ইন ফ্যাক্ট, এর আগে ওঁকে দুবার মাত্র মিট করেছি আমি। এটা হবে আমার থার্ড ভিজিট।'

আঁতকে উঠে ময়ূখ বলল, 'তুই কি এই ভদ্রলোকের কাছে টাকা ধার চাইতে যাচ্ছিস?'

'তা-না হলে তোকে নিয়ে এখন ওখানে যাচ্ছি কেন? ভদ্রলোকের জবাব নেই। এমন মানুষ গোটা পৃথিবীতে বোধহয় একজনই আছেন। তোকে শুধু একটা কাজই করতে হবে। চটপট তোর প্রয়োজনের কথাটা জানিয়ে টাকাটা ধার চেয়ে বসবি।'

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ময়ূখের। 'অসম্ভব! চিনি না জানি না, এমন একটা লোকের কাছে প্রথম আলাপেই ধার চাইব! ট্যাক্সি দাঁড় করা, আমি নেমে যাব এখানে।'

বন্ধুকে আশ্বস্ত করার গলায় রূপক বলল, 'তোর সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। বুড়ো সত্যিই গ্রেট ম্যান। পরোপকার করার জন্য টাকার থলি নিয়ে বসে আছে। কারও উপকারে আসার সুযোগ পেলে বুড়ো খুশিই হবে।'

'না, অচেনা কারও কাছে আমার পক্ষে টাকা ধার চাওয়া অসম্ভব। আমি নেমে যাচ্ছি—।'

এবার একটু ধমকে ওঠার গলায় রূপক বলল, 'ছেলেমানুষি করিস না তো! তুই তো আর শখ করে টাকা ধার চাইতে যাচ্ছিস না। প্রয়োজনটার কথা মাথায় রাখ। তাছাড়া এর মধ্যে অসম্মানের কিছু থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম না। মানুষটা সত্যিই তুলনাহীন!'

'তুলনাহীন হোক আর যাই হোক। প্রথম আলাপেই কেউ কি কারও কাছে টাকা ধার চাইতে পারে। সম্ভব?'

নাটুকে গলায় হেসে উঠল রূপক। 'খুব সম্ভব। আমিই তো নিয়েছি। একবার নয়, দু-দুবার। আরও তিনবার নেব। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই সব টাকা শোধ দেওয়ার কোনও নিয়ম নেই।'

বন্ধুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল ময়ূখ। 'নিয়ম নেই, মানে!'

রূপক হাসল। 'নিয়ম নেই, মানে নিয়ম নেই। সত্যি আজব বুড়ো। এমন মানুষ দুনিয়ায় এক পিসই আছে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস—সাত পুরুষের বড়লোক। তিন কুলে এখন আর কেউ নেই। তবে কিছু টাকা রয়ে গেছে এখনও বুড়োর। কিছু মানে আমাদের কাছে বিরাট। আশি-পঁচাশি বছর বয়েস হয়েছে বুড়োর। আজ বাদে কাল টেঁশে যাবে। এখন একটাই বাতিক। বাতিকের নাম পরোপকার। পরোপকারের নানান ধারা আছে। বুড়ো পরের বিপদে টাকা ধার দেয়। নামেই ধার। ধার বলেই নাও, কিন্তু শোধ দেওয়ার বালাই নেই।'

একটু চটে উঠল ময়ূখ। 'খুবই খারাপ কাজ। একটা লোকের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো হচ্ছে।'

'না, না, ঠকানো নয়। বুড়োটা আমাদের অফিসের তরুণদার আবিষ্কার। তরুণদা খুব বিচক্ষণ লোক। বুড়োকে খুব ভাল ভাবে স্টাডি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। বলেছে, বুড়োর কাছ থেকে সেফ্‌লি পাঁচবার পর্যন্ত ধার নেওয়া যেতে পারে। তবে কখনোই বিরাট কোন অঙ্ক চাওয়া ঠিক নয়। আর ধারের টাকা প্রতিবারই আগেরবারের তুলনায় একটু কমাতে হবে। আমি প্রথমবার নিয়েছি দু-হাজার, পরের বার দেড় হাজার। আরও তিনবার আমি নিতে পারি। তারপরেই আমার কোটা শেষ।' কথাগুলো একদমে বলার পরেই বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠেছিল রূপক।

অস্বস্তিতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ময়ূখ। তারপর একটু কেটে কেটে বলল, 'তোদের অফিসের সবাই কি ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে লাইন লাগায়?'

'না-না, তরুণদা আমি ছাড়া অফিসের আর কাউকেই ব্যাপারটা জানায়নি। টপ সিক্রেট। তুই প্রথম লোক যাকে আমি এটা জানালাম।'

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল ময়ূখ, 'আমাকেও না জানালে পারতিস!'

'কেন জানাব না? তুই ভয়ঙ্কর একটা বিপদের মধ্যে পড়েছিস। আমি যদি টাকাটা জোগাড় করে দিতে পারতাম, তোকে সিক্রেটটা জানাবার দরকার হত না। কিন্তু আমি তা তো পারলাম না। আমি জানি, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গেলে তুই টাকাটা পেয়ে যাবি, কিন্তু টাকা জোগাড় করতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হত। টাকা জোগাড় করতে দেরি হওয়া মানে মাসিমার ট্রিটমেন্ট শুরু হতে দেরি হয়ে যাওয়া। আমি তোর সেই সময়টা বাঁচিয়ে দিচ্ছি।'

এবারও মুখ ফেরাল না ময়ূখ। 'এটাকে কি সময় বাঁচানো বলে! তুই তো ভদ্রলোককে ঠকাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিস।'

'ঠকানো কেন হবে? বুড়োর প্রচুর টাকা আছে। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। ভাল কাজে টাকা ধার দেওয়ার সুযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য বুড়ো আমার ওপর খুশিই হবে।'

আরও একবার বিরক্ত হল ময়ূখ। 'অদ্ভুত যুক্তি! এটা তোর মাথায় এল কোত্থেকে?'

'আমার মাথায় আসেনি। এটা তরুণদার রিপোর্ট, যাকে বলে স্টাডি-রিপোর্ট। বুড়োকে বেশ ভাল করে স্টাডি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তরুণদা। তোর মতো আমারও খটকা লেগেছিল প্রথমে, তবে আমি তর্ক জুড়িনি ওর সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা বিশ্বাসই করিনি। তরুণদার সঙ্গে বুড়োর কাছে যাওয়ার পরে দেখলাম—বাহ্! এ তো দারুণ মজা! পৃথিবীতে সত্যি অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। তবে আমার একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল!'

'হ্যাঁ, ভুলই তো। প্রথম দফায় দু-হাজার টাকা ধার না চেয়ে সাত হাজার চাইতে পারতাম। তারপর টাকার অঙ্ক একটু-একটু করে কমাতে কমাতে দু-হাজারে এসে থামা যেত। আমি প্রথমবার নিয়েছি দু-হাজার। দ্বিতীয়বার দেড় হাজার। আরও তিনবার ধার চাওয়ার কোটা আছে আমার। কিন্তু কম টাকা ধার নেওয়ার জন্য এত ধকল নেওয়া কি পোষায়? তরুণদা বার বার বলে দিয়েছে, মনে রেখো, তুমি মোট পাঁচবার ধার

চাইতে পারো। তবে দুটো শর্ত। কোন অবস্থাতেই শর্ত দুটো ভায়োলেট করা যাবে না। প্রথম শর্ত : ধারের অঙ্ক প্রতিবারই একটু একটু করে কমাতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত : কখনোই ওই ধার শোধ দেওয়ার চেষ্টা করবে না।'

'ধার বলে টাকা চাওয়া হচ্ছে, অথচ শোধ দেওয়া যাবে না! কেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তরুণদা বলেছিল, নিয়ম নেই।'

'কেন? নিয়ম নেই কেন?'

'আরে, তোর মতো আমি জেরা করিনি। কেন নিয়ম নেই, তরুণদা ভেঙে বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। টাকা ধার চাইলে পাওয়া যায়, এটাই তো একটা বিরাট খবর। তরুণদা যা শিখিয়ে দিয়েছিল, আমি বুড়োর কাছে গিয়ে সেই কথাগুলো শুধু উগরে দিয়েছিলাম।'

'কী বলেছিলি?'

'বলেছিলাম—খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি! বলতে খুব সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু তরুণদা আপনার কথা বলছিলেন—। বললেন, ওর কাছে গিয়ে একবার বলেই দেখ না। তাই এসেছি। একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। যদি হাজার-দুয়েক টাকা ধার দেন, খুব উপকার হয়। ব্যস, বুড়ো সিন্দুক খুলে টাকা বার করে দিল। পরের বার দেড় হাজার টাকা ধার চাওয়ার সময় ওই একই গত। শুধু একটা বাড়তি কথা ছিল। সেটাও তরুণদার শেখানো। বলেছিলাম, সব টাকা একসঙ্গে শোধ দিয়ে দেব। ব্যস, মুখের কথা খসাবার আগেই দ্বিতীয় দফার টাকাও এসে গিয়েছিল হাতে।'

সব শুনে ময়ূখের চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছিল একদম। গলাও শুকনো। শুকনো গলায়ও বলল, 'মরে গেলেও অচেনা কোনও মানুষের কাছে ওই ভাবে টাকা ধার চাইতে পারব না আমি।'

'কেন, অসুবিধে কোথায়? বুড়োকে তুই চিনিস না, ও তোকে চেনে না। তোর আজকের দেখাটাই হয়তো প্রথম এবং শেষ দেখা হবে। এখানে মান-সম্মানের ব্যাপার নিয়ে তুই অত ভাবছিস কেন? আমি যখন প্রথমবার গিয়েছিলাম, ওই ভাবেই ভেবে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—দিলে দেবে, না দিলে দেবে না। ব্যস, ব্যাপারটা ওখানেই শেষ। তাছাড়া, তরুণদার কাছে শুনে শুনে বুড়োটার সম্পর্কে আমার বেশ একটা কৌতূহলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঠিকানাটা ওর কাছ থেকে নেওয়াই ছিল, এক সন্ধেয় ঝোঁকের মাথায় হাজির হয়ে গিয়েছিলাম বুড়োর ডেরায়।'

'তুই তাহলে সত্যি-সত্যি বিপদে পড়ে টাকা ধার চাইতে যাসনি?'

গলা ফাটিয়ে হেসে উঠেছিল রূপক। 'বিপদ আমার মাসের শেষে প্রতি সন্ধ্যেতেই হয়। একটু-আধটু নেশাভাঙ করি। বার বা ক্লাবে আড্ডা মারার লোকজনও মজুত থাকে। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলে ওই সব আড্ডায় তো যাওয়া যায় না। সুতরাং বুড়োকে মিথ্যে বলিনি। ধার চাওয়ার ওই দুই সন্ধেয় পকেটে টাকাপয়সা ছিল না—এটাকে বিপদ ছাড়া আর কী বলা যায়? তবে তোর কেসটা তো জেনুইন। তুই তো বিপদে পড়েই টাকা ধার চাইছিস।'

এবার একটু উত্তেজিতই হয়ে পড়ল ময়ূখ। 'আমি তোর সঙ্গে যাব না। এই, ট্যাক্সি এখানে দাঁড় করাও।'

গলার স্বর আর এক পর্দা তুলে রূপক ট্যাক্সিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না-না, এখানে নয়, সোজা ভবানীপুর।' তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে গলায় রাজ্যের সহানুভূতি ঢেলে বলল, 'টাকাটা সত্যিই তোর দরকার। এই অবস্থায় তোকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলার জন্যে আমি কিরণবাবুর কাছে নিয়ে যাচ্ছি না। মানুষটি সত্যিই অসাধারণ। লোকের বিপদেআপদে দাঁড়ায়। তুই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবি কেমন মানুষ। এক মিনিটের মধ্যে আপন করে নিতে পারে। দেখবি তোর প্রয়োজনের কথা বলতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।'

'যত ভাল মানুষই হোক না কেন, প্রথম পরিচয়ে আমার পক্ষে কিছুতেই টাকা ধার চাওয়া সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, তোকে চাইতে হবে না; তোর হয়ে আমিই চাইব। তুই শুধু সঙ্গে থাকবি। এত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তুই শুধু একটা কথাই মাথায় রাখ—টেস্টের রিপোর্টগুলো যত তাড়াতাড়ি পাবি, মাসিমার চিকিৎসা তত তাড়াতাড়ি শুরু হবে।'

ট্যাক্সি হাজরার মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই রূপক ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার বাঁদিকের রাস্তাটা ধরুন।'

ট্যাক্সিকে বারকয়েক ডানদিকে, বাঁদিকে ঘোরানোর পরে রূপক বলল, 'ব্যস, সামনের ওই লাল রকটার সামনে দাঁড়ান।'

ট্যাক্সি থামতেই মুখ ছুটতে শুরু করল রূপকের, তবে সব কথাই চাপা গলায়। ওই যে সামনের বিশাল বাড়িটা দেখছিস, ওটাই কিরণবাবুদের বাড়ি। একসময় গোটা এলাকাটাই ওঁদের ছিল। সেকালের বিখ্যাত জমিদার। বাড়ির মাথায় পরি দেখছিস! এখন ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু এক সময় দুর্ধর্ষ ছিল বাড়িটাকে দেখতে। ঠিক এই জায়গাটায় ছিল পাথরের সিংহবসানো সদর দরজা। আগেরবার বুড়ো পুরনো দিনের একটা পেন্টিং দেখিয়েছিল আমাকে। এক সাহেবের আঁকা। আশেপাশে এই যে ঘিঞ্জি বাড়িগুলো দেখছিস, তখন এসবের চিহ্নও ছিল না। সামনে ছিল বাগান, ফোয়ারা। ওই বাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপওয়ালা জমিদার। আড়াইশো বছব আগেব বাড়ি, বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। সাত পুরুষের বাঙালি বড়লোকদের যা দশা হয়, তাই হয়েছে। গাদা-গাদা শরিক, ভাগ-বাঁটোয়ারা, তারপর বাড়ি-বাগান বিক্রি হয়ে যাওয়া। এই বাড়িটা বিরাট ওই প্রাসাদের টুকরো একটা অংশ। এ বাড়ির আর কোনও শরিক-টরিক নেই। একা থাকে বুড়ো। আর থাকে একগাদা চাকরবাকর। ওরা বোধহয় বংশ-পরম্পরায় রয়েছে। পুরনো জমিদারবাড়ির নায়েব-গোমস্তাদের বংশধরও হতে পারে।'

বন্ধুর ধারাবিবরণীর দিকে কান ছিল না ময়ূখের। ট্যাক্সি থেকে নামার পরেই লজ্জা-সঙ্কোচে ও জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। পুরনো আমলের মস্ত বাড়িটাকেও ভাল ভাবে দেখল না।

কথা বলতে বলতে সামনের ওই বাড়িটার দিকে এগোচ্ছিল রূপক। একটুখানি পথ, কিন্তু এই পথটুকু পেরুতে গিয়ে বেশ কয়েকবার পিছিয়ে পড়েছিল ময়ূখ। সেকেলে

বাড়ির বিশাল সেকেলে দরজা। দরজা ভেজানো ছিল। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রূপক বন্ধুকে ডাকল—'আয়।'

দরজার ঠিক সামনেই মস্ত বড় উঠোন। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। রূপক ওই উঠোনের দিকে এগোতে এগোতে আবার বলল, 'আয়।'

উঠোনের পাশ দিয়ে একটা খাড়াই সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দুই বন্ধু সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল। সিঁড়ির শেষে খুব চওড়া একটা বারান্দা। বারান্দা অনেকটা জায়গা নিয়ে গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে। বারান্দার চারদিকে একই ধাঁচের দরজাওয়ালা চারটে ঘর। একটু দোনামোনা করল রূপক, তারপর নিচু গলায় বলল, 'আয়, একদম শেষের ঘরের আগেরটা।'

দরজার সামনের রেলিংয়ের মাথায় পাখির একটা শূন্য খাঁচা ঝুলছিল। দরজাটা ভেজানো। দরজায় দুটো টোকা মেরে রূপক বলল, 'ভেতরে আসব?'

ভেতর থেকে কোনও সাড়া এল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর দরজায় আবার দুটো টোকা মেরে একই কথা বলল রূপক। তবে এবার ওর গলার স্বর আর একটু উঁচুতে উঠেছিল। ভেতর থেকে সাড়া এল এবার—'আসুন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রূপক। পেছন পেছন ময়ূখ। মস্ত বড় একটা ঘর। জানলার ধারে ইজিচেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। রূপক সটান এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'মেসোমশাই, আমি রূপক।'

কথাটার কোনওরকম প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল না বৃদ্ধের চোখেমুখে। ময়ূখ পরিষ্কার বুঝতে পারল, ভদ্রলোক রূপককে চিনতেই পারেননি। এই একটা তথ্যই হাত-পা ঠাণ্ডা করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়াই নয়, সেই সঙ্গে গলাও শুকিয়ে গিয়েছিল ময়ূখের।

রূপকও বুঝতে পেরেছিল ওকে চিনতে পারেননি ভদ্রলোক। সুতরাং নিজেকে চেনাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল ও। 'সপ্তাহ-দুয়েক আগে এসেছিলাম আপনার কাছে। তারও আগে একবার মাসখানের আগে। তরুণদাই পাঠিয়েছিলেন। তরুণদা মানে রাসবিহারী এভিনিউয়ের তরুণ সামন্ত।'

ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসেছিলেন ভদ্রলোক। চোখেমুখে একটু বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটে উঠেছিল। ময়ূখ বুঁঝতে পারল, তরুণ সামন্তের নামটাও কাজে আসেনি। হয়তো ওই লোকটাও এই মানুষটির কাছে একই রকমের অচেনা।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল ময়ূখের। কিন্তু হাতে-পায়ে এই মুহূর্তে তেমন সায় না থাকায় ইচ্ছেটা শুধুমাত্র মনের মধ্যেই থেকে গেল। মনে হল, রূপকের আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করে ফেলার মতো ভুল ও জীবনে আর একটাও করেনি।

রূপক অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাল ছাড়ল না। ছোট্ট একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলল, 'দিন-পনেরো আগে আপনার সঙ্গে এখানে বসে অনেক গল্প হয়েছিল। আপনি পুরনো দিনের একটা পেন্টিং দেখিয়েছিলেন, আপনাদের বাড়ির ছবি—এক সাহেবের আঁকা।'

ছবির কথা শুনে ঝলমলে হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধের মুখ। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, অসাধারণ ছবি। সে আমলের একজন বিখ্যাত পেন্টার সি এ কলিঙ্গের আঁকা। ছবিটা কিন্তু কমিশন্ড নয়, আমাদের তখনকার আমলের এই বাড়িটা দেখে সেই সাহেবের এতই ভাল লেগে গিয়েছিল যে, নিজে থেকেই আঁকেন। তারপর ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার আগে ছবিটা উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির কর্তাকে। ওটা আমাদের পারিবারিক সম্পদ। তখন তো ফোটোগ্রাফির খুব একটা চল্ ছিল না। ওই ছবিটা দেখেই আমরা জানতে পারি, আমাদের বাড়িটা ঠিক কেমন দেখতে ছিল! তবে মুশকিল কি জানো, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়া এমনই যে, তেমন ভাবে রাখতে না পারলে ছবির ক্ষতি হয়ে যায়। এ ছবিটারও হয়েছে। গত সপ্তাহেই কলকাতায় একজন পেন্টারকে দিয়েছি, ছবিটা মেরামত করে দেওয়ার জন্য। উনি অবশ্য কতটা কী করতে পারবেন জানি না। ছবিটা আমাদের সবারই খুব প্রিয়। শুধুমাত্র একটা মূল্যবান পেন্টিং বলে নয়, ছবিটা আস্ত একটা ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

নিজেকে চেনানোর একটা সূত্র বার করতে পেরে রূপকের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল। কাছাকাছি-রাখা তিনটে চেয়ারের একটায় বন্ধুকে বসিয়ে আর একটায় বসে পড়ল ও।

ময়ূখের অস্বস্তি কিন্তু একটুও কমেনি। ছবির কথা ভদ্রলোকের মনে পড়ার অর্থ এই নয় যে, রূপককে উনি চিনতে পেরেছেন।

বয়স্ক মানুষ মাত্রই একটু স্মৃতিকাতর হন। পুরনো দিনের নানান কথা তাঁদের মনে পড়ে, আর সে সব কথা বলতেও ভালবাসেন। ভদ্রলোককে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল ময়ূখ। বয়েস হয়তো আশি-পঁচাশি হবে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এককালে সুঠাম সুন্দর ছিলেন, এখন শুধু জীর্ণ কাঠামোটাই পড়ে আছে। তবে চোখেমুখে চমৎকার একটা প্রশান্তির ছাপ। ইজিচেয়ারটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়েশ করে বসে বললেন, 'চারপাশের সবই তো ছবি। কোনও ছবি আঁকা হয়, আর কোনও ছবি মাথার মধ্যে ধরা থাকে। আমাদের ছোটবেলার কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার আকাশ-পাতাল তফাত। এই যে রাসবিহারী এভিনিউ দেখছ, সাদার্ন এভিনিউ দেখছ; আজ থেকে আশি-নব্বই বছর আগে ওখানে কী ছিল বলো তো? আন্দাজ করো।'

রূপক আন্দাজের মধ্যে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কী ছিল?'

প্রসন্ন হাসি হেসে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, 'বিশাল এক হোগলার বন, যে ধরনের বন এখন সুন্দরবনের ভেতরে দেখা যায়। তা, সেই বন কেটে রাস্তা বানানো হল। কলকাতার সবচেয়ে চওড়া রাস্তা সাদার্ন এভিনিউ, ওই রাস্তার জন্ম হল তখন। তৈরি হল রাসবিহারী এভিনিউ। এসব কথা এখন বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু ইতিহাস তো আর মিথ্যে বলে না। আমাদের বাড়িটা ছিল সেই আমলের কলকাতার শেষ প্রান্তে। অসম্ভব নিরিবিলি, নির্জন। আমাদের বাড়ি ছিল কয়েক একর এলাকা নিয়ে। দূরে অল্প কয়েকটা বাড়িঘর। তখন কলকাতা বলতে ছিল উত্তর কলকাতা। তবে এখনকার উত্তর কলকাতা বলতে যা বোঝায় তা নয়। আজকের তুলনায় সামান্য একটা অংশ। আচ্ছা, এই যে বিরাট

মাপের রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাস্তা তৈরি হওয়ার আগে ওখানে কী ছিল বলো তো?'

'কী?'

'এখন বিশ্বাস করা কঠিন। দীনেন্দ্র স্ট্রিট বানাবার আগে ওখানে বিরাট এক জলাভূমি ছিল, কচুরিপানায় ভর্তি।'

অবাক বিস্ময়ে রূপক বলল, 'সত্যিই এখন বিশ্বাস করা যায় না। এসব কি আপনার নিজের চোখে দেখা?'

'সব নয়, তবে অনেক কিছুই দেখেছি। বেশ কিছু কাহিনী বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে শোনা। আবার অনেক ঘটনার শেষের দিকটা নিজের চোখে দেখা। তখন অবশ্য আমার ছেলেবেলা। তবে সেই ছেলেবেলার বহু দৃশ্য আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই। কেনই বা পাব না! সেই আমলের কলকাতা ছিল ছবির মতো সুন্দর। ভোরবেলায় লোকজন পথে বেরুবার আগে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদাররা ঝাঁট দিয়ে রাস্তা সাফসুফ করে দিত। দিনে দুবার ঝাঁট পড়ত রাস্তায়। একবার ভোরে, আর একবার বেলা দুটো-তিনটে নাগাদ। সাহেবপাড়া, মানে চৌরঙ্গিতে, জল দেওয়া হত না। ওখানকার রাস্তাঘাট পালিশ করা হত কেরোসিন তেল দিয়ে।'

চোখেমুখে বিস্ময় যেন ঠিকরে পড়ছিল রূপকের। 'বলেন কি! এ তো ভাবা যায় না। ফুটপাথও কি পালিশ করা হত?'

'না-না। সাহেবপাড়ার ফুটপাথে বড় বড় চৌকো পাথরের স্ল্যাব বসানো থাকত। এখনও কোথাও কোথাও সে সব পাথর আছে। তবে সাহেবপাড়ার ওই ঐশ্বর্য দিশি পাড়ায় ছিল না। দিশি মানুষদের পাড়ায় ফুটপাথগুলো ছিল মাটির তৈরি। তবে বেশ পিটিয়ে সুন্দর করে বসানো। বছরের একটা সময় ওই মাটির ফুটপাথ কাদায় প্যাচপেচে হয়ে যেত।'

'গাড়িঘোড়া যাওয়ার রাস্তা তো পাকা ছিল। আপনারা কি বর্ষাকালে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন?'

একটু চমকে ওঠার ভঙ্গি করে ভদ্রলোক বললেন, 'কাদা ভেঙে পেছল ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হত সবাইকে। রাস্তায় হাঁটলেই সর্বনাশ!'

'কেন? সর্বনাশ কেন?'

'ফুটপাথ পায়ে হাঁটার জন্য, রাস্তা ছিল গাড়িঘোড়ার জন্য। নিয়ম ভাঙলেই পুলিশে ধরত।'

'পুলিশ! কেন?'

'সাহেবদের আমলে সেটাই ছিল নিয়ম। প্রতি রাস্তার মোড়ে পুলিশ কমিশনারের বিজ্ঞপ্তি ঝুলত—চার ভাষায় লেখা বিজ্ঞপ্তি। লেখা থাকত, তেমন কোনও কারণ ছাড়া ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে শাস্তি পেতে হবে। এটা কোনও কথার কথা নয়, সব রাস্তাতেই পুলিশ থাকত। নিয়ম ভাঙলেই হাজত বা জরিমানা।'

গল্পে জমে যাওয়ার গলায় রূপক বলল, 'বলেন কি? ও ব্যাপারটা তো এখন একেবারে চুকেবুকে গেছে। এখন ইচ্ছে থাকলেও কেউ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে পারে না। ফুটপাথ

তো হকারদের দখলে। মাঝেমধ্যে রাজনীতির দাদাদের কেউ-কেউ আওয়াজ তোলেন, ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। নিরুপায় হয়ে লোকজন রাস্তা দিয়ে হাঁটে। চাপা পড়ে মারাও যায় অনেকে, কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। অনেকে দরদ দেখিয়ে বলে, বেচারা হকাররা করে খাচ্ছে, ওখান থেকে তুলে দিলে যাবে কোথায়! অতই যখন দরদ, রাস্তার মাঝখানে হকার বসিয়ে দিলেই তো হয়। এই ব্যাপারে আপনার মত কী?'

বৃদ্ধ মানুষটির মন বোধহয় অতীতেই পড়ে আছে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহই দেখালেন না।

ময়ূখ হাঁটু দিয়ে বন্ধুর পায়ে একটা খোঁচা মেরে কব্জি সামান্য উল্টে হাতঘড়িটা দেখিয়ে দিল। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট—আমরা বিশেষ একটা প্রয়োজনে এখানে এসেছি, তার কী হল?

খোঁচার জবাবে হাত একটুখানি তুলে বন্ধুকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করল রূপক। কিন্তু হাতের ওই মুদ্রায় ময়ূখের ভেতরের ছটফটানি দূর হল না একটুও।

বৃদ্ধ মানুষটি ঠিক আগের গলাতেই বললেন, 'কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে বহুদিন যাওয়া হয় নি। তবে শুনেছি কলকাতার এখনকার রাস্তাগুলোর মতো ওই রাস্তাটার অবস্থাও জীর্ণ। সেই আমলে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট ছিল দেখার মতো রাস্তা। চওড়া আর ঝকঝকে। রাস্তার দুধারে দশ-বিশ হাত অন্তর কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। গাছগুলোর মাথা লাল ফুলে ছেয়ে গেলে ওই রাস্তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। ছোটলাট, বড়লাট ব্যারাকপুরের লাট বাড়িতে যেতেন ওই পথ ধরেই। গোরা সৈন্যরাও ওই পথ দিয়ে মার্চ করতে করতে ক্যান্টনমেন্টে যেত। সে দৃশ্যও ছিল দেখার মতো। ওই যে একসময় কলকাতাকে বলা হত না—সেকেন্ড সিটি অব দি এমপায়ার, কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। একবারই আমি বিলেতে গিয়েছিলাম। নিজের ইচ্ছেয় নয়, বাবার চাপে। বাবা চেয়েছিলেন, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ি কিংবা আই সি এস দিই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওসব করতে গেলে যতটা অধ্যবসায় থাকা দরকার, তার সিকিভাগও আমার ছিল না। কিছু না করেই আমি বিলেতফেরত হয়েছিলাম। তবে তার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি মনের সুখে বিলেত দেশটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়েছিলাম। সত্যি, দেখার মতো দেশ। তোমাদের আমি অবশ্য এখন সেই বিলেত ভ্রমণের গল্প বলতে বসিনি। আমার প্রথম চমকটার কথা শুধু বলি। লন্ডনে পা দিয়েই মনে হয়েছিল—আরে! আমি কি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে কলকাতার চৌরঙ্গি অঞ্চলে এলাম! লন্ডনের ওই এলাকার চেহারা আর কলকাতার চৌরঙ্গির চেহারার মধ্যে বুঝি একচুলও তফাত ছিল না। হগ সাহেবের মার্কেটের কথা মনে করো। আমি এখনকার নতুন চেহারার নিউ মার্কেটের কথা বলছি না। আগুনে পোড়ার আগে নিউ মার্কেট তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই?'

ময়ূখের হাঁটুর আর একটা ধাক্কা খাওয়ার পরে রূপক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মানে না—।'

উত্তরের ধরনে একটু বুঝি অবাক হয়ে রূপকের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ মানুষটি।

একটা ঢোক গিলে রূপক বলল, 'আসলে, মানে, এখন একটা বিপদে পড়ে আপনার

কাছে এসেছিলাম। বিপদটা অবশ্য ঠিক আমার নয়, এর, ময়ূখের। ময়ূখ আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

লজ্জায় নীচের দিকে মাথা ঝুঁকে পড়েছিল ময়ূখের।

কিরণবাবু উদ্বিগ্ন মানুষের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বিপদ?'

ওপরদিকে মুখ না তুলেও ময়ূখ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

কথা গোছাবার জন্য রূপক বোধহয় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিল, তারপর গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ময়ূখ আমার খুব পুরনো বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম আমরা। ঘণ্টাখানেক আগে আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কী রে, সাতসকালেই। ও কিছুতেই মুখ খুলতে চাইছিল না। শেষে খুব চাপাচাপি করার পর বলল, খুব বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী বিপদ?'

বৃদ্ধ মানুষটির গলায় উদ্বেগের মাত্রা একটু বেড়ে গিয়েছিল। 'হ্যাঁ, বিপদটা কিসের?'

'ওর মা হার্টের পেশেন্ট। কাল নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। ডাক্তারবাবু আজ সকালে জানালেন—অনেকগুলো টেস্ট করতে হবে, আজকেই।'

কিরণবাবুর গলায় উদ্বেগের মাত্রা বোধহয় আর একটু বাড়ল। 'হার্টের প্রবলেম দেখা দিলে ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। ডাক্তারবাবু দিচ্ছেনও নিশ্চয়ই, তবে তোমাদেরও এখন কাছাকাছি থাকা দরকার। কখন কী দরকার পড়ে বলা যায় না। মা ভাল হয়ে গেলে আর একদিন এসো, অনেকক্ষণ ধরে গল্প করা যাবে।'

বিষয়টা হঠাৎই অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে ব্যস্তসমস্ত গলায় রূপক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, না, মানে ওর এখনকার অসুবিধাটা অন্য ধরনের।'

কিরণবাবু পাল্টা কোন প্রশ্ন করলেন না। ময়ূখের মুখ আগের মতোই নীচের দিকে ঝুঁকেছিল। ঘামে ওর গেঞ্জি একেবারেই ভিজে গেছে।

রূপক আর একবার গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আজ রোববার তো, মুশকিলটা সেই জন্যই। আমার বাড়িতেও কিছু ছিল না। তা, আমি বললাম, ঘাবড়াবার কী আছে, কিরণবাবুর কাছে চল, একটা উপায় ঠিক হয়ে যাবেই।'

কিরণবাবু এবারও কিছু বললেন না।

রূপক আগের কথার খেই ধরে দ্রুত গতিতে বলে ফেলল, 'অনেকগুলো টেস্ট করাতে হবে। টেস্টগুলো নার্সিংহোমে হবে না। একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হবে। ওখানে আবার চেকে পেমেন্ট করা যায় না। ক্যাশে দিতে হবে। আমাদের কাছে এখন অত টাকা নেই। তা, আপনি যদি এখন আমার বন্ধুকে হাজার-পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারেন।'

একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন এবং অসহিষ্ণু শোনাল কিরণবাবুর গলা। 'কী আশ্চর্য! এই দরকারি কথাটা তোমরা আমাকে এতক্ষণ বলতে পারোনি! ছি-ছি-ছি, অকারণে কতটা সময় নষ্ট হল বলো তো!' ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে উনি ঘরের কোণের দিকের আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

রূপক কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মারল বন্ধুকে। ময়ূখ জড়সড় ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাতেই রূপক চোখ টিপে এমন একটা ইঙ্গিত করল যার একটাই অর্থ—কীরে, কী বলেছিলাম তোকে!

মেহগনি কাঠের কারুকার্য করা বিশাল আলমারি। ওই আলমারিটা খুললেন ভদ্রলোক। কেমন যেন বিভ্রান্ত মানুষের চোখে ওই দিকে তাকাল ময়ূখ। আলমারির ভেতরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। একধারে স্টিলের তৈরি পুরনো আমলের বড়সড় একটা হাতবাক্স। ড্রয়ার থেকে চাবি বার করে ওই বাক্স খুলে টাকা বার করলেন ভদ্রলোক, তারপর সেই টাকা নিয়ে এসে এমন ভাবে ময়ূখের হাতে দিলেন, যেন ও ছাড়া আর কেউ এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা দেখতে না পায়।

বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ময়ূখ। কোনও মতে বলল, 'আপনার যদি এখন কোনও অসুবিধে থাকে, আমি বরং অন্য কোনও জায়গা থেকে।'

কথাটা শুনে রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন কিরণবাবু। 'না-না, ও কী কথা! টাকাটা তো এই মুহূর্তে আমার কোনও কাজে লাগছে না, ওদিকে তোমার এত বড় বিপদ!'

ময়ূখের বিহ্বলতার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। 'তা ঠিক, কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে এসে আপনাকে বিব্রত করা—।'

কথাটা শুনে বিব্রতই হলেন কিরণবাবু। 'মানুষের বিপদের সময় মানুষই তো পাশে এসে দাঁড়ায়। আমি তো নিমিত্তমাত্র। ঘটনাচক্রে তুমি আজ আমার কাছে এসেছ। আমি না থাকলে আর একজন ঠিক এগিয়ে আসত। এটাই নিয়ম। বলতে পারো ভগবানের বিধান। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন।'

ময়ূখ এ কথার কোনও উত্তর খুঁজে পেল না।

কিরণবাবু ইজিচেয়ারে আস্তে আস্তে বসে পড়ে বললেন, 'আমার তো অনেক বয়েস হল। এই বয়েস বাড়ার সুবাদে মানুষ অনেক কিছু দেখতে পায়, জানতে পারে। আমার নিজের জীবনে এইরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। বিপদে পড়েছি। ভোগান্তি হয়েছে। কিন্তু এক সময় না এক সময় দেখেছি, বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য কেউ-না-কেউ হাজির। বহুকাল হল বিপদে পড়ার পরে উদ্বিগ্ন হওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। জানি, বিপদ আসে আবার কেটেও যায়। পরীক্ষার জন্য যিনি বিপদে ফেলেন, উদ্ধারের রাস্তাটা তিনিই আবার ঠিক করে রাখেন।'

ময়ূখের গায়ের গেঞ্জি ঘামে ভিজে গিয়েছিল পুরোপুরি, কিন্তু শরীরের সেই অস্বস্তি এখন আর নেই। হাতের মধ্যে পিন করা ঝকঝকে একশো টাকার নোটের বান্ডিল। বান্ডিলের দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'মাস ফুরোতে এখনও দিন-সাতেক বাকি, আমি ঠিক এক তারিখে এসে টাকাটা দিয়ে যাব। তবে আপনি যদি আরও আগে চান, তাও দিতে পারি।'

কথাটা শুনে অসম্ভব কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন কিরণবাবু। 'না-না, সাত-তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়ার কথা ভেবে টাকাটা আমি দিইনি। তোমার মায়ের বিপদ কাটানোটা

দরকার সবার আগে। তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে বেশ লাগছিল. কিন্তু এখন তোমাদের আর আটকানো ঠিক নয়।'

উঠে পড়ল ময়ূখ। 'ঠিক আছে, চলি তাহলে। পরে তো আসছিই, তখন আবার গল্প করা যাবে। বেশ লাগছিল আপনার কথা শুনতে।'

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ময়ূখ। পেছন পেছন রূপক। রাস্তায় বেরুতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। প্রায় ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল ময়ূখ।

রূপক সাফল্যের হাসি হেসে বলল, 'আমার এদিকে একটা কাজ আছে। সেরে ফিরব। রাত্তিরে যাচ্ছি তোর বাড়িতে।' ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করে জানলায় মুখ রেখে রূপক ওর চকচকে চোখ নাচাল। 'আমার কথা বিশ্বাস হল তো এবার! এই বুড়োটার মতো আজব চিজ গোটা পৃথিবীতে বোধহয় আর এক পিসও নেই।'

কথাটা ঠিক চাবুকের মতো ময়ূখের পিঠে পড়েছিল। তীব্র বিতৃষ্ণায় ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার উদ্দেশে গলা তুলে বলল, 'চলুন।'

।। দুই।।

রাত সাড়ে ন'টা। বিকেল থেকেই গুমোট শুরু হয়েছিল, এখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝেমধ্যে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার চমৎকার ঝলক ভেসে আসছিল। রোববারের খবরের কাগজ অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ মোটাসোটা থাকে। কিন্তু সকালের ভাঁজ-করা কাগজ যে ভাবে ঘরে ঢুকেছিল সেই ভাবেই পড়ে আছে। কাগজটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে হেডিংগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল ময়ূখ। সারাদিন বিস্তর ধকল গেছে, রয়েবসে কাগজ পড়া আর হয়ে উঠল না। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল রূপক। বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল ময়ূখ। 'আয়, আয়।'

ঘরে ঢুকেই রূপক জিজ্ঞেস করল, 'মাসিমা কেমন আছেন রে?'

'আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল। আমি তো একটু আগেই নার্সিংহোম থেকে ফিরলাম।'

'টেস্টগুলো কী সব করার ছিল—হয়ে গেছে?'

''হ্যাঁ, রিপোর্টও পেয়ে গিয়েছি। বড় ধরনের কোনও গোলমাল নেই। ডাক্তারের চিকিৎসাও শুরু হয়ে গেছে। নার্সিংহোমে রাতের খাবার দেয় সাড়ে-সাতটা নাগাদ। মা'র খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে আমি বেরিয়েছি।''

'ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিল মিটিয়েছিস?'

'বিলটিল নয়, টাকা আগেই দিতে হয়।'

'পাঁচ হাজারে কুলিয়েছিল তোর?'

'হ্যাঁ, চার হাজার নশো পঁচিশ। কত লাগবে আমি তো আগেই জেনে এসেছিলাম।'

'নার্সিংহোমের টাকা?'

'নার্সিংহোম আমার চেনা। ডিসচার্জ করার সময় টাকা মেটালেই চলবে।'

'ক-দিন থাকতে হবে নার্সিংহোমে? ডাক্তার বলেছে কিছু?'

''বলেছে। আরও দিনতিনেক। তা, আমি ডাক্তারবাবুকে বলে এসেছি, দিন সাত-আটকে রাখবেন। চাপে পড়ে বেড রেস্ট হবে। বাড়িতে তো বিশ্রাম নেবে না। সংসার-সংসার করে অকারণ খাটাখাটুনি শুরু করে দেয়। বাড়িতে তো আমরা দুটো প্রাণী। তার ওপর একটা কাজের লোক আছে, কিন্তু কাজের লোকের কাজে মন ওঠে না মা'র। বিধবা মানুষ। ইদানীং আবার ছোঁয়া-ছুয়ি বড্ড বেড়ে গেছে। তার ফলে এক কাজ দুবার করে সারে। বিশ্রামটা যে ওর পক্ষে কত দরকারি, এবার ডাক্তারবাবুকে দিয়ে একটু ভাল করে বোঝাতে হবে। চা খাবি তো?'

'বল। না-না, কফিই খাব।'

চেয়ারে বসেই গলা তুলে দু-কাপ কফি বানাবার কথা বলে দিল ময়ূখ। তারপর বন্ধুর হাত ধরে বলল, 'তুই সত্যি আজ আমার যা উপকার করলি না—। ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে যেই বলেছিল টেস্টগুলো করাতে হাজার-পাঁচেক লাগবে, আমার তো হয়ে গিয়েছিল। তুই আমাকে হেল্প না করলে টাকার জন্য কোথায় না ছুটতে হত কে জানে!'

বন্ধুর হাতটা নিয়ে নাচাতে-নাচাতে রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে উত্তর দিল রূপক, 'কী রকম একটা জিনিসের কাছে তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম বল। এ যেন মধুসূদনদাদা-মার্কা বুড়ো। যা চাও তাই পাবে। তবে খবর্দার। এই বুড়োর কথা আর কাউকে জানাবি না। আমাদের গোটা অফিসের মধ্যে তরুণদা শুধুমাত্র আমাকেই বলেছে। আমি তোকে বললাম। ব্যস, আর কেউ নয়। পাঁচকান হওয়া মানেই বুড়োর কাছে ধার চাওয়ার লোক বেড়ে যাওয়া। বুড়োর তিনকুলে কেউ নেই, কিন্তু সিন্দুকে বেশ কিছু টাকা আছে। তবে ধার নেওয়ার লোক বেড়ে গেলে ওই টাকা ফুরোতে কতক্ষণ! আমি দুবার ধার নিয়েছি, আরও তিনবার নিতে পারি। তোর তো মোটে একবার হল, আরও চারবার নিতে পারবি আরামসে। তরুণদার পাঁচবারই নেওয়া হয়ে গেছে। তার মানে ওর কোটা শেষ। সত্যি আজব বুড়ো। কাউকে এর কথা বললে বিশ্বাস করবে না। তুই করেছিলি?'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ময়ূখ বলল, 'না। তবে উনি যা করলেন তা শুধুমাত্র ঋষিতুল্য মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। চেনেন না শোনেন না, অথচ এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়ে দিলেন।'

অট্টহাস্য করে উঠল রূপক। 'তোর কাছে যে ঋষি, আমার কাছে সে ক্ষ্যাপা। ক্ষ্যাপা না হলে নিজের টাকা কেউ কি এ ভাবে ওড়ায়!'

বন্ধুর কথা শুনে রীতিমত আহত হয়েছিল ময়ূখ। 'তোর কাছে যিনি ক্ষ্যাপা, আমার কাছে তিনি ঋষি। কিংবা ঋষির চাইতেও বড় কেউ।'

আর একবার বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠল রূপক। 'ঋষির ওপরের গ্রেডে কে থাকে? দেবতা?'

গম্ভীর মুখে উত্তর দিল ময়ূখ। 'হ্যাঁ, দেবতা বললেও ভুল বলা হয় না। আমার বিপদের দিনে উনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, তাতে ওঁকে অনায়াসেই দেবতার জায়গায় বসানো যায়।'

রূপকের হাসি যেন ফুরোচ্ছিলই না। লম্বা হাসির শেষটুকু গিলে ফেলে বলল, 'দেবতা ভাবাই ভাল। দেবতা ভেবে নিলে পরের বার থেকে হাত পাততে আর সঙ্কোচ হবে না। পরের বার তুই সাড়ে-চার হাজার চাইবি।'

আগের চাইতেও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ময়ূখ। 'কেন?'

'কারণটা তো বলেইছি। আরও একবার শুনে নে ভাল করে। বুড়োর কাছে মোট পাঁচবার ধার নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিবারই টাকার অঙ্ক কমাতে হবে একটু-একটু করে। তুই এক কাজ কর, পাঁচশো করে কমা। দ্বিতীয়বার সাড়ে চার, তৃতীয়বার চার—এইভাবে। মোট পাঁচবার ধার নেওয়া যেতে পারে। ওদিকে আবার শোধ দেওয়ার কোন পাট নেই।

সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ময়ূখ। 'কেন শোধ দেওয়ার পাট নেই কেন? টাকাটা তো উনি সাহায্য হিসাবে দিচ্ছেন না। ধার বলেই চাইছি, ধার হিসাবেই উনি দিচ্ছেন, অথচ শোধ দিতে হবে না।'

'নিয়ম নেই।'

'অদ্ভুত কথা! কী নিয়ম নেই।'

'তরুণদা বলেছে, ফালতু কথা বলার লোক নয় তরুণদা। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব একদিন। তরুণদা বুড়োটাকে খুব ভাল ভাবে বাজিয়ে নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। পাকা লোকের পাকা সিদ্ধান্ত। খোঁচালে হয়তো ভেতরের কারণগুলো বলত, আমি খোঁচাইনি। মোদ্দা কথা হল, কাজ হচ্ছে কি না দেখা। আমারও হয়েছে, তোরও হয়েছে। তুই পরের বার সেফলি সাড়ে-চার চাইতে পারিস। আরে বাবা, এটা ভেরিফায়েড ট্রুথ।'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ময়ূখ বলল, 'আমি আর এক পয়সাও ধার চাইব না ভদ্রলোকের কাছ থেকে। সামনের মাসের এক তারিকেই যাচ্ছি ওঁর কাছে।'

'কেন?'

একটু বিরক্ত হয়ে ময়ূখ বলল, 'পাঁচ হাজার টাকা শোধ দিতে।'

'না-না। যাস না।'

'অদ্ভুত! কী যা-তা বলছিস তখন থেকে।'

'একজন টাকা শোধ দিতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছিল।'

'কী ঝামেলা?'

'তরুণদা ভেঙে বলেনি। তবে একজন ঝামেলায় পড়েছিল। হয়তো তার থেকেই তরুণদা নিয়মটা জেনেছে।'

কফি এসে গিয়েছিল। রূপক কফির কাপে চুমুক দিয়ে আরামের শব্দ বার করে বলল, 'বাহ্! বেড়ে বানিয়েছে তো। কী কফি রে?'

ময়ূখ কোনও উত্তর না দিয়ে কফির বাকি কাপটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'তুই কি লোকের কাছ থেকে ধার নিয়ে টাকা শোধ করিস না?'

অবাক হওয়ার সবরকম চিহ্ন ফুটে উঠেছিল রূপকের চোখেমুখে। 'কেন দেব না?

ইন ফ্যাক্ট ধার করা টাকা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত আমার ভেতরটা খচখচ করতে থাকে।'

'তাহলে কিরণবাবুকে টাকাটা শোধ না দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে বার বার ইনসিস্ট করছিস কেন?'

আর একবার অবাক হল রূপক। 'তুই ভুল বুঝছিস। এই বুড়োর টাকা শোধ না দেওয়ার সঙ্গে আর পাঁচটা নিয়মের কোনও মিল নেই। বুড়োটা ক্ষ্যাপা, ছন্নছাড়া গোছের। আচ্ছা, তুই বুড়োর মতো আর একটা কেস বার করত দেখি। বুড়ো আমাকে তো চিনতেই পারেনি প্রথমে। আমার রেফারেন্সে আবার তুই গিয়েছিস। এই রকম অবস্থায় কোনও লোক এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা বার করে দেয়? টাকা তো অনেকেরই আছে, ওই বুড়োর চাইতে ঢের বেশি টাকা। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে অচেনা লোককে তারা কি দু-দশটা টাকাও ঠেকাবে? তুই ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখ। লোককে আমি ঠকাবার পরামর্শ দিচ্ছি না তোকে। তবে এই বুড়োটার সঙ্গে আর কারও কোনও মিল নেই। এর ব্যাপারে নিয়ম-টিয়মগুলো এক্কেবারে আলাদা।'

কথার কোনও উত্তর দিল না ময়ূখ। চুপচাপ কফি খেয়ে যেতে লাগল।

রূপক মুখ খুলল আবার। 'তবে মানুষটা খুবই ইন্টারেস্টিং। জমিয়ে গল্প করতে পারে। পুরনো দিনের কথা একবার তুললে আর থামতেই চায় না। অবিশ্যি বড্ড ভগবান-ভগবান করে, শিগ্‌গিরই টেঁশে যাবে না তো?'

অসন্তুষ্ট হয়ে ময়ূখ বলল, 'তুই এবার ভদ্রলোককে বাদ দিয়ে অন্য কথা বল্‌ তো।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়ল রূপক। রাজনীতি নিয়ে কিছুক্ষণ একতরফা বক্‌বক্‌ করার পরে খেলার কথায় এল। বলল, 'টেস্ট ক্রিকেট তুলে দেওয়া উচিত। আটারলি বোরিং। কি সাঙ্ঘাতিক এনার্জি নষ্ট হয় বল তো! একজন পেস বোলার প্রায় একশো গজ দৌড়ে এসে গায়ের জোরে বল করল। অফের বল, ব্যাটসম্যান মারার চেষ্টাই করল না। পরের বল আবার সেই একশো গজ দূর থেকে ছুটে প্রাণপণে ছোড়া। বলটা একটু বাউন্স করেছিল, ব্যাটসম্যান বসে পড়ে মাথার ওপর দিয়ে বলটা চলে যেতে দিল। এই ভাবে পাঁচটা বল ছেড়ে দেওয়ার পর শেষ বলে ঠুকুস্‌। কী পণ্ডশ্রম বল তো! ওদিকে দর্শকরা গোটা দিনটা মাঠে বসে হাই তুলছে। একদিনের ক্রিকেট না এলে ক্রিকেট খেলাটাই হাওয়া হয়ে যেত। তাই না?'

বন্ধুর কথায় মুচকি-মুচকি হাসছিল ময়ূখ।

রূপকের গল্পের স্টক ফুরোয় না কখনো। খেলার পরেই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কথায় এল। বলল, 'এই এক ব্যবসা বেরিয়েছে আজকাল। ডাক্তাররা রোগের লক্ষণ দেখে, নাড়ি টিপে আজকাল আর ওষুধ দেয় না। চেম্বারে গেলেই লম্বা রাইটিং প্যাডের পাতায় মস্ত এক ফর্দ ধরিয়ে দেয়। একগাদা টেস্ট করিয়ে আসুন। অনেকে আবার কোত্থেকে করানো হবে, তাও বলে দেয়। এই সেদিন খবরের কাগজের একটা চিঠিতে দেখলাম, টেস্টের ঠ্যালায় এক ভদ্রলোকের সাঁইত্রিশ হাজার টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। অথচ ডাক্তার রোগ ধরতে পারেনি। এগুলোকে কী বলে জানিস? পার্সেকটমি, তার মানে পার্স কাটা। পার্স কাটা আর গাঁট কাটার মধ্যে কোন তফাত নেই।'

মৃদু আপত্তির গলায় ময়ূখ বলল, 'মা'র ওই টেস্টগুলো কিন্তু খুব দরকারি ছিল।''

জিভ কাটল রূপক। 'না-না। মাসিমার কথা বলছি না। ওই ডাক্তারবাবু তো তোদের অনেক দিনের জানাশোনা, উনি এসব করবেন না। তবে শোনা যায়, বহু ডাক্তারের এটা এখন রেগুলার প্র্যাকটিস। আমি একটা কেস জানি। রুগির পায়ের নখে ঘা হয়েছে, আর ডাক্তার মাথার দুটো এক্সরে করার অ্যাডভাইস দিয়ে বসে আছে। একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সোর্স থেকে জানতে পেরেছি—এই ধরনের কেস পাঠালে ডাক্তারদের নামে বন্ধ খামে কমিশন আসে।'

ময়ূখ হাসতে হাসতে বলল, 'তুই এক কাজ কর, চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার খোল। ঘাঁতঘোত যখন জানাই আছে, মাস গেলে মোটা রোজগার হবে। নো ধারবাকি।'

রূপক সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'আমার সত্যিই ইচ্ছে ছিল। খোঁজখবরও নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট দরকার। এক একটা মেশিনের যা দাম না!'

'এসব ব্যাপারে স্পনসর, ফিনানসিয়ার ধরা যায় না?'

চকচকে মুখ করে উত্তর দিল রূপক, 'কিরণবাবুকে ধরলে কেমন হয়? বুড়োর প্রচুর টাকা আছে। এখানে আমার বাড়তি সুবিধে হল, বুড়োর কাছ থেকে এই ব্যাপারে টাকা নিলে সেই টাকা শোধ দেওয়ার দায় থাকছে না। বুড়োর মনে হয় তোকে খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে, চল্ দুজনে মিলে একদিন গিয়ে পটাই।'

আবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল ময়ূখ।

মাঝে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রূপক বলল, 'ধরেছে বোধহয়। কেটে পড়ি এবার, পরে আসব।'

।। তিন।।

এ'কদিন ময়ূখের প্রধান কাজ ছিল একবার সকালে আর একবার সন্ধেয় নার্সিংহোমে ছোটা। মা ভাল আছেন। বিছানায় বসে ছেলের সঙ্গে গল্প করেন। তবে গল্পের মাঝেমধ্যে একটা কথা ফিরে আসে বারবার। বলেন : আমি ভাল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এবার তুই বাড়ি নিয়ে চল। ময়ূখের উত্তরটাও গতবাঁধা : আমি তো তোমাকে নিয়ে যেতেই চাই, কিন্তু ডাক্তারবাবু ছাড়তে চাইছেন না। আর ক'টা দিন, মানে সামনের মাসের দু তারিখে নিয়ে যাব। তবে ফিরে গিয়েও তোমাকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। রান্নাঘরের দিকে একদম পা বাড়ানো চলবে না। মা বাধ্য মেয়ের মতো সায় দেন।

দু'তারিখের আগে এক তারিখ। এক তারিখে মাস মাইনেটা পকেটে আসতেই ময়ূখের শরীরে একটুখানি অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই ও জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। ভরদুপুরেই যেন সন্ধে নেমে এসেছে। মেঘে ঢাকা কুচকুচে কালো আকাশ। যে কোনও মুহূর্তেই তুমুল বৃষ্টি নামতে পারে। বর্ষাকালের বৃষ্টি, একবার শুরু হলে কখন থামবে কে জানে। কিন্তু মনে মনে ওর প্রতিজ্ঞাটা দানা বেঁধে উঠছিল।

আকাশ ভেঙে পড়লেও আজ অফিসের পরে ও ধারের টাকা শোধ করার জন্য কিরণবাবুর বাড়িতে ছুটবে। একটা খামে পাঁচ হাজার টাকা ও আলাদা করে রেখে দিয়েছিল।

আকাশে মেঘের যা ঘনঘটা, প্রচণ্ড বৃষ্টি নামার কথা। তবে তেমন বৃষ্টি নামল না। হালকা বৃষ্টি অবশ্য হয়েই যাচ্ছিল।

অফিসের শেষে ময়ূখ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কেমন যেন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে ওই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ও। কিরণবাবুর বাড়িতে আজ যেতেই হবে। কাছেই একটা ফলের দোকান, বেছে বেছে দু-কেজি আপেল কিনল, তারপর পলিপ্যাক ভর্তি আপেলগুলো নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু জোরে না পড়ার জন্য রাস্তায় জলটল বিশেষ জমেনি। পথে লোকজন, গাড়ির সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। হয়তো এটা তুমুল বৃষ্টির ভয়েই। ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সি বেশ জোরেই ছুটছিল। হাজরা পর্যন্ত চেনার কোনও অসুবিধা নেই, তারপরেই গোটাকয়েক রাস্তার বাঁক। শেষ রাস্তার মুখে এসে ডানদিকের বদলে বাঁদিকে ঢুকে পড়েছিল ময়ূখ। কিন্তু একটু ঘোরাঘুরি করার পরেই পুরনো দিনের বিশাল সেই বাড়িটার সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিন যেখানে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল, আজকেও ঠিক সেখানেই নামল।

সেদিন অবশ্য ও বাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখেনি। দেখার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। আজ দেখল। বিরাট বাড়ি, কিন্তু ঠিক ভাবে বাড়ি দেখাশোনার ব্যাপারটা বোধহয় অনেককালই বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে রং ফেরানো হয়নি বহু বছর। জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। লম্বা কার্নিশের রেনওয়াটার পাইপের পাশে বেশ কয়েকটা বটের চারা বেরিয়েছে। বাড়ির মাথার ভাঙাচোরা পরির দশা এখন অনেকটা ডাইনির মতো।

মস্ত বাড়ির মস্ত দরজা সেদিনের মতোই ভেজানো। এগিয়ে এসে দরজায় টোকা মারল ও, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না। বাড়ির ভেতরের ছবিটা পরিষ্কার মনে আছে ময়ূখের। লম্বা গলি, তার পরে মস্ত উঠোন। সেদিন কোনও লোকজন চোখে পড়েনি। হয়তো বাড়ির কাজের লোকেরা অনেক ভেতরের ঘরগুলোয় থাকে। দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ এখান থেকে তাদের কানে পৌঁছনো কঠিন।

কোনও কলিং-বেলটেল নেই। দরজার মাথার দিকে তাকাল ময়ূখ। না, বেলের কোনও চিহ্নও নেই। দরজায় মস্ত কড়া লাগানো। কড়া নাড়তে লাগল ও। প্রথমে আস্তে, থেমে থেমে। তারপর জোরে এবং বিরামহীন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আধবুড়ো গোছের একটা লোক এসে দরজা খুলল। ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, 'কিরণবাবু আছেন?'

লোকটা অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি তো দোতলায় থাকেন।' তারপর আর কিছু না বলেই উল্টোমুখে হাঁটা দিল।

ময়ূখ বুঝতে পারল কিরণবাবুর কাছে যারা আসে, তারা সরাসরি ওপরেই উঠে যায়।

দরজা বরাবর লম্বা করিডর। তারপর বিশাল উঠোন। উঠোন ঘিরে চওড়া বারান্দা। সেদিন ও এতই সঙ্কুচিত হয়ে ছিল যে, উঠোনের দিকে ভাল করে তাকায়ও নি পর্যন্ত। আজ খুঁটিয়ে দেখল। আন্দাজ করা যায়, এককালে জমিদারবাড়ির এই উঠোনটা ঠাকুর-চাকরে জমজমাট থাকত। এখন খাঁ-খাঁ। কেউ কোথাও নেই।

করিডরের এক ধারে পাথরের সিঁড়ি। পুরনো দিনের কারুকার্য করা লোহার রেলিং। সেদিন রূপকের সঙ্গে এই সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে উঠেছিল।

অন্দরমহলের সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে একটু ইতস্তত করেছিল ময়ূখ. তারপর উঠতে লাগল। ওপরে নীচের কায়দায় গোল বারান্দা। তবে এ বারান্দা নকশা-করা সেকেলে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। গ্রিলের মাথায় মসৃণ কাঠের রেলিং। ফ্লোরে মার্বেল। সেদিন এসব দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না ওর। ওই তো সেই পাখির শূন্য খাঁচা। ওই খাঁচার সামনের ঘরটাই তো কিরণবাবুর।

ঘরের মস্ত দরজাটা সেদিনের মতোই ভেজানো। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজায় টোকা দিল ময়ূখ। সঙ্গে সঙ্গে কিরণবাবুর গলা ভেসে এল, 'ভেতরে চলে আসুন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ময়ূখ।

কিরণবাবু ভেতরের খোলা জানলার পাশে চেয়ারটেবিলে বসে কী যেন লিখছিলেন। হাতে কলম, টেবিলে রাইটিং-প্যাড। ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুককে চেনার চেষ্টা করলেন।

ময়ূখ সোজা এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে আরে, প্রণাম কেন?'

ময়ূখ বলল, 'আমি দিন-সাতেক আগে এসেছিলাম আপনার কাছে। আমার বন্ধু রূপকের সঙ্গেই এসেছিলাম, আমার নাম ময়ূখ।'

কিরণবাবু বিব্রত মুখে হাসলেন।

ময়ূখ বুঝতে পারল ভদ্রলোক চিনতে পারেননি ওকে।

একদিন মাত্র অল্প কিছুক্ষণের দেখা। বুড়ো মানুষের পক্ষে না মনে করতে পারাটাই স্বাভাবিক। একটু থেমে ময়ূখ বলল, 'রোববার সকালের দিকে এসেছিলাম। আমার মা তখন সবে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ওঁর কিছু টেস্ট করার ব্যাপার ছিল।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভদ্রলোকের চোখমুখ। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আসলে বয়েস বাড়লে যা হয়, চোখের জোর কমে আসে।'

কথাটা শেষ করার পরেই সামান্য উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছিল কিরণবাবুর চোখে। 'তা, তোমার মা কেমন আছেন এখন?'

'ভাল, বেশ ভাল।'

আবার ঝলমলে হয়ে উঠেছিল মানুষটির মুখ। 'বাহ্! খুব ভাল। অসুস্থ মানুষ সুস্থ হওয়ার মতো আনন্দদায়ক খবর আর কী আছে! তোমার মায়েরই তো হার্টের প্রবলেম ছিল না?'

'হ্যাঁ, এখন সামলে নিয়েছেন '

'হার্টের অসুখ খুব বাজে অসুখ। আগে থেকে কিছু জানান দেয় না। আমার নিজেরও ওই সমস্যাটা একটু-আধটু আছে বলেই এসব জানি।'

'আপনি এখন কেমন আছেন?'

ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠে ভদ্রলোক বললেন, 'ফাসক্লাস, খুউব ভাল।'

সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল ময়ূখ, তারপর একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'কাজের সময় এসে আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম।'

'না-না, তোমরা এলে আমি বেশ আনন্দ পাই। গল্পটল্প করা যায়। আমার আবার কাজ কোথায়। কাজের সময়ই কাজ করলাম না, এখন এই শেষ বয়েসে কী করব! কাগজ-কলম দেখে ভাবছ কাজ করছি। না-না, কাজ নয়। আমার এক সম্পর্কিত বোন অনেকদিন হল কাশীবাসী হয়েছে, তাকে একটা পত্র লিখছিলাম। লিখছিলাম—আত্মীয় পরিজনের কথা এবার একদম ভুলে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণে মনপ্রাণ ঢেলে দাও। তিনিই তোমার পরমাত্মীয়, আমরা তো মায়া। তা, পত্র এখন থাক, তোমার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।'

'আপনার ওই বোন কি অনেক দিন ধরেই কাশীতে আছেন?'

''হ্যাঁ, অনেক বছর। এক ছেলে ছিল। বহুকাল নিরুদ্দেশ। স্বামী মারা যাওয়ার পরে সব বন্ধন ছিন্ন হল। তারপর কাশীবাসী হল। তা, তখন থেকেই বছরে দুটো করে পত্র লেখে। সব পত্রেই এক অনুরোধ—দাদা, তুমিও এখানে চলে এসো। যে ক'টা দিন বাঁচি, বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণেই থাকি দুজনে।''

'তা, আপনার ইচ্ছে করে না কাশী যেতে?'

প্রসন্ন হাসি হেসে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, 'এসব জায়গায় ইচ্ছে-অনিচ্ছে খাটে না। অনেক বয়েস হল। অনেক কিছু দেখলাম। কথায় বলে না, যার যেখানে চাল মাপা থাকে, সে সেখানেই যায়। খুব খাঁটি কথা। তিনিই জানেন, আমার চাল কোথায় মাপা, কলকাতায় না কাশীতে। আমি কোনও ব্যাপারে জোর খাটাই না। যা করার তিনিই করাবেন। সব কাঠবেড়ালির তো রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয় না। আমি সব ভাবাভাবিই ছেড়ে দিয়েছি বহু দিন। দিব্যি আছি, তোমাদের মতো পাঁচজন তো মাঝে মাঝে গল্প করে যায়। এটা কি কম!'

আলো-ছায়া মেশানো ঘর। একটি মাত্র বিদ্যুতের আলোর পক্ষে এ ঘরটা আলো-আলো করা সম্ভব নয়। খোলা জানলা দিয়ে অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল ঘরে।

ময়ূখ হাতের পলিথিনের প্যাকেটটা সামনের টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে নিচু গলায় বলল, 'আপনার জন্যে কিছু ফল নিয়ে এসেছি।'

তুচ্ছ এই উপহারটুকু পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন মানুষটি, তারপর বিব্রত মুখে বললেন, 'তুমি আবার কষ্ট করে এসব আনতে গেলে কেন?'

'কষ্ট হবে কেন? সামান্য কয়েকটা ফল তো। আপনি খেলে আমি খুব খুশি হব।'

শুনে ঝলমল করে উঠেছিল বৃদ্ধ মানুষটির মুখ। বললেন, 'নিশ্চয়ই খাব, তুমি এনেছ, খুব খুশি হয়েই খাব। কী ফল এনেছ?'

'আপেল।'

'আপেল! বাহ্! আপেল তো আমার সব চাইতে প্রিয় ফল।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে ময়ূখের মনে হল, আপেলের বদলে ও যদি আম, কিংবা আমের বদলে আঙুর—যাই আনত না কেন; উনি সমান উৎসাহের সঙ্গে একই কথা বলতেন। আসলে এই ধরনের সাধুসন্ত প্রকৃতির লোকদের একটা কাজ বোধহয় পরকে আনন্দ দেওয়া। ব্যাখ্যাটা নিজের ইচ্ছে মতো তৈরি করে নিলেও মানুষটি আপেল ভালবাসেন জেনে সত্যিই খুশি হয়েছিল ময়ূখ।

কিরণবাবুকে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। খুশি মনেই গল্প জুড়লেন উনি। ওঁর বোধহয় গল্পের কখনও অভাব হয় না। হাওয়া থেকে বিষয় ধরে নিয়ে একা-একাই গল্প চালিয়ে যেতে পারেন অনর্গল।

চুপচাপ সেই সব গল্প শুনে যাচ্ছিল ময়ূখ। বেশ লাগছিল শুনতে। এতগুলো বছর বেঁচে থাকতে পারলে বোধহয় সার কথা বলার অধিকার জন্মে যায়। কিরণবাবু তাঁর মূল্যবান কিছু অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে যাচ্ছিলেন গল্পের ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ বাদে ময়ূখ ভেতরে-ভেতরে কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আসল কাজটাই তো সারা হয়নি এখনও। কথার ফাঁক খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল ও। ফাঁক পেলেই দরকারি কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

সুযোগ পেল বেশ কিছুক্ষণ বাদে। এক গল্প থেকে আর এক গল্পে যাওয়ার পথে বৃদ্ধ মানুষটি একটুখানি থামতেই ময়ূখ বলল, 'সেদিন আপনি আমাকে যা সাহায্য করেছিলেন না, জীবনে ভুলব না। ওই টাকাটা ভীষণ কাজে লেগেছিল আমার। এই নিন, আপনার সেই পাঁচ হাজার টাকা।'

খামে ভর্তি টাকাটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছিল ময়ূখ, কিন্তু ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন না।

ময়ূখ একই কথা আর একবার বলল, কিন্তু মানুষটির বুকের ওপর গোটানো হাত যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদে রীতিমত আহত গলায় বললেন, 'এটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল তোমার?'

এমন একটা পরিস্থিতির জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না ময়ূখ। মিনমিন করে বলল, 'তাড়াহুড়ো কোথায় করলাম! আমি তো সেদিনই বলেছিলাম, এক তারিখে টাকাটা ফেরত দিয়ে যাব। আজ তো মাসের এক তারিখ।'

ভদ্রলোক কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

আস্তে আস্তে খামটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পরিবেশ সহজ করার গলায় ময়ূখ বলল, 'আমরা তো চাকরিজীবী মানুষ। কখন কী দরকারে আবার এই টাকাটায় হাত পড়ে যাবে। তাছাড়া ধার করলে ঠিক সময়ে শোধ দেওয়ার একটা দায় তো থেকে যায়। সেটা তো—।'

'তুমি কি দায়মুক্ত হতে চাইছ?' আচমকা ময়ূখকে থামিয়ে দিলেন উনি। আহত হওয়ার চিহ্নগুলো ওঁর চোখেমুখে এখন বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

কোনওরকমে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে ময়ূখ বলল, 'না-না, দায়মুক্ত হতে যাব কেন? আপনি সেদিন আমার পাশে যে ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তা তো ভোলার নয়। দায়মুক্ত-টুক্ত নয়, ধার করলে শোধ দেওয়ার একটা দায়িত্ব থেকেই যায়।'

ময়ূখের ধারণা ছিল দায়িত্বজ্ঞানের কথা শুনলে বুড়ো মানুষরা একটু খুশিটুশি হয়ে থাকেন, কিন্তু ওর কথা শুনে কিরণবাবু একটুও খুশি হলেন না। গম্ভীর মুখে টেবিলে পড়ে-থাকা খোলা কলমের খাপ বন্ধ করলেন।

একটু ইতস্তত করে ময়ূখ বলল, 'শুধুমাত্র দায়িত্ববোধের কথা বলছি না, আপনি আমার ভয়ঙ্কর একটা বিপদের দিনে—।'

শুকনো হাসি হেসে কিরণবাবু বললেন, 'এবার কি কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা বলবে?'

এমন প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ময়ূখের। তবে উত্তর না জানার জন্য নয়, ঋষিতুল্য এই মানুষটিকে অসন্তুষ্ট করে তোলার জন্য ও মরমে মরে যাচ্ছিল।

কিরণবাবু আবার হাসলেন। এ হাসিটা শুকনো নয়, প্রসন্ন মানুষের হাসি। হাসার পরে বললেন, 'তোমাকে একটা গল্প বলি। খুব পুরনো গল্প। যিশুখ্রিষ্ট একবার দশজন কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ সারিয়ে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হওয়ার পরে ওই দশজনের ক'জন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল বলো তো? মাত্র একজন। বাকি ন'জন রোগ সারার সঙ্গে সঙ্গে একটাও কথা না বলে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস করো, এই ঘটনাটার কথা বার বার মনে পড়ে যায় আমার। যতবার মনে পড়ে ততবারই নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হয়। মনে হয়, ছোটখাটো ব্যাপারে আমরা কৃতজ্ঞতা অকৃতজ্ঞতার কত হিসেবনিকেশ করে থাকি। নিজেকে ছোট ভাবার মতো বড় কাজ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। কিন্তু কই, পারলাম কোথায়! অনেকগুলো বছর বেঁচেছি, আর কিছুদিন হয়তো বাঁচব, কিন্তু কই—।'

বুড়ো মানুষটির কথার মধ্যে কী ছিল, কে জানে! কিন্তু ওঁর কথাগুলো শোনার পরে নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল ময়ূখের। মৃদু গলায় বলল, 'দেখুন, আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কিছু বলিনি আমি। আপনার ওই টাকাটা সত্যিই আমার ভীষণ উপকারে এসেছে। মা হঠাৎই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডায়াগনস্টিক সেন্টারে একগাদা টেস্ট করার মতো টাকা তখন আমার হাতে ছিল না। ওদিকে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, টেস্টের রিপোর্টগুলো না পেলে চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। রূপক সব জানে, এসব কথার কিছু-কিছু আপনাকেও বলেছি। আপনি সেদিন—।'

থামিয়ে দিয়ে কিরণবাবু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'থাক-থাক, ওসব কথা থাক। আমার কিছু বাড়তি টাকাপয়সা আছে, তাই তোমাকে দিয়েছি। না থাকলে দিতাম না। তবে এটাও ঠিক, আমি না পারলে আর কেউ এসে তোমার পাশে দাঁড়াত। বিপদ কেটে যেত ঠিকই। তোমাকে আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি।'

ঘটনাটা আগাগোড়া মনে করে নেওয়ার জন্যই বুঝি কিরণবাবু একটু থামলেন। ওঁর আগের সেই প্রশান্ত চেহারাটা পুরোপুরি ফিরে এসেছে আবার। ঘরের মস্ত জানলাটার দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করলেন উনি। 'তখন আমার কত বয়স হবে, বড়জোর বাইশ-

তেইশ। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক ল্যান্ডস্লাইডে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। রাস্তাঘাট, ব্রিজ ধসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আর ধস্‌টা নামার মুখেই আমার পয়সাকড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু বিপদে পড়িনি আমি। ওখানকার এক ডাক্তারবাবু নিজের থেকে আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ওঁর বাড়িতেই ছিলাম দিন-দশেক। রাস্তাঘাট মোটামুটি চলনসই হলে বাড়ি ফেরার অনুমতি চাইলাম। উনি বললেন, ঠিক আছে, যাও। তবে দেখেশুনে সাবধানে যাবে। তারপর আমার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, এটা রাখো। আমি কিছুতেই নেব না। কিন্তু উনি আমাকে ধমকে বললেন, রাস্তাঘাটে কখন আবার কী বিপদে পড়বে, তার কি কোনও ঠিক আছে! টাকাটা রাখো। তোমার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। টাকাটা তোমাকে আমি ধার হিসেবে দিচ্ছি। বাড়ি ফিরে একসময় পাঠিয়ে দিলেই হবে। সেই আমলে পঞ্চাশ টাকা মানে অনেক টাকা। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুবার মুখে ওঁর এক পেশেন্ট-পার্টি এসেছিল। এসেছিল শিলিগুড়ি থেকে। জরুরি কল, এক্ষুনি যেতে হবে ডাক্তারবাবুকে। ওদের সঙ্গে গাড়ি ছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, ভালই হল, চলো একসঙ্গে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাওয়া যাক। শিলিগুড়িতে পৌঁছেই বাবার এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। বিরাট পয়সাওয়ালা মানুষ, বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন। ওঁকে দেখেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল। আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ডাক্তারবাবুর টাকা শোধ করার জন্য ছুটেছিলাম। ভেবেছিলাম, চটপট টাকাটা শোধ দেওয়ার উদ্যোগ দেখে ডাক্তারবাবু খুশি হবেন। কিন্তু খুশি হওয়ার বদলে বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। আমাকে বকাঝকা করে অনেক কিছু বলেছিলেন। সব কথা মনে নেই। তবে একটা কথা পরিষ্কার মনে আছে। বলেছিলেন, টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়ার আশায় তোমার বিপদের দিনে আমি তোমার পাশে দাঁড়াইনি।'

পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে বেশ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের গলা। অস্বস্তি বেড়ে উঠেছিল ময়ূখের। বুঝতে পারছিল না এই মুহূর্তে কী বলা উচিত!

অদ্ভুত ধরনের নীরবতা ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বৃদ্ধ মানুষটি ময়ূখের দিকে তাকিয়ে শান্ত মুখে হেসে বললেন, 'বিশ্বাস করো, এই ধরনের ঘটনা আমার জীবনে একবার নয়, বেশ কয়েকবার ঘটেছে। কিন্তু যতবারই বিপদে পড়েছি, ততবারই কেউ-না-কেউ—তা সে চেনাই হোক আর অচেনাই হোক, ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটতে দেখার ফলে আমার মনে হয়েছে, অন্য কারও বিপদেও পাশে এসে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। আমার সাধ্য অবশ্য খুবই কম। কিন্তু যা পারি, যতটুকু পারি, তাই করার চেষ্টা করে থাকি। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে আমার, তার ওপর হার্টের অবস্থাও খুব একটা সুবিধের নয়, এত বড় একটা ঘরে একাই থাকি। নীচের তলায় কাজের লোকজন আছে, তবে তারা বেশির ভাগ সময় নীচেতেই থাকে। আমি ওদের খুব একটা বিরক্ত করতে চাই না। সন্ধের পর থেকেই থমথমে হতে শুরু করে দোতলা। গোটা বাড়িটাই যেন নিশুতি রাত। তখন মাঝেমধ্যে মনে হয়, বাড়িটা বুঝি ভুতুড়ে বাড়ি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার

কখনোই ভয় করে না। আমি জানি, হঠাৎ শরীর খারাপ হলে কিংবা কোনওরকম বিপদে পড়লে কেউ-না-কেউ ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

ময়ূখ কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। মৃদু একটা অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল, অজ্ঞাত কোনও কারণে সাধুসন্ত প্রকৃতির এই বৃদ্ধ মানুষটিকে ও আঘাত দিয়ে ফেলেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর স্রেফ কথা চালাবার জন্যই বলল, 'আপনি কিন্তু মনে করে আমার আনা আপেল খাবেন।'

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠেছিল কিরণবাবুর মুখে। 'নিশ্চয়ই খাব, তুমি আমার জন্য কষ্ট করে এগুলো নিয়ে এসেছ—কেন খাব না? তাছাড়া আপেল আমি খুব ভালবাসি, আমার প্রিয় ফল।'

অমলিন ওই হাসি দেখে একটু আশ্বস্ত হল ময়ূখ। 'ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন উঠি। আপনি আপনার কাশীর বোনকে চিঠি লিখুন। পরে আবার আসব একদিন। আর—।'

বুড়ো মানুষদের বোধহয় দরকারি কথা দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দেওয়ার একটা রীতি আছে। এই রকম একটা ধারণা থেকেই ময়ূখ সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আর, ওই খামে আপনার ওই পাঁচ হাজার টাকা রইল।'

বলতেই আবার মেঘে ঢেকে গেল ভদ্রলোকের মুখ। কেমন যেন থেমে থেমে বললেন, 'তোমার মা কবে ফিরেছেন নার্সিংহোম থেকে?'

'ফেরেননি এখনও। কাল ওঁকে ছুটি দিয়ে দেবে। অফিসফেরতা সোজা নার্সিংহোমে গিয়ে বাড়ি নিয়ে আসব।'

কথাটা শুনে বুঝি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, 'মা নার্সিংহোমে, আর তুমি এখানে বসে গল্প করছ। না-না, এটা ঠিক করোনি তুমি। ডাক্তারবাবুরা যত্ন নেবেন জানি, তবু তোমার যতটা সম্ভব ওঁর কাছে থাকা উচিত এখন। অসুখবিসুখ হলে কাছের মানুষ কাছে থাকলে ভাল লাগে সবার। তাছাড়া, ঈশ্বর না করুন, হঠাৎ কোন প্রয়োজনও তো দেখা দিতে পারে। আমার এ ভাবে বলতে খারাপ লাগছে, তবু বলছি, তুমি এখান থেকে সোজা মায়ের কাছে চলে যাও। উনি সুস্থ হওয়ার পরে একদিন এসো, অনেকক্ষণ ধরে গল্প করা যাবে।'

লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ময়ূখ। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমি প্রতিদিনই অফিসফেরতা সোজা নার্সিংহোমে যাই, আজ এক তারিখ বলেই—। ঠিক আছে, আজ তাহলে আসি।'

ময়ূখ পেছন ফেরার মুখেই বৃদ্ধ মানুষটি গম্ভীর গলায় বললেন, 'এক মিনিট।' তারপর ময়ূখের দেওয়া টাকার খামটা ময়ূখের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই টাকাটা এখন রেখে দাও। মা ভাল হয়ে যাওয়ার পর শোধ দেওয়ার কথা ভেবো।'

কণ্ঠস্বরে স্নেহমাখা চাপা আদেশের ভাব ছিল। ওই আদেশ না মানা বা ওই নিয়ে তর্ক তোলা কঠিন। ময়ূখ হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে 'আসি' বলে ফেরার পথ ধরল।

সেকেলে মস্ত বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল ও। মেট্রো রেলে ফিরবে, কিন্তু এই পথটাই মেট্রোর দিকে গিয়েছে কি না ও জানে না। রাস্তার কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়, কিন্তু জানার কোন আগ্রহ বোধ করছিল না এই মুহূর্তে। কেমন যেন আবিষ্ট মানুষের মতো হাঁটছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তার ধারে ধারে জল। বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডার ভাব।

কিরণবাবুর কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল বার বার। আজ যা বলেছেন, কিংবা আগের দিন। পুরনো দিনের নানা ঘটনার সঙ্গে ভদ্রলোকের গোটা জীবনটাই বোধহয় অলৌকিক ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। পেছন দিকে একবার তাকালেই বুঝি অতীতের কিছু ঘটনা ছুটে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষটিকে। আর তখনই কি ওঁর মনে হয়, পৃথিবীর সবাই ভাল, সব কিছু ভাল। উটকো লোককে ধরতে গেলে যেচে টাকা দেওয়া এবং সেই টাকা শোধ নিতে না চাওয়া কি সেই জন্যই!

হঠাৎই যেন গোটা আকাশটা মাথার ওপরে ভেঙে পড়েছিল ময়ূখের। ওর সামনেই একটা গাড়ির জোরালো হেডলাইট। গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে ঠিক ওর এক হাত সামনে এসে থেমে গিয়েছিল। কিরণবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ও রাস্তার ধার থেকে মধ্যিখানে চলে এসেছে, খেয়াল করেনি। সামনে রাস্তার বাঁক, ওই বাঁক থেকেই গাড়িটা ছুটে এসেছিল।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে দ্রুত পায়ে ফুটপাথে উঠে গিয়েছিল ময়ূখ। রাস্তার উজবুক লোককে গাড়ির ড্রাইভাররা যে ধরনের গালাগালি দেয়, ঠিক সেই ধরনের গালাগালির কয়েকটা টুকরো ভেসে এসেছিল ওর কানে।

এত বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার পরে তো বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ার কথা কিছুক্ষণ ধরে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সে ধরনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না ওর মধ্যে। বুকের ভেতরটা আগের মতোই সহজ-স্বাভাবিক। শান্ত মনে সামনের দিকে হেঁটে চলেছিল ও। সারা শরীরের স্নায়ু আশ্চর্য রকমের শান্ত। একটু আগেই তৈরি-হওয়া বিচিত্র এক বিশ্বাসবোধ কাজ করে যাচ্ছিল সমানে। মনে হচ্ছিল, কোনওরকম বিপদের মধ্যে পড়বে না ও, পড়তে পারে না। আর একান্তই যদি পড়ে, কেউ-না-কেউ ওকে বাঁচানোর জন্য ঠিক ছুটে আসবে। কিরণবাবুর দীর্ঘ জীবনে এই ঘটনা প্রতিবার ঘটেছে। এটাই হয়তো সার কথা, ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও কারণ নেই।

পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে শোধ দেওয়ার জন্য আনা পাঁচ হাজার টাকার খামটা হাতে লাগতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ময়ূখ।

ঘড়ির দিকে তাকাল, অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। আরও দেরি করলে নার্সিংহোমের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লম্বা পা চালিয়ে ওদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে-থাকা ট্যাক্সিটায় উঠে পড়েছিল ও।

।। চার।।

সাত-সাতটা দিন কী ভাবে যেন কেটে গিয়েছিল ময়ূখের! উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আর ছোটাছুটি। ওদিকে টাকাও খরচ হয়েছে জলের মতো। আট দিনের দিন অভয় দেওয়ার গলায় ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, আর কোনও ভয় নেই। সব কিছুই নর্মাল। তবে উনি আরও পাঁচটা দিন এই নার্সিংহোমেই থাকুন। ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার। তুমি তখন মাকে বাড়িতে না নিয়ে ভালই করেছ। আসলে হার্টের পেশেন্ট তো দিব্যি ভাল ছিলেন, আবার হঠাৎই—। তোমার মায়ের বয়েস যদি আর একটু কম হত, আমি বাইপাস করে দিতাম। বয়েস বেশি বলেই ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

ভয় কেটে যাওয়ার কথা শুনে সহজ হয়েছিল ময়ূখ। তারপর কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকার পরে বলেছিল, 'পাঁচ দিন কেন, আপনি নার্সিংহোমে মাকে আরও কিছুদিন রেখে দিতে পারেন—।'

ডাক্তারবাবু ময়ূখের অনেক দিনের চেনা। সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, 'না-না, প্রয়োজন না থাকলে টানা খুব বেশিদিন নার্সিংহোমে থাকা ঠিক নয়। এতে রুগির আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিন। ওষুধ তো চলবেই।'

'বাড়ি গেলে মা তো বিশ্রাম নিতে চান না।'

'না-না, এবার নেবেন। আমি বুঝিয়ে বলেছি। যাওয়ার আগে আরও একবার বলব। কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে কিন্তু অল্প-অল্প হাঁটাচলা করতে হবে। তারপর ওই হাঁটা-চলার পরিমাণও বাড়াতে হবে। খুব স্ট্রেন যে-সব কাজে নেই, সে-সবই করবেন। সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার এটাই এখন রাস্তা। শরীরের একটা সিস্টেম আছে তো, চলাফেরা একেবারে বন্ধ করে দিলে সেই সিস্টেমটা সাফার করবে। থাকগে, ও নিয়ে এত আগে থেকে ভাবনাচিন্তা করার কোনও দরকার নেই। ওঁকে এখান থেকে ডিসচার্জ করার সময় আমি অ্যাডভাইস লিখে দেব। এবার তুমি তোমার নিজের শরীরের দিকে নজর দাও।'

ম্লান হাসি হেসে ময়ূখ জবাব দিয়েছিল, 'আমি তো ভালই আছি—।'

ডাক্তারবাবু হেসেছিলেন। 'আরও একটু ভাল থাকার চেষ্টা করো। রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোও। ঠিক ভাবে খাওয়াদাওয়া করো।'

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে আসার পরে নিজেকে বেশ হালকা বোধ করছিল ময়ূখ। একটু আগেই জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডার ভাব। ওই বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিতে চমৎকার লাগছিল ওর।

বাড়ি ফিরে এসে দেখে রূপক বসে আছে। বন্ধুকে পেয়ে খুব ভাল লাগছিল ময়ূখের। এই মুহূর্তে প্রাণ খুলে গল্প করার জন্যে এমন একজন বন্ধুরই প্রয়োজন ছিল।

উদ্বিগ্ন মুখে রূপক বলল, 'তোর বাড়িতে এসে সব শুনলাম—কেমন আছেন এখন মাসিমা?'

'ভাল, এখন ভাল। তবে এই ক'টা দিন যা গেছে না—।'

'শুনলাম—। তোর সঙ্গে লাস্ট যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন তো ভালই ছিলেন—।'

"হ্যাঁ, বেশ ভাল। বাড়িতে নিয়ে আসব—সব ঠিকঠাক। এমন সময় হঠাৎই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন—। এই ক'টা দিন যা গেছে না আমার!"

'আমি তো কিছুই জানি না, জানলে আমার ট্রিপ ক্যানসেল করে দিতাম।'

'ট্রিপ! কোথায় গিয়েছিলি?'

'ট্রিপ মানে প্লেজার-ট্রিপ। বহুকাল কোথাও বেড়াতে যাইনি। অনিন্দ্য বলল—চল্, সাতটা-আটটা দিন কোথাও গিয়ে স্রেফ শুয়ে-বসে কাটিয়ে আসি। রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।'

'খুব ভাল করেছিস। মাঝেমধ্যে এই ভাবে বেরিয়ে পড়া দরকার।'

'দূরে কোথাও নয়, ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম। গাছপালা-জঙ্গলের মধ্যে কেটে গেল কয়েকটা দিন। বেশ রিফ্রেশিং। মাসিমা সুস্থ হয়ে উঠুন, তোকে নিয়ে ওখান থেকে ঘুরে আসব একবার।'

'যা-ব।' ছোট্ট শব্দটার মধ্যিখানে মস্ত একটা হাই উঠেছিল ময়ূখের।

রূপকের চোখমুখ সহানুভূতিশীল বন্ধুর মতো হয়ে উঠেছিল। "এ ক'দিন তোর বোধহয় ঘুমটুম তেমন হয়নি?"

'হয়েছে। তবে টানা ঘুমোতে পারিনি। দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা থাকলে যা হয়, কিরণবাবু কিন্তু আমাকে জোর বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

চকচকে হয়ে উঠেছিল রূপকের চোখমুখ। 'কিরণবাবু মানে ভবানীপুরের সেই বুড়ো? তুই তোর দ্বিতীয় দফার ধারটা নিয়ে নিয়েছিস? খুব ভাল।'

'দ্বিতীয় দফার ধার! মানে?'

'যাব্ বাবা। শোধ না দিয়ে মোট পাঁচবার তো ধার নেওয়া যায়। খেয়াল নেই তোর। কত নিলি এবার?'

রীতিমত আহত দেখাচ্ছিল ময়ূখকে। 'আবার আমি ওঁর কাছ থেকে ধার করতে যাব কেন? তবে এটাও সত্যি, ওঁর ঋণ শোধ হওয়ার নয়।'

হা-হা করে হেসে উঠল রূপক। 'শুধু তুই কেন, যারা ওর কাছ থেকে ধার নেয়—তাদের কারও পক্ষেই ওর ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।'

চাপা গলায় বন্ধুকে ধমক দিয়ে ময়ূখ বলল, 'বাজে কথা বলিস না। পুণ্যাত্মা বলতে যা বোঝায়, ভদ্রলোক ঠিক তাই। তোরা ওঁকে এক্সপ্লয়েট করছিস।'

'আমরা এক্সপ্লয়েট করিনি, বুড়োটাই এক্সপ্লয়েটেড হওয়ার জন্যে বসে আছে। আমাদের মতো কিছু ভাল লোক ওর কাছ থেকে টাকাপয়সা ধার নিচ্ছে—এটা ওর পক্ষে ভাল। বুড়োকে তো লুটেপুটে খাচ্ছে বারো ভূতে। দ্বিতীয় দফায় কত নিলি?'

'বললাম তো নিইনি। আমি টাকা শোধ করার জন্যে এক তারিখে গিয়েছিলাম ওঁর কাছে।'

'গিয়েছিলি! টাকাটা শোধ দিয়ে দিয়েছিস?' একটু হতাশই দেখাচ্ছিল রূপককে।

গলা খাদে নামিয়ে ময়ূখ বলল, 'শোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু উনি নেননি। পুরো পাঁচ হাজার টাকা ভর্তি খামটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : তোমার মা এখনও নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফেরেননি, টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য এত ব্যস্ত

হচ্ছ কেন? টাকাটা তো আমার কোন কাজে লাগবে না এখন। তোমার মা বাড়ি ফিরে আসুন, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর ধীরেসুস্থে ফেরত দিলেই হবে। মানুষটা বোধ হয় অন্তর্যামী। দিব্যি ভাল হয়ে গিয়েছিল মা, কিন্তু ফেরার মুখেই অসুস্থ হয়ে পড়ল আবার। অক্সিজেন সিলিন্ডার, ইসিজি, একগাদা টেস্ট, দামি-দামি ওষুধ, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নার্স রাখা। ওহ্! সে এক হুলস্থূল ব্যাপার। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হয়নি, কিন্তু আমার অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। কিরণবাবু ভাগ্যিস ওই পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নেননি সেদিন! নিলে ফের টাকা ধার করার জন্য ছুটতে হত কারও কাছে। বারবার মনে হচ্ছে—উনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন—আমি আরও একবার বিপদে পড়তে যাচ্ছি!'

রূপক হাসতে গিয়েও হাসল না। একটু ধাক্কা-মারা গলায় বলল, 'সেই জন্যেই তো বলেছি—ভদ্রলোকের টাকা আমরা ভাল কাজেই খরচ করছি।'

কাজের লোক দু-কাপ চা রেখে গিয়েছিল টেবিলে। চায়ে চুমুক দিয়ে ময়ূখ বলল, 'কোথায় যেন পড়েছিলাম—আমাদের যাবতীয় উদ্বেগের সত্তর ভাগ আসে টাকাপয়সার অভাব থেকে। কথাটা যে কত খাঁটি—সেটা আমি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বড়-বড় দুটো ধাক্কা খেলাম। দুটো ধাক্কাতেই বেশির ভাগ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এসেছে টাকাপয়সার অভাব থেকে। আগের ব্যাপারটা তো তুই ভাল করেই জানিস। এবারও সেই রকম। আগেও যে বিপদে পড়িনি তা নয়, তবে তা এত বড় মাপের ছিল না। ধারধোর করে সে বিপদ সামলেছি। পরে ভেবেছি একটা ইমার্জেন্সি ফান্ড তৈরি করা দরকার। একমাত্র বিপদে পড়লেই ওই ফান্ডের দিকে হাত বাড়াব, অন্য সময় কখনোই নয়। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে তো পুরনো বিপদের ভয়ও কেটে যায়। তাই আর ফান্ড তৈরি করা হয়নি। কিরণবাবুর মতো মানসিক অবস্থা তৈরি করতে পারলে অবশ্য ফান্ড বানাবার কোনও দরকারই নেই।'

কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল রূপক। 'কী রকম মানসিক অবস্থা?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে ময়ূখ বলল, 'অদ্ভুত এক বিশ্বাসের জগতে বাস করেন মানুষটি। সেদিন বলছিলেন উনি সারা জীবনে বহুবার বিপদের মধ্যে পড়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ-না-কেউ ঠিক এগিয়ে এসেছে—তা সে চেনাই হোক বা অচেনাই হোক। মনের অবস্থা ওই রকম করে ফেলতে পারলে উদ্বেগ-উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।'

বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠেছিল রূপক, তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'খুব খাঁটি কথা বলেছে বুড়ো। তরুণদা পাঁচবার বিপদে পড়েছিল, পাঁচবারই উদ্ধার পেয়েছে। আমি দুবার, তুই একবার—। বুড়োর কথা সত্যি বলে ধরলে বুঝতে হবে বুড়োর মতো মুর্গি আরও আছে, তবে অন্য ফর্মে—।'

ধমকে উঠল ময়ূখ, 'কী তখন থেকে আজেবাজে বলে যাচ্ছিস ভদ্রলোকের নামে! চুপ কর তো।'

রূপক জবাব দিতে গিয়েও দিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়ল

কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, 'এবার আমাদের বেড়ানোটা জব্বর হয়েছে। চমৎকার বাংলো। চারপাশে শালবন। এলাকাটা অসম্ভব নিরিবিলি, নির্জন। মাল খাওয়ার পক্ষে আইডিয়েল জায়গা। তিন পেটি মাল নিয়ে গিয়েছিলাম দুজনে, শুয়েবসে ওগুলো শেষ করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না আমার। তুই তো ওসব আবার ছুঁস না। কিন্তু এবার দেখলাম প্রকৃতিকে ভাল ভাবে এনজয় করতে গেলে হাতে পাত্তর থাকাটা কত জরুরি। পাত্তর যত চড়ছিল শালগাছের চেহারা তত পাল্টে যাচ্ছিল। শেষে মনে হচ্ছিল, গাছগুলো ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।'

নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠেছিল রূপক। হাসি থামার পরে বলেছিল, 'তবে প্রচুর খরচাপাতি হয়ে গেছে। এবার ভাবছি ওই বুড়ো—ন্‌না, তোর ওই পুণ্যাত্মা ভদ্রলোকের কাছে আমার তৃতীয় দফা ধারের জন্যে যেতে হবে।'

ময়ূখ এবার আর কিছু বলল না।

একতরফা আরও কিছুক্ষণ বকবক করার পরে রূপক বলল, 'না, উঠি এবার। এ ক'দিন এত বিশ্রাম নিয়েছি যে, এখন একটুতেই ক্লান্তি চলে আসে। মাসিমা বাড়ি ফেরার পরে আবার আসব।'

রূপক চলে যাওয়ার পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল ময়ূখ। দশটা বাজে।

।। পাঁচ।।

উদ্বেগ-উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা খুব বেড়ে গেলে শরীরের দিকে আলাদা করে তাকানো যায় না। কিন্তু কঠিন ওই সময়টা শেষ হওয়ার পরেই রাজ্যের ক্লান্তি নেমে আসে সারা শরীরে। ময়ূখের এখন ঠিক সেই অবস্থা। মা এখন ভাল, তবে বেশ রুগ্ন হয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন, বিছানা থেকে পারতপক্ষে নামা চলবে না। টানা বিশ্রাম দু-সপ্তাহ। তারপর শরীর ভাল থাকলে একটু-একটু করে আবার পুরনো জীবনে ফেরা।

খুব সুন্দর ভাবে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, আর স্কুলের বাধ্য মেয়ের মতো প্রতিটি কথায় সায় দিয়েছে মা। কিন্তু ওই বাধ্যতার ভাব বাড়িতে ফেরার পরে মাত্র দিনতিনেক ছিল। চতুর্থ দিন থেকে মৃদু ছটফটানি। ছেলে কী খাবে, কখন খাবে, রাজ্যের সংসার আগোছালো হয়ে পড়ে আছে। কাজের লোকের কাজের মধ্যে কোন ছিরিছাঁদ নেই। সমস্যা এই সব নিয়েই।

ময়ূখ খুব শক্ত হাতে পুরো ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারা কঠিন। তাছাড়া ওর অফিস আছে, তবে সব মিলিয়ে সব কিছু মোটামুটি ভালর দিকেই যাচ্ছিল। যদিও গতি খুব ধীর। মা একটু-একটু করে ভাল হয়ে উঠছিল।

রোববার দিন সকালে রূপক এসে হাজির হল আবার! তারপর মাসিমার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে সোজা চলে গিয়েছিল ওঁর ঘরে। বাথরুম থেকেই ওর চড়া গলায় কথা শুনতে পাচ্ছিল ময়ূখ। স্নান সেরে ফিরে আসতেই অবাক হয়ে রূপক জিজ্ঞেস করল, 'ছুটির দিনেও সাতসকালে তুই চান করিস!'

মৃদু হাসল ময়ূখ। 'ছুটির দিন এখন আর ছুটির দিন নেই। কয়েকটা দিন কামাই হয়ে গিয়েছিল, এখন বকেয়া কাজ সামাল দেওয়ার জন্যে রোববারও অফিসে ছুটতে হচ্ছে। তবে দুপুরেই ফিরে আসব। তুই মা'র সঙ্গে আর একটু গল্প কর, আমি জামাকাপড়টা পালটে আসছি।'

অফিসের পোশাক পরে বন্ধুকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসল ময়ূখ। রূপক হঠাৎই গলা নামিয়ে বলল, 'আমার তিন নম্বর ধারটা মার খেয়ে গেল রে। ইশ্‌ যদি আর দুটো দিন আগে যেতে পারতাম!'

ভাতের থালাটা টেনে নিয়েছিল ময়ূখ। 'মানে?'

'মুর্গি বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে।'

ভাত মাখতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিয়েছিল ময়ূখ।

রূপক গলার স্বর আর একটু নামিয়ে বলল, 'আমি কাল সন্ধেয় বুড়োর বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সদর দরজায় ইয়া বড় একটা তালা ঝুলছে। কী ব্যাপার! তরুণদার কাছে শুনেছি ও বাড়ির দরজা প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। তাহলে কি কোনও অঘটন ঘটল!

উদ্বেগের ছাপ পড়েছিল ময়ূখের চোখেমুখে। 'কারও কাছ থেকে কোনও খোঁজখবর পাসনি?'

'খোঁজ না নিয়ে কি আর ছেড়েছি! গিয়েছিলাম তো মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। ফুরফুরে গোটা সন্ধেটা সামনে, অথচ পকেটে তেমন পয়সা নেই। বুড়োর বাড়ির ঠিক পাশেই ছোট্ট একটা পানের দোকান আছে, দেখছিস?'

দুদিকে মাথা নাড়ল ময়ূখ।

'আশেপাশে বাড়ির কারুকে দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ওই পানের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?'

'জানতে পারলি কিছু?'

'যা জানলাম তা তো সাঙ্ঘাতিক!'

'কী?'

'বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে বুড়োর।'

'মানে?'

'পানের দোকানের লোকটা বলল, বাড়ি নিয়ে বুড়োর শরিকি মামলা চলছিল, সেই মামলায় বুড়ো হেরে গেছে। ব্যস, বাড়িও বেহাত।'

অবাক হয়ে ময়ূখ জিজ্ঞেস করল, 'তুই যে বলছিলি ভদ্রলোকের তিন কুলে কেউ নেই—। তাহলে আবার শরিক এসে জুটল কোত্থেকে!'

বাহবা দেওয়ার গলায় রূপক বলল, 'তুই কথাটা মনে রেখেছিস দেখছি। খবরটা তো আমার নয়, তরুণদার। ওর খবর মানেই পাকা খবর। কথাটা আমার মাথাতেও খেলে গিয়েছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি তো জানতাম বুড়োর নিজের বলে কেউ নেই। বাড়ির তাহলে দাবিদার কে হয়েছিল? কে পেল বাড়িটা? দোকানদার

তার জবাবে বলেছিল—বাবুর বাড়ির অনেকেই তো আমার দোকানের খদ্দের, তাদের কাছ থেকেই শুনেছি—সত্যি মিথ্যে জানি না।'

'কী শুনেছে?'

'শুনেছে, বুড়োর নিজের বলে কেউ নেই। কিন্তু ওর দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতি বুড়োর ভাই সেজে মামলা ঠুকে দিয়েছিল। বুড়ো মামলার তদ্বির-তদারকি করা তো দূরের কথা মামলা লড়েইনি। একতরফা ডিক্রি হয়ে গিয়েছে তাই। তবে দোকানদারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। ওই এলাকায় এত বড় বাড়ি! ওই জমিবাড়ির দাম কম করে কয়েক কোটি। বুড়ো এমনি-এমনি ওই সম্পত্তি ছেড়ে দেবে?'

হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ময়ূখ। 'ওই ধরনের মানুষের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব। টাকাপয়সা, জমিবাড়ির কোনও দাম নেই ওঁর কাছে। থাকলে লোকের বিপদে সাহায্য করার নামে তোর-আমার মতো অচেনা লোককে গাদা গাদা টাকা দান করতেন না।'

বন্ধুর ওই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিল রূপক।

ময়ূখ নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'ভদ্রলোক কোথায় গিয়েছেন—জানতে পেরেছিস কিছু?'

'না, তেমন ভাবে কোনও খোঁজখবর নিইনি, আর নেবই বা কোত্থেকে! বাড়ি দখল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদরে তালা পড়ে গিয়েছে। বাড়ির লোকজন, মানে আশ্রিত যারা ছিল, তারা হাওয়া। তবে দোকানদার বলছিল—।'

'কী বলছিল?'

'বুড়ো মথুরা না বৃন্দাবন—কোথায় যেন চলে গিয়েছে—।'

'কাশী কি?'

'তিন-চারটে জায়গার নাম বলছিল—কাশীও থাকতে পরে তার মধ্যে, কিন্তু কাশীর কথা তোর মনে হচ্ছে কেন? তোকে কি কিছু বলেছিল?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না ময়ূখ।

বন্ধুর মনের কথা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে রূপক বলল, 'মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া—এই সব জায়গাতেই তো আমাদের এখানকার আশ্রয়হীন বুড়োবুড়িরা ছোটে। কাশীতেও যেতে পারে বুড়ো। তবে কাশী এখান থেকে অনেক দূরের জায়গা—তৃতীয় দফার সামান্য কিছু টাকা ধার নেওয়ার জন্যে আমার পক্ষে অত দূর ছোটা সম্ভব নয়।' জব্বর একটা রসিকতা করেছে ভেবে বখাটে ছোকরারা যে ভাবে হাসে, ঠিক সেই ভাবেই হেসে উঠেছিল রূপক।

ময়ূখ চটে গিয়ে বলল, 'অসভ্যের মতো হাসিস না তো!'

হাসির শেষটুকু গিলে ফেলল রূপক, তারপর বন্ধুর দিকে ধারালো চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বল্ তো! তুই দেখছি ইদানীং বুড়োর ব্যাপারে অদ্ভুত ধরনের সেনসিটিভ হয়ে পড়েছিস। কিছু বললেই ফোঁস করে উঠিস! কেন?'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটু দ্রুত হাতে অফিসের ভাত খেতে শুরু করে দিয়েছিল ময়ূখ। কয়েকটা মুহূর্ত ওই ভাবে খাওয়াব পরে বিষণ্ণ গলায় বলল,

'কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখ—যে মানুষটা একেবারে অচেনা লোকের বিপদের দিনে সবচেয়ে বড় হিতৈষীর মতো দাঁড়ায়, সাহায্য করে; সে কিন্তু নিজের বিপদের দিনে গা ঢাকা দেয় আচমকা।'

কথাটা রূপকের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকল। 'মানে?'

'মানে তো পরিষ্কার। উনি এখনও হয়তো কলকাতাতেই আছেন। যতটুকু যা বুঝেছি, নিজের বিপদে আর কাউকে বিব্রত করার মানুষ নন উনি। হয়তো কোনও গেস্টহাউসে উঠেছেন। ঠিকানা জানা থাকলে আমরা তো ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম। ওঁর বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু পাশে তো থাকতে পারতাম। বিপদের দিনে পাশে কাউকে পেলে মানুষের মনের জোর বাড়ে, কিছুটা শান্তিও পায়।

রূপক ও ধরনের চিন্তাভাবনার মধ্যে একেবারেই যায়নি। এবার গেল। একটু-আধটু সহানুভূতির ছাপও ফুটে উঠছিল ওর চোখেমুখে। সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস। অত ভালমানুষ হলে আজকের দিনে বাঁচা যায় না। বুড়ো যদি ওর মামলা-মোকদ্দমার কথা আমাকে জানাত, ওর বাড়ি এ ভাবে হাতছাড়া হত না। আমার একটা দুঁদে উকিলের সঙ্গে চেনাশোনা আছে, দুঁদে বললে কম বলা হয়, একটা যন্তর। দিনকে রাত করতে পারে উকিলটা। আইন কতটা কী জানে, জানি না; তবে আইনের বাইরের ঘাঁতঘোঁতগুলো নখদর্পণে। ওর হাতে কেস থাকলে বুড়োর ওই মামলা নিষ্পত্তির জন্যে আদালতে উঠতেই পারত না। নানা অছিলায় ডেট ডেফার করিয়ে করিয়ে বছর-দশেক ঠিক টেনে নিত। ধরা যাক, বুড়োর বাড়ির ওই শরিক-সাজা লোকটা অতিমাত্রায় ধুরন্ধর। মাথা খাটিয়ে মামলা সাজিয়েছে; কিন্তু আমার চেনা এই উকিলটা ওই মামলার শুনানিই হতে দিত না। তাছাড়া একটা কোর্টে মামলা হারলে তো অন্য কোর্টে অ্যাপিল করা যায়। স্মল কোর্ট থেকে হাই কোর্ট, সবশেষে সুপ্রিম কোর্ট। ইশ্! বুড়োটা একবার যদি জানাত!'

নামেই খাওয়া, ভাত-তরকারি পাতেই পড়ে থাকল ময়ূখের। উঠে পড়ে মুখ ধুয়ে কেমন যেন নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, 'মামলা লড়ার মানুষ উনি নন। ভাল উকিল, মন্দ উকিলের প্রশ্নই উঠছে না। পৃথিবীতে অল্প কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সব সময় হেরে যাওয়ার জন্যে তৈরি। তুই ব্যাপারটা কোনও ভাবে জেনে ফেলে উকিল দিতে চাইলেও উনি নিতেন না।'

অবাক হল রূপক। 'কেন?'

'বললাম না, মানুষটা হেরে যাওয়ার জন্য তৈরি।'

'তাই কখনও হয়?'

'সাধারণ নিয়মে হয় না। কিংবা এমনও হতে পারে, এই ধরনের হারকে উনি হার বলেই মানেন না।'

হেঁয়ালির জালে আর একবার জড়িয়ে পড়েছিল রূপক।

বন্ধুকে কয়েক মুহূর্ত হেঁয়ালির মধ্যে রেখে দেওয়ার পরে ময়ূখ বলল, 'মানুষটা অদ্ভুত এক বিশ্বাসের জগতে বাস করেন। ওঁর ক্ষেত্রে ওই বিশ্বাসটা কিন্তু আজগুবি নয়। সেদিন বেশ জোর দিয়ে বলছিলেন—।'

'কী বলছিলেন?'

'বলছিলেন—সারা জীবন ধরে দেখেছেন, যখনই বিপদে পড়েন তখনই কেউ না কেউ ওঁর সাহায্যের জন্যে ছুটে আসে। তা সে চেনাই হোক আর অচেনাই হোক। জীবনে বহুবার বিপদে পড়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে একজন না একজন ঠিক এগিয়ে এসেছে। সারা জীবন ধরে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখলে একটা বিশ্বাসবোধ তৈরি হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এবারও হয়তো নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন—এ বিপদটাও কেটে যাবে ঠিক।'

অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে রূপক বলল, 'পাগল! এ বিপদ কী করে কাটবে! এ তো আর পকেটের টাকা ফুরিয়ে যাওয়া নয় যে, আর একজন এসে ধার দিয়ে বাঁচাবে। এ বিপদ তো বাড়ি বেহাত হওয়ার বিপদ। বাড়ি আবার যা-তা বাড়ি নয়, যাকে বলে সাতমহলা বাড়ি। মামলায় হারিয়ে বাড়ির দখল নিয়েছে আর একজন। বুড়ো ওই বাড়ি আবার ফেরত পাবে কী করে?'

'বাড়ি ফেরত পাওয়ার কথা তো আমি বলছি না। ওঁর বিপদ আর আমাদের বিপদের ধারণার মধ্যে মনে হয় আকাশ-পাতাল তফাত।'

রূপক হেসে উঠে বলল, 'তাহলে ঠিক আছে, বুড়োকে নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই। বুড়ো এখন বোধহয় কাশীতে বসে আরামসে রাবড়ি খাচ্ছে। কাশীর বিখ্যাত পেয়ারাও খেতে পারে। বুড়োর দাঁত তো বেশ মজবুত আছে। আচ্ছা, ওগুলো বাঁধানো দাঁত নয় তো?'

ময়ূখ কথাটার কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে জুতোর ফিতে বেঁধে অফিসের অ্যাটাচিটা তুলে নিল। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বাস-রাস্তার দিকে এগোতে লাগল। পাশে রূপক। চুপচাপ কয়েক পা হাঁটার পরে আক্ষেপের গলায় বলল, 'রোববারের সকালে কোথায় একটু আড্ডা মারব, তা না তুই এখন অফিসে ছুটলি—।'

রূপকের কথা শুনে ময়ূখের মনে হল, বন্ধুর প্রতি ও বোধহয় একটু বেশি মাত্রায় ঠাণ্ডা ভাব দেখিয়ে ফেলেছে। নিজেকে সংশোধনের জন্যে গলায় কিছুটা আবেগ ঢেলে বলল, 'আর বলিস না, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরির হ্যাপা অনেক। তোকে দেখে আমার অফিস কামাই করতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু উপায় নেই। সন্ধেবেলায় কোথায় থাকবি বল, আমি ঠিক হাজির থাকব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রূপক বলল, 'সন্ধে হতে তো বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। তখন কোথায় থাকব কে জানে!'

ময়ূখ হেসে উঠল। 'ঠিক আছে, পরের রোববার সকালে আমি তোর বাড়িতে যাচ্ছি। সারাদিন ধরে আড্ডা মারা যাবে।'

অবিশ্বাসীর গলায় রূপক বলল, 'তোর প্রাইভেট কোম্পানি কি তোকে ছাড়বে!'

'বকেয়া কাজ আজকেই তুলে দিচ্ছি। পরের রোববারগুলো আবার আগের মতো ছুটির দিন।'

মিনিবাস এসে গিয়েছিল, বন্ধুকে হাত নেড়ে বাসে উঠে পড়েছিল ময়ূখ। ছুটির দিনের

সকালের বাসগুলো ভদ্রলোকের মতো। বাসে কম লোক যাতায়াত করে, কন্ডাকটরের যাত্রীর খিদেও কম। পথচারীদের সংখ্যাও বেশী নয়, তার ফলে বাসটাস বেশ খোলা মনে ছুটতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যেই অফিসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ময়ূখ। ঝকঝকে রোদ উঠেছে আকাশে। হলুদ নরম রোদ। এমন রোদ দেখলে আকাশের দিকে একবার চোখ যাবেই। সামনের বড় রাস্তাটা পেরোবার আগে থমকে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল ও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মস্ত একটা নীল আকাশ, কোথাও এককুচিও মেঘ নেই। অথচ গত কয়েক দিন ধরে আকাশের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম ছিল। মেঘভর্তি আকাশ। যখনতখন বৃষ্টি, কখনও জোরে—কখনও আস্তে। শনশনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ওই ধরনের আবহাওয়া মনটাকে ভারী করে দেয়। আজ সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। ওদিকে নীল আকাশ, এদিকে হলুদ রোদ; রোদে চমৎকার উত্তাপ। এমন আবহাওয়ায় কেউই বোধহয় বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকতে পারে না।

ছুটির দিন সকালে শুধু রাস্তাঘাটই নয়, যে সব অফিস খোলা থাকে সে সবও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ময়ূখের গোটা দফতরে ওকে নিয়ে আজ মাত্র তিন জন। আর একজন এলেও আসতে পারে।

দ্রুত হাতে ফাইল খুলে ফেলেছিল ময়ূখ। তাড়াতাড়ি বকেয়া কাজের বাকিটুকু তুলে দিতে পারলেই ছুটি। ছুটির সময়টাকে এগিয়ে আনার জন্যে প্রথম থেকেই বেশ জোরে কলম চালাতে শুরু করেছিল।

মধ্যিখানে একটা ছোট বিরতি, তারপর আবার কাজ। বকেয়া কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল তিনটের সময়।

বেরিয়েই আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। আকাশে এখনও মেঘ জমেনি, তবে সকালের সেই ঝকঝকে নীল রঙের কোনও চিহ্ন নেই। রোদের সেই হলুদ রঙও উধাও। রাস্তায় লোক ও গাড়ির সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে, তবে কাজের দিনের হিসেবে বেশ কম। সামনে আস্ত বিকেল-সন্ধে, কিন্তু এখানে আড্ডা মারার কোনও সঙ্গী নেই।

রূপককে এখন বাড়িতে পাওয়া অসম্ভব। অন্য যারা আছে, তাদের বিকেলের বদলে সন্ধেয় ধরাই ভাল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই দিক পরিবর্তন করল ময়ূখ। বাড়ি ফিরে সন্ধেবেলাতেই বেরুনো যাবে।

আকাশে ঝলমলে দিনের আলো, অথচ অফিস সেরে বাড়ি ফিরে এসেছে—এমন ঘটনা ময়ূখের জীবনে কদাচিৎ ঘটেছে। বিকেল-সন্ধেয় এ পাড়ার চেহারাটা ওর কাছে নতুনই। পাড়ার মুখেই ডক্টর অমলেশ ভাদুড়ীর চেম্বার। এ পাড়ারই বাসিন্দা, চাকরিজীবন শেষ করার পরে প্র্যাকটিস করছেন। জেনারেল প্র্যাকটিশনার, পাড়ার মানুষদের বিপদ-আপদের বন্ধু। উনি চেম্বারের দিকেই যাচ্ছিলেন, ময়ূখকে দেখেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। আপনাদের কাজের লোকটা বাড়ি থেকে ফোন করেছিল আপনাকে, আপনি তার একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন—। যাক, এখন এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে।'

অজানা আশঙ্কায় হঠাৎই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল ময়ূখের। 'কেন? কী ব্যাপার?'

'একটু আগেই আপনার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি সবে চেম্বার খুলছি, ঠিক সেই সময়েই আপনাদের কাজের লোক ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ডাকল। আমিও ছুটলাম। আমি তো আপনার মায়ের অসুখের ব্যাপারটা জানি। একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে এসেছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তেমন কোন ইমপ্রুভমেন্ট না দেখলে আপনাকে কিন্তু মাকে আবার নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে হবে। আপনার নেক্সট-ডোর নেবার ঘোষবাবুকে আমি এই কথাটাই বলে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পর বাড়ির দিকে বেশ জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল ময়ূখ।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। প্রতিবেশীদের দু'জন ঘরের মধ্যে। ময়ূখকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওরা। একজন চাপা গলায় জানাল—কী হয়েছে। শোনার পরে ময়ূখ বলল, আসার পথে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে—।

মায়ের ঘরে চলে গিয়েছিল ময়ূখ। খাটের ওপর শুয়ে আছে মা। কোনও সাড় নেই। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। মায়ের হাত ও হাতের মধ্যে নিল। ঠাণ্ডা হাত। পাশেই একটা তোয়ালে ছিল, সেই তোয়ালে দিয়ে চোখমুখের ঘাম মুছিয়ে দিল আস্তে আস্তে।

হার্টের রুগি। হৃদ্‌যন্ত্র এখন ঠিক কী ভাবে কাজ করছে কে জানে! ডাক্তারবাবু ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে বলেছেন, তার মধ্যে মা যদি সুস্থ বোধ না করেন তাহলে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। আজ রোববার, নার্সিংহোমের ওই কার্ডিওলজিস্টকে পাওয়া কঠিন। ফোন করল, ডাক্তারবাবু বাড়িতে নেই, মোবাইল অফ। আজ নার্সিংহোমেও যাবেন না। দ্বিতীয় দফা ফোন তুলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল ময়ূখ। পাড়ার ডাক্তারবাবু তো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেছেন।

ময়ূখ বাড়ি ফেরায় প্রতিবেশী দুজনের দুর্ভাবনা কমে গিয়েছিল। ভালমানুষ দুই প্রতিবেশী যাওয়ার আগে বারবার বলে গেল, কোনরকম প্রয়োজন হলেই যেন ওদের খবর দেওয়া হয়।

দিনের আলো ফুরোতে ফুরোতে একেবারেই ফুরিয়ে গিয়েছে। ঘরের বিদ্যুতের আলো প্রথমে হালকা ছিল, এখন বেশ গাঢ়। মায়ের খাটের পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল ময়ূখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মা'র মুখের দিকে। বুঝবার চেষ্টা করছিল—সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে কি না একটু-একটু করে! মাথার ওপরে ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছিল।

এক ভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে হঠাৎই কেমন যেন নিজের দিকে ঘুরে তাকাল ও। তারপরই নতুন করে অবাক হল। এই ধরনের বিপদে ও তো ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ে। এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা তো দূরের কথা, দাঁড়াতেও পারে না। বিচ্ছিরি এক ছটফটানি শুরু হয়ে যায় শরীরের মধ্যে। কী করা উচিত—ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারে না। কিংবা একটা-কিছু ভেবে ফেললেও কাজ সেই ভাবনার পথ ধরে এগোতে পারে না চট করে। বার বার মনে হয়, আরও কিছু করা উচিত।

আজকের এই বিপদটা তো এর কাছে মস্ত বিপদ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, শরীরের

মধ্যে সেই অস্থিরতার কোনও চিহ্ন নেই। মাথা পরিষ্কার, রক্তের চাপ স্বাভাবিক। বিস্ময়কর এই স্বাভাবিকতার কারণটা টের পেতেই আর একবার চমকে উঠেছিল ময়ূখ। মনে হল, বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে আড়ালে কে বা কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে!

কিরণ বসুচৌধুরীর মুখটা চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠেছিল ময়ূখের। কী প্রশান্ত চেহারা বৃদ্ধ মানুষটির! চোখের মধ্যে আশ্চর্য এক বিশ্বাসবোধের ছবি। সারা জীবন ধরে মানুষকে গভীর ভাবে বিশ্বাস করতে পারলে বোধহয় চোখমুখ অমন জ্যোতির্ময় হতে পারে। বিশ্বাস কি শুধুই মানুষের ওপর? জগৎসংসার সত্যিই যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকেন, সেই সৃষ্টিকর্তার ওপরেও বুড়ো মানুষটির অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের একটি কথা তিনি বারবার শুনিয়েছেন। বলেছেন, বিপদে পড়লে ওঁর ভয় করে না। জানেন, কেউ না কেউ, তা সে চেনাই হোক অচেনাই হোক, এগিয়ে এসে বিপদ থেকে ওঁকে উদ্ধার করবেনই। এমন ঘটনা ওঁর জীবনে একবার নয়, বহুবার ঘটেছে। সুদীর্ঘ জীবনে বিপদেও পড়েছেন বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই এই উদ্ধার পাওয়ার ঘটনাটি ঠিক ঘটে গিয়েছে।

এমন ঘটনা বার বার ঘটলে বিশ্বাসের রং পাকা হবেই। সেদিনই বলছিলেন— বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, শরীরে আধিব্যাধিও দেখা দিয়েছে। অত বড় ঘরে একা একা থাকেন, কিন্তু ওঁর ভয় করে না। কারণ, বিপদে পড়লে সে বিপদ ঠিক কেটে যাবে!

এ পাড়াটা অদ্ভুত রকমের শান্ত। সামনে খাটের ওপর মা শুয়ে আছে অসাড় হয়ে। ঘরে-বাইরে কোথাও কোনও রকমের শব্দ নেই। ময়ূখের হঠাৎ মনে হল, ভবানীপুরের ওই বনেদি বাড়ির দোতলার মস্ত ঘরের আবহাওয়া যেন এখানেও ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে আশ্চর্য এক বিশ্বাসবোধের উত্তাপ। বিপদে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিপদ এলে সে বিপদ কেটেও যায়। এমন নিয়ম পৃথিবীর সব জায়গাতেই আছে। শুধু একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বাতাস বন্ধ হলে আবার বাতাস বয়। প্রতিকূল হাওয়া কেটে গেলে অনুকূল হাওয়া ওঠে।

শরীর মন স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ময়ূখের! ভয় পাওয়ার কিছু নেই, উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। শুধু শান্ত হয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তারপরেই বিপদ কেটে যাবে। সব কিছুই আবার সহজ স্বাভাবিক হয় উঠবে আগের মতো। এটাই বুঝি নিয়ম।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল ও। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না, হঠাৎই মাকে নড়ে উঠতে দেখে সজাগ হয়ে উঠল। মা চোখ খুলল, ক্লান্ত দৃষ্টি। তারপর ঠোঁট নড়ল। অস্ফুট গলায় বলল, 'জল'।

উঠে গিয়ে এক গ্লাস নিয়ে এল ময়ূখ। দু-ঢোক জল খেল মা। ক্লান্ত দৃষ্টি এখন আগের তুলনায় সহজ। আরও কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পরে হালকা একটি হাসির ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল মা'র মুখে। ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলি তুই?'

শান্ত গলায় উত্তর দিল ময়ূখ। 'এই তো এলাম। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ দেখে তোমাকে আর ডাকিনি।'

একটু লজ্জা পেল মা। 'অসময়ে ঘুমোচ্ছি। তুই চা-টা খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, কখন! তুমি খাবে কিছু?'

দুদিকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়াল মা।

এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলল ময়ূখ। ডক্টর ভাদুড়ী। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন এখন আপনার মা?'

নিশ্চিন্ত মানুষের ভঙ্গিতে উত্তর দিল ময়ূখ। 'ভাল, বেশ ভাল। আমার সঙ্গে কথাটথা বলেছেন।'

আশ্বস্ত হলেন ডাক্তারবাবু। 'যাক, ওষুধটা তাহলে রেসপন্ড করেছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ। আমি আপনাদের পাশের পাশের বাড়িতে একটা কলে এসেছিলাম, তা ভাবলাম এদিকে যখন এসেছি—আপনার মায়ের খবরটা একবার নিয়ে যাই—।'

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল ময়ূখের চোখেমুখে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরে ডাক্তারবাবু বললেন, 'এসেছিই যখন, আপনার মাকে একবার দেখে যাই।'

অপ্রস্তুত মুখে বলে উঠল ময়ূখ। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ডাক্তারবাবু—।'

কৌতূহলী হয়ে তাকালেন ডাক্তারবাবু।

বিব্রত মানুষের ভঙ্গিতে হেসে ময়ূখ বলল, 'মা যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—এ কথাটা মাকে আমি আর জানাইনি।'

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'খুব ভাল করেছেন। চলুন।'

ডাক্তারবাবু রুগিদের সঙ্গে বুঝি একটু উঁচু গলায় কথা বলে থাকেন। উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন মাসিমা?'

ম্লান মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল। 'ভাল।'

ডাক্তারবাবুর গলার স্বর আর এক পর্দা উঁচুতে উঠল। 'না-না, ওঠার চেষ্টা করবেন না। বড় ডাক্তারবাবুর নিষেধ আছে। আমি এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনার খোঁজটা একবার নিয়ে যাই।' বলতে বলতে রুগির শীর্ণ হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। নাড়ির গতি পরীক্ষার পরে হাসি মুখে বললেন, 'বাহ্। সত্যিই ভাল আছেন আপনি। তবে আরও ভাল থাকার জন্যে এই ভাবে আরও কিছু দিন টানা বিশ্রাম নিতে হবে।'

যাওয়ার পথে ডাক্তারবাবু নিচু গলায় ময়ূখকে বলে গেলেন, 'ক্রাইসিসটা কেটে গেছে। তবে বিছানা থেকে ওঠাউঠি এখন একদম বন্ধ।'

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পরে মায়ের বিছানার পাশের চেয়ারটায় এসে ময়ূখ আবার বসে পড়ল। মায়ের চোখ বন্ধ। তবে কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম আর ফুটে ওঠেনি। চোখমুখের সেই ক্লান্ত ভাবটাও নেই। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিশ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে।

ময়ূখের মধ্যে পুরনো কর্তব্যবোধ ফিরে এসেছিল আবার। মনে হল, ডক্টর ভাদুড়ীর প্রতি ও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য দেখায়নি। ডাকামাত্র ডাক্তারবাবু এসেছেন, ইঞ্জেকশন দিয়েছেন—পরে কী করণীয় তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন পরিষ্কার ভাবে। শুধু তাই নয়,

ঘণ্টা-দেড়েক বাদে আবার দেখে গেলেন রুগিকে। দেখলেন, আশ্বস্ত করলেন। যা পেলেন না তার নাম কৃতজ্ঞতাবোধ। বহুক্ষণ বাদে সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে অস্বস্তি দেখা দিল ময়ূখের মধ্যে। তবে এ অস্বস্তিও বেশিক্ষণ থাকল না। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত এক শান্ত ভাব। বিপদের মধ্যেও ওই শান্ত ভাবটা ছিল, বিপদ কেটে যাওয়ার পরেও আছে। এমন তো কখনও হয়নি।

চোখের সামনে কিরণবাবুর প্রশান্ত মুখটা ভেসে উঠেছিল আবার। ওর চোখেমুখে শুধু প্রশান্তিই নয়, কেমন যেন একটা সমাহিত ভাবও আছে। এই মানুষটির বয়স অনেক, কিন্তু কখনও ওঁর বিশ্বাসবোধ টলে যায়নি। বিপদে পড়লেই জানেন, সব কিছু সামলে দেওয়ার জন্যে কেউ না কেউ ঠিক পাশে এসে দাঁড়াবে। আর সে বিপদ কেটেও যাবে। আজ উনি যেখানেই থাকুন না কেন, বিপদআপদ যতই প্রবলই হোক না কেন; ওঁর প্রগাঢ় প্রশান্তিতে বিন্দুমাত্র ছায়া পড়বে না তার।

মানুষটির প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল ময়ূখ। আর কোনও দ্বিধা-সংশয় নেই। আড়ালে থেকেই উনি গভীর এক বিশ্বাসবোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন ওর মধ্যে। ওই বিশ্বাসবোধই কোনও উদ্বেগ-উত্তেজনা-উৎকণ্ঠাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি ওর। কখন যেন বিশ্বাসও করে ফেলেছে—বিপদ এলে সে বিপদ কেটেও যাবে ঠিক।